Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদা নাজনীন তানিয়া

রোলঃ 228021674

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদা নাজনীন তানিয়া
রোলঃ 228021674

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সীরাহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহমিদা নাজনীন তানিয়া , আইডিঃ 228021674 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সীরাহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

ফাহমিদা নাজনীন তানিয়া

আইডিঃ 228021674

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব জাহানের রব।দুরূদ ও সালাম মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

ফিদিকা আবি ওয়া উম্মি ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ),যতবার এই বাক্য বলি চোখ ভিজে যায় অশ্রুবিন্দুতে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের ও সর্বশ্রেষ্ঠ গুনাবলির অধিকারী ছিলেন আমাদের রসূল (সাঃ)।রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ হচ্ছেন এমন একজন, চৌদ্দশ বছর পরেও যাকে নিয়ে মুগ্ধতা এতটুকু কমেনি। যারা তাকে জেনেছে, তারা তাঁকে ভালোবেসেছে; যত বেশি জেনেছে, তত বেশি ভালোবেসেছে। না-দেখেও যাকে পৃথিবীর মানুষ সবচাইতে বেশি ভালোবেসেছে, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ (সা)।

হযরত রসূল (সঃ)-এর জীবন-চরিত রচনার সমসাময়িক মূল উৎস হলো আল্লাহর কিতাব আল্-কোরআন, রসূলের সুন্নৎ, সমসাময়িক দলিলপত্রাদি এবং সমসাময়িক আরবী কবিতা। আল্লাহর কিতাব হযরতের জীবনের শেষ তেইশ বছর ধরে তিনি যেভাবে জিব্রাইল (আ) মারফত পেয়ে লিপিবদ্ধ করান এবং যেভাবে তিনি নিজে আদ্যোপান্ত গুছিয়ে সাজিয়ে মুখস্থ করান, ঠিক সেইভাবেই তাঁর ইন্তিকালের পর গ্রন্থাকারে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে এবং তা সেইভাবেই বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে এসেছে - এ কথা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবিচারে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।এসেছে – এ কথা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবিচারে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলাম এবং ইসলামের প্রচারক হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবন ও চরিত্র আলোচনায় কোরআনই প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। কোরআনই তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতিগত জীবনে তাঁর চিন্তা, মত ও কর্ম, এক কথায় তাঁর সমগ্র চরিত্রে বিশ্বস্ত দর্পণ। তাঁর প্রচারিত আদর্শ দ্বারা তাঁর জীবন ও কর্মকে বিচার করতে কোরআনই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। ফলতঃ কোরআন তার চরিত্রে এমন নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, প্রাথমিক যুগের মুসলিম সমাজে একথা প্রবাদে পরিণত হয়েছে যে, কোরআনই হযরত মুহাম্মদ (সা) চরিত্র। হযরত মুহাম্মদ (সা) জীবনী ও চরিত্র আলোচনায় দ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য উৎস সুন্নৎ বা হাদীস। তাঁর সাহাবিগণের মধ্যে অনেকেই হযরতের উক্তি, কার্য ও সম্মতিসূচক ঘটনার বিশ্বস্ত বর্ণনা দিয়েছেন। কেউ কেউ হযরতের জীবনকালেই তা লিপিবদ্ধ করেছেন। লিখন স্মৃতি-পরম্পরায় বহু হাদীস প্রচারিত হলে হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে খ্যাতনামা বিদ্বানগণের যুক্তিবিচারে ও সযত্নে বাছাইয়ের ফলে সহীহাদীসসমুহ 'সিহা সিত্তা' নামে পরিচিত ছয়খানি গ্রন্থে সংকলিত হয়। এইসব হাদীসে হযরতের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আমরা রাসূলুল্লাহকে চিনলেও তাঁকে আমরা জানিনা।তাঁর আসল পরিচয় হচ্ছে তিনি একজন রাসূল। তিনি একটা গ্লোবাল মিশন নিয়ে এসেছিলেন এবং আমরা সেই মিশনের অংশ। আল্লাহ এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকে পাঠিয়েছেন আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পথ দেখানোর জন্য। এই পথ খুঁজে পেতে হলে তার একটাই সমাধান। রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবনী অর্থাৎ সীরাহ পড়া ও জানা।

সীরাহর সংজ্ঞা

সীরাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো পথ বা রাস্তা। আরবি ভাষায় সাইর অর্থ হলো হাঁটা। একজন ব্যক্তি তার জীবনভর জীবনের যে রাস্তা পাড়ি দেয় যার উপর দিয়ে হেঁটে চলে,তাই সীরাহ। সীরাহর আর যে সব অর্থ রয়েছে তা হলো: আচার-ব্যবহার, চালচলন, মনোভাব, জীবনযাত্রার ধরন, সামাজিক অবস্থা, প্রতিক্রিয়া, কাজকর্মের ধরন ও জীবনী-এই সবগুলোই সীরাহ এর অন্তর্ভুক্ত। সীরাহ বলতে শুধুমাত্র মুহাম্মাদ এর জীবনী বোঝায় না বরং তা দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির জীবনীকেই বোঝানো হয়। কিন্তু মুহাম্মাদ এর জীবনীর সাথে সীরাহ শব্দটি এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে, সীরাহ বলতে অধিকাংশ সময় নবীজির জীবনীকেই বোঝানো হয়।

সীরাহর ইতিহাস

অতীতে জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা ইতিহাস কি,তা জানতোনা। ইতিহাস বলতে তাদের কাছে ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জনশ্রুতি।পবিত্র কুরআন তো প্রথম থেকেই লিখিত ছিল। কিন্তু মহানবীর (সা) হাদীস দীর্ঘকাল ব্যাপী অলিখিত থাকে। তবে লোকেরা এগুলোকে বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য বর্ণনা বলে জানতো। হাদীসকে ব্যাপকভাবে লিখে রাখতে কেউ সাহসই করেনি। হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের “কুরআন ছাড়া আমার কোন কথা লিখো না, যদি লিখে থাক তবে তা নিশ্চিহ্ন করে দাও”- এই উক্তির কারণেই কেউ লিপিবদ্ধ করতে সাহস পায়নি।এই নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য খুবই স্পষ্ট। কুরআন নাযিল হবার কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি লিখে রাখলে কুরআনের সাথে তা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা ছিল।

উমার ইবনে আবদুল আযীযের শাসনকালের প্রারম্ভ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে হাদীস প্রণয়নের কাজে হাত দেয়া হয়নি। ৯৯ হিজরী সন থেকে ১০১ হিজরী সন পর্যন্ত তিনি খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। কথিত আছে যে, তিনি হাদীস প্রণয়নের কাজে হাত দেবেন কিনা তা নিয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ইস্তিখারা করেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর তরফ থেকে হাত দেয়া কর্তব্য বলে আভাস পান। ফলে তিনি আবু বাক্স ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে 'উমার ইবনে হাযামকে হাদীস সংকলনের কাজে নিয়োজিত করেন। আবু বাক্স ছিলেন মদীনার গভর্নর ও বিচারক। তিনি ১২০ হিঃ সন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। যেসব হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল, তা তিনি একটি পুস্তকের আকারে লিপিবদ্ধ করে পর্যালোচনার জন্য বিভিন্ন শহরে পাঠান। উমার ইবনে আবদুল আযীয মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আযযুহরীকেও হাদীস সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত করেন। তিনি একখানা হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।এরপর থেকে মুসলমানগণ হাদীস সংগ্রহের কাজ অব্যাহত রাখেন।

সীরাহ অধ্যয়নের গুরুত্ব

সীরাহ অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

১) ইসলামের ইতিহাস জানা:

আলী ইবন আবি তালিবের নাতি আলী ইবন হুসাইন ইবন আলী ইবন আবি তালিকা বলেছেন, 'আমাদেরকে যেভাবে কুরআন শেখানো হয়েছিল ঠিক সেভাবেই রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনীও পড়ানো হয়েছিল।' অর্থাৎ সীরাহ তাঁদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যো কুরআন অধ্যয়ন করার পেছনে তাঁরা যেভাবে সময় দিতেন সীরাহর পেছনেও ঠিক একইভাবে সময় দিতেন।

রাসূলুল্লাহর জীবনকে ঘিরেই ইসলামের ইতিহাস। তাঁর জীবন অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইসলামের আসল ইতিহাস জানা যাবে, অর্থাৎ তাঁর পুরো জীবনকাল হলো ইসলামের ইতিহাস জানার একটি উপযুক্ত মাধ্যম। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতিগুলো জানা বর্তমান সময়ের দাওয়াতি কাজের জন্য খুবই জরুরি। রাসূলুল্লাহর সীরাহ অধ্যয়ন তাই নিছক একজন ব্যক্তির জীবন নিয়ে আলোচনা নয় বরং রাসূলুল্লাহর সীরাহ হলো মুসলিম জাতির ইতিহাস, দ্বীন ইসলামের ইতিহাস।

২) কুরআনকে বুঝতে:

কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো ওহী নাযিল হওয়ার সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নয়, যেমন, আখিরাত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ। পরিবেশ-পরিস্থিতি যাই থাকুক না কেন এ আয়াতগুলো সবসময় স্বতন্ত্র থাকে। আবার কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল রাসূলুল্লাহর সময়ে সংঘটিত কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তাই দেখা যায় যে কিছু আয়াত কোনো ঘটনার পূর্বে নাযিল হয়েছে অথবা ঘটনা ঘটার সময়ে নাযিল হয়েছে কিংবা ঘটনা ঘটার পরে নাযিল হয়েছে।সীরাহ অধ্যয়নের মাধ্যমে এসবের বিস্তারিত জানতে পারি।

৩) নবীজীর প্রতি ভালোবাসা:

রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।'

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহকে সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে না পারা পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়া যাবে না। সুতরাং মুহাম্মাদকে অংশ। কে ভালোবাসা হলো ইসলামের একটি অংশ।

সীরাহ অধ্যয়ন করার একটি অন্যতম কারণ হলো অন্তরে মুহাম্মাদ (সা)এর প্রতি এক গভীর ভালোবাসা গড়ে তোলা। নবীজিকে ভালোবাসা হলো ইবাদাত। দ্বীনের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে রাসূলুল্লাহর প্রতি ভালোবাসা।

৪) নবীজীর গুণাবলির অনুসরণ:

মুহাম্মাদ (সা) ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ আখলাকের অধিকারী। তাঁর মাঝে যাবতীয় অসাধারণ গুণাবলির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তাই তাঁর সীরাহ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে তাঁকে আরও বেশি করে

অনুসরণ করা সম্ভব হবে।ইবন হাজার বলেছেন, 'কেউ যদি আখিরাতের জীবনে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে চায়, দুনিয়াবি জীবনে প্রজ্ঞা হাসিল করতে চায়, জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য বুঝতে চায় এবং নিজের মাঝে প্রকৃত নৈতিকতা ও উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চায়, তবে সে যেন রাসূলুল্লাহর পথ অনুসরণ করে।

তৎকালীন আরবের অবস্থা

সামাজিক:

তৎকালীন আরব সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন বসবাস করত। অবস্থা এবং অবস্থানের কথা বিবেচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। অভিজাত শ্রেণীর পরিবারে পুরুষ এবং মহিলাগণের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল মর্যাদা এবং ন্যায়-ভিত্তিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু ব্যাপারে মহিলাদের স্বাধীনতা দেয়া হতো, তাঁদের যুক্তি-সঙ্গত কথাবার্তার যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হতো এবং তাঁদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দেয়া হতো। অভিজাত পরিবারের মহিলাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মান সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। মহিলাদের মান মর্যাদার ব্যাপারে হানিকর বা অবমাননাকর পরিস্থিতিতে সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার কোষমুক্ত হয়ে খুন-খারাবি শুরু হয়ে যেত।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে পুরুষ প্রধান সমাজ কাঠামোই আরবে প্রচলিত ছিল। পরিবার প্রধান বা পরিবারের পরিচালক হিসেবে পুরুষদেরই প্রাধান্য ছিল এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে স্বীকৃত এবং গৃহীত হতো। পারিবারিক জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে পুরুষ স্ত্রী এবং সম্পর্ক বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতো। বর-কনে উভয় পক্ষের অভিভাবকগণের সম্মতিক্রমে কনের অভিভাবকগণের তত্ত্বাবধানে বিবাহ পর্ব অনুষ্ঠিত হতো। অভিভাবকগণের অগোচরে ইচ্ছে মাফিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার মহিলাদের ছিল না।

বিবাহ:

এক দিকে যখন সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত পরিবারসমূহের জন্য প্রচলিত ছিল এ ব্যবস্থা, অপরপক্ষে তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে নারী পুরুষের সম্পর্ক এবং মেলামেশার ক্ষেত্রে এমন সব ঘৃণ্য ব্যবস্থা এবং জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল যাকে অশ্লীলতা, পাশবিকতা এবং ব্যভিচার ছাড়া অন্য কিছুই বলা যেতে পারে না। উম্মুল মুমেনীন 'আয়িশাহদুল্লা কর্তৃক বর্ণিত সূত্রে জানা যায় যে, অন্ধকারে যুগে আরব সমাজে বিবাহের চারটি প্রথা প্রচলিত ছিল:-

(১) এর মধ্যে একটি তো হচ্ছে সেই প্রথা যা বর্তমান যুগেও জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে। এ প্রথানুসারে বিভিন্ন দিক বিবেচনার পর একজন তাঁর অধীনস্থ মহিলার জন্য অন্য একজনের

নিকট বিয়ের প্রস্তাব বা পয়গাম পাঠাতেন। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভের পর বর কনেকে ধার্য মোহর দিয়ে বিয়ে করত।

(২) নারী-পুরুষের মিলনের দ্বিতীয় প্রথাকে বলা হতো 'নিকাহে ইসতিবযা"। নারী-পুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য থাকত জ্ঞানী, গুণী ও শক্তিধর কোন সুপুরুষের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সন্তান লাভ। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যখন কোন মহিলা ঋতু জনিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতেন তখন তাঁর স্বামী তাঁকে তাঁর পছন্দ মতো কোন সুপুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠাতে বলতেন। এ অবস্থায় স্বামী তাঁর নিকট থেকে পৃথক হয়ে থাকতেন, কোন ক্রমেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতেন না। এদিকে স্ত্রী প্রেরিত প্রস্তাব স্বীকৃতি লাভ করলে গর্ভ ধারণের সুস্পষ্ট আলামত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে থাকতেন। তারপর গর্ভ ধারণের আলামত সুস্পষ্ট হলে তাঁর স্বামী যখন চাইতেন তার সঙ্গে মিলিত হতেন। হিন্দুস্থানী পরিভাষায় এ বিবাহকে 'নিয়োগ' বলা হয়।

(৩) তথাকথিত 'বিবাহ' নামক নারী-পুরুষের মিলনের তৃতীয় প্রথা ভিন্নতর রূপের একটি জঘণ্য ব্যাপার। এতে দশ থেকে কম সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দল একত্রিত হতো এবং সকলে পর্যায়ক্রমে একই মহিলার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতো। এর ফলে এ মহিলা গর্ভ ধারণের পর যথা সময়ে সন্তান প্রসব করত। সন্তান প্রসবের কয়েক দিন পর সেই মহিলা তাঁর সঙ্গে যাঁরা সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের সকলকে ডেকে নিয়ে একত্রিত করতেন। প্রচলিত প্রথায় বাধ্য হয়েই সংশ্লিষ্ট সকলকে সেখানে উপস্থিত হতে হতো। সেখানে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে অমত করার কোন উপায় থাকতনা। মহিলার আহ্বানে যখন সকলে উপস্থিত হতেন তখন সকলকে লক্ষ্য করে মহিলা বলতেন যে, 'আপনাদের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ার ফলেই যে আমার এ সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে।এ ব্যাপারটি আপনারা সকলেই অবগত আছেন।' তারপর সমবেত লোকজনদের মধ্য থেকে এক জনকে লক্ষ্য করে বলতেন 'হে অমুক, আমার গর্ভজাত এ সন্তান হচ্ছে আপনারই সন্তান।' মহিলার ঘোষণাক্রমে সন্তানটি হতো তাঁরই সন্তান এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই এর স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য থাকতেন।

(৪) নারী-পুরুষের 'বিবাহ ও মিলন' নাম দিয়ে আরও একটি জঘন্য রকমের অশ্লীল রেওয়াজ জাহেলিয়াত যুগের আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। এতে কোন মহিলাকে কেন্দ্র করে বহু লোক একত্রিত হতেন এবং পর্যায়ক্রমে তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেন। এঁরা হচ্ছেন পতিতা প্রবৃত্তির পেশাবলম্বিনী মহিলা। কাজেই, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোন লোক তাঁদের নিকট আগমন করলে তাঁরা আপত্তি করতেন না। এঁদের বাড়ির প্রবেশ দ্বারে পেশার প্রতীক হিসেবে নিশান দিয়ে রাখা হতো যাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নির্দ্বিধায় গমনাগমন করতে পারেন। যৌনক্রিয়ার ফলে গর্ভ ধারণের পর যখন কোন মহিলা সন্তান প্রসব করতেন তখন তাঁর সঙ্গে

যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী সকল পুরুষকে একত্রিত করা হতো। তারপর যে ব্যক্তি মানুষের অবয়ব প্রত্যক্ষ করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে সেখানে আহ্বান জানানো হতো। সেই ব্যক্তি উপস্থিত সকলের অবয়ব নিরীক্ষণান্তে তাঁর বিবেচনা মতো এক জনের সঙ্গে সন্তানটির যোগসূত্র বা সম্পর্ক স্থাপন করে দিতেন। তিনি বলতেন, 'এ সন্ত নি আপনার"। যাঁকে লক্ষ্য করে এ রায় দেয়া হতো তিনি তা মানতে বাধ্য থাকতেন। এভাবে নব জাতকটির একজন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যেত। তিনিও শিশুটিকে তাঁর ঔরসজাত সন্তান বলেই মনে করতেন।

যখন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ()-কে রাসূল রূপে প্রেরণ করলেন তখন জাহেলিয়াত যুগের সর্ব প্রকার অশ্লীল বৈবাহিক ব্যবস্থার অবসান ঘটল। বর্তমানে ইসলামী সমাজে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রাসূলে কারীম (স) আরব সমাজে সেই ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত করেন।'(১)

জাহেলিয়াত আমলে একই সঙ্গে একাধিক অনির্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল অতঃপর কুরআন তা চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। একই সঙ্গে দু'সহোদরাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সংসার করাটা কোন দোষের ব্যাপার ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর এবং পিতা কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা বিমাতাকে বিবাহ প্রথাও তৎকালে চালু ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'যাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষ বিয়ে করেছে, সেসব নারীকে বিয়ে করো না, পূর্বে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল, অতি ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট পন্থা। তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা এবং মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগিনী, দুধ মা, দুধ বোন, শ্বাশুড়ী, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সঙ্গে সঙ্গত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত মেয়ে যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, কিন্তু যদি তাদের সঙ্গে তোমরা সহবাস না করে থাক, তবে (তাদের বদলে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই এবং (তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী এবং এক সঙ্গে দু' বোনকে (বিবাহ বন্ধনে) রাখা, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তো হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (আন-নিসা ৪: ২২-২৩)

স্ত্রীকে পুরুষদের তালাক প্রদানের অধিকার ছিল কিন্তু এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা ছিল না অতঃপর ইসলাম তা নির্দিষ্ট করে দেয়।'

অন্ধকার যুগে পিতা পুত্রের সম্পর্কও বিভিন্ন প্রকারের ছিল।

পক্ষান্তরে, কন্যা সন্তানদের ব্যাপারে নারকীয় দুষ্কর্ম করতে তাঁরা একটুও দ্বিধাবোধ করতেন না। সমাজের লোক লজ্জা ও নিন্দা এবং তাঁদের জন্য ব্যয় নির্বাহের ভয়ে অনটন ও অনাহার এবং দুর্ভিক্ষের কারণে পুত্র/কন্যা সন্তানদেরও হত্যা করতেও তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করতেন না। কন্যা সন্তানকে তারা জীবন্ত কবর দিত।

অর্থ ও বাণিজ্য:

জাহেলিয়াত যুগের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই সামাজিক অবস্থার চেয়ে উন্নত বলা যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তেজারত বা ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল আরব অধিবাসীগণের জীবন ও জীবিকার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু দেশ থেকে দেশান্তরে গমনাগমন, মালপত্র পরিবহন, বাণিজ্যের উদ্দেশে ভ্রমণ পর্যটনের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এতই সমস্যা সংকুল ছিল যে, নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা ছিল এক দুষ্কর ব্যাপার। তৎকালে মরুপথে গমনাগমন এবং মালপত্র পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম ছিল উট। উটের পিঠে চড়ে যাতায়াত এবং মালপত্র পরিবহনের ব্যবস্থাটি ছিল অত্যন্ত সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া, পথও ছিল অত্যন্ত বিপদসংকুল। সব দিক দিয়ে সুসজ্জিত বড় বড় কাফেলা ছাড়া পথ চলার কথা চিন্তাই করা যেত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-কোন সময় দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত এবং যথা-সর্বস্ব লুণ্ঠিত হওয়ার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হতো কাফেলার সকলকে। অবশ্য, হারাম মাসগুলোতে তাঁরা কিছুটা নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তা ছিল সময়ের একটি সীমিত পরিসরে সীমাবদ্ধ। কাজেই, বাণিজ্য-নির্ভর হলেও নানাবিধ কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁরা তেমন সুবিধা করতে পারতেন না। তবে হারাম মাসগুলোতে 'উকায, যুল মাজায, মাজান্নাহ এবং আরও কিছু প্রসিদ্ধ মেলায় বেচা-কেনা করে তাঁরা কিছুটা পুষিয়ে নিতে পারতেন।'

আরব ভূখণ্ডে শিল্পের প্রচলন তেমন এতটা ছিল না। শিল্প কারখানার ব্যাপারে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আরব দেশ আজও পিছনে পড়ে রয়েছে তুলনামূলকভাবে, সেকালে আরও অনেক বেশী পিছনে পড়ে ছিল। শিল্পের মধ্যে বস্ত্র, চর্ম শিল্প, ধাতব শিল্প, ইত্যাদি শিল্পের প্রচলন চোখে পড়ত। অবশ্য, এ শিল্পগুলো ইয়ামান, হীরাহ এবং শামরাজ্যের সন্নিকটস্থ অঞ্চলগুলোতেই প্রসার লাভ করেছিল অপেক্ষাকৃত বেশী। কিন্তু সুতোকাটার কাজে সকল অঞ্চলের মহিলাদেরই ব্যাপৃত থাকতে দেখা যেত। আরব ভূখণ্ডে অভ্যন্তর ভাগের লোকেরা প্রায় সকলেই পশু পালন কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। মরু প্রান্তরের আনাচে-কানাচে যে সকল স্থানে কৃষির উপযোগী ভূমি পাওয়া যেত সে সকল স্থানে কৃষির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি সব চেয়ে জটিল ছিল তা হচ্ছে, মানুষের দারিদ্র দূরীকরণ এর মাধ্যম জীবনমান উন্নয়ন, মহামারী ও বোগব্যাধি দূরীকরণ কিংবা অন্য কোন কল্যাণমূলক কাজে অর্থ-সম্পদের খুব সামান্য অংশই ব্যয়িত হতো। সম্পদের সিংহ ভাগই ব্যয়িত হতো যুদ্ধবিগ্রহের কাজে। কাজেই, জনজীবনে সুখ, শান্তি বা স্বাচ্ছন্দ্য বলতে তেমন কিছুই ছিল না। সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক ছিল যাদের দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন এবং দেহাবরণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বস্ত্রখণ্ডের সংস্থানও সম্ভব হতো না।

টীকা,১.সহীহুল বুখারী, অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হবে না 'অধ্যায় ২য় খন্ড ৭৬৯পৃ,আবু দাউদ,নেকাহর পদ্ধতি সমূহ।

নবীজীর বংশ পরিচিতি

হযরত মুহম্মদ কেমন করে কোথা থেকে আসলেন, ইতিহাসের দিক দিয়ে এইবার তাই আলোচনা করি।

ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হযরত ইব্রাহিমই হচ্ছেন হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ কারণ। তাঁরই বংশে হযরত মুহম্মদের জন্ম এবং তিনিই তাঁর পূর্বপুরুষ। কাজেই, হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের আদি বৃত্তান্ত জানতে হলে হযরত ইব্রাহিমের সম্বন্ধে আমাদেরকে কিছু জানতে হয়।

এখন থেকে আনুমানিক ৪০০০ বছর আগে বর্তমান মেসোপোটেমিয়ার অন্তর্গত 'বাবেল' শহরে হযরত ইব্রাহিমের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল আযর। তিনি কুম্ভকারের কাজ করতেন। তিনি ছিলেন পৌত্তলিক। দেবমূর্তি নির্মাণই ছিল তাঁর ব্যবসা। হযরত ইব্রাহিমের কিন্তু এই জড়ধর্ম ভাল লাগত না। পৈতৃক ধর্ম না মেনে তিনি হলেন তৌহিদবাদী। নিরাকার আল্লাহ্ র ইবাদত এবং মানুষের সহিত ভালোবাসা হল তাঁহার ধর্মের মূলমন্ত্র। বলা বাহুল্য, পুত্রের এই নবধর্মমত পিতা কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই পিতা-পুত্রে বিরোধ উপস্থিত হল। পিতা পুত্রকে স্বমতে আনবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হল।

তখন পিতা পুত্রকে বাসা থেকে বের করে দিয়ে বাদশার কাছে ধরিয়ে দিলেন।

বাদশাহ ছিলেন নমরুদ। তিনি ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারবার আদেশ দিলেন।
কিন্তু তা কি হয়? আল্লাহ্ র নবীকে পুড়িয়ে মারবে কে? ইব্রাহিম আগুনে পুড়লেন না। আল্লাহ্ র অসীম দয়ায়, তিনি বেঁচে গেলেন।

তারপর ইব্রাহিম আঃ তার সাথীদের সহ প্যালেস্টাইন প্রদেশে চলে গেলেন এবং সেইখানেই বসবাস করতে লাগলেন।

কিছুদিন পর হযরত ইব্রাহিম আঃ তাঁর স্ত্রী সারাকে সঙ্গে নিয়ে মিসরে আসলেন। মিসরের বাদশা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং হাজেরা নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে ইব্রাহিমের সাথে বিবাহ দিলেন। সারা ও হাজেরাকে নিয়ে পুনরায় তিনি বাবেলে ফিরে আসলেন।

বিবি সারা ছিলেন বন্ধ্যা। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর কোন সন্তানাদি হয় নাই। বিবি হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন তাঁর প্রথম পুত্র ইসমাইল।

কিন্তু সারা আঃ ঈর্ষার ফলে বিবি হাজেরা স্বামীর সাথে বসবাস করতে পারলেন না। আল্লাহ্তায়ালার আদেশে তখন হযরত ইব্রাহিম শিশুপুত্র ইসমাইলসহ হাজেরাকে আরবের এক মরুপ্রান্তরে নির্বাসন দিয়ে আসলেন।
বিবি হাজেরার তখন কি বিপদ। নির্জন মরুভূমি। কোথাও জনমানবের বসতি নাই। খাবার নাই। পানি নাই। শিশু ইসমাইল তৃষ্ণায় অধীর হয়ে কাঁদছেন। ব্যাকুল জননী শিশুকে একস্থানে শুইয়ে রাখে সাফা-মারওয়া পাহাড়ে পানির সন্ধানে ছুটাছুটি করতেছেন। কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া যাচ্ছে না।

হাজেরা গভীর নিরাশায় দৌড়ায়ে শিশুর কাছে ফিরে আসলেন। এসে যে দৃশ্য দেখলেন, তাতে তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল। তিনি দেখতে পেলেন, শিশুর পায়ের আঘাতে কঠিন পাথর ভেদ করে এক চমৎকার ঝর্ণা-ধারা বয়ে চলছে। আনন্দে তাঁর মন ভরে গেল। আল্লাহর অসীম করুণার কথা মনে করে বার বার তিনি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলেন।

এই ঝর্ণা-ধারাই সেই পবিত্র জমজম ইসলামের অন্তর্বিগলিত সুধানির্ঝর মুসলিমের জীবনামৃত - আবে কওসর!

এর কিছু পরেই কিছু সওদাগর সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে এবং জমজমের সুপেয় পানির সন্ধান পেয়ে তারা সেইখানেই বসতি স্থাপন করলেন। এভাবে বিশ্ব মুসলিমের মিলন-কেন্দ্র পবিত্র মক্কা-নগরীর ভিত্তিস্থাপিত হয়.ইসমাইল সেইখানে ধীরে ধীরে বড় হইতে লাগলেন। আরব হল তাঁর স্বদেশ, আরবী হইল তাঁর মাতৃভাষা।

হযরত ইব্রাহিম বিবি হাজেরাকে চিরতরে নির্বাসন দেননি। হাজেরা ও ইসমাইলকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন; তাই মাঝে মাঝে তিনি স্ত্রী-পুত্রের খবর নিয়ে যেতেন। পরবর্তীকালে তিনি মক্কা-নগরে এসে ই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ইসমাইলের কুরবানির বিষয়টি এই মক্কা-নগরেই সংঘটিত হয়।

ইসমাইল যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন হযরত ইব্রাহিম তাঁকে মক্কার জুরহাম গোত্রের মাদাদের কন্যা সাঈদার সাথে বিয়ে দিলেন।

মক্কায় অবস্থানকালে একদিন হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইল সেখানে 'বায়তুল্লাহ' বা কাবা গৃহের পুনর্নির্মাণের জন্য আল্লাহর 'ওহি' বা প্রত্যাদেশ লাভ করলেন। এই প্রত্যাদেশ অনুযায়ী তাঁরা কাবা-গৃহের নির্মাণকার্যে অগ্রসর হলেন। নির্মাণ-শেষে পিতা-পুত্র প্রার্থনা করলেন:"হে আমাদের প্রভু, আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশধরদিগের মধ্য হইতে একটি মহাজাতি সৃষ্টি কর এবং আমাদিগকে তোমার ইবাদতের (উপাসনা) পদ্ধতি শিক্ষা দাও এবং আমাদের প্রতি করুণা কর। নিশ্চয়ই তুমি (করুণার প্রতি) চির-প্রত্যাবর্তনশীল এবং দয়াময়।"

"হে আমাদের প্রভু, আমাদের বংশধরদিগের মধ্য হতে (সেই) একজন রসূলকে সৃষ্টি কর যিনি তাদের নিকট তোমার বাণী প্রচার করবেন এবং কিতাব (কুরআন) শিক্ষা দিবে, জ্ঞান দান করবে এবং তাদেরকে শুদ্ধ করবে। নিশ্চয়ই তুমি শক্তিমান এবং পরম জ্ঞানী।"
(সুরা বাকারা: ১২৮-১২৯)

বলা বাহুল্য, আল্লাহতায়ালা এই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারেই পরবর্তীকালে ইসমাইলের বংশে হযরত মুহম্মদের জন্ম হল।

হযরত মুহম্মদের বংশ তালিকা

১. আদম
২. শীশ
৩. ইউনুস
৪. কাইনান
৫. মহলিল
৬. ইয়ার্দ
৭. ইদ্রিস
৮. মাতুশালাখ
৯. লমক
১০. নূহ
১১. শাম
১২. আরফাখশাদ
১৩. সালেহ্

১৪. আইবর
১৫. কালিস্
১৬. রাউ
১৭. সরুজ
১৮. নাহুর
১৯. তারিহ (আযর)
২০. ইব্রাহিম
২১. ইসমাইল
২২. কাইজার
২৩. আওয়ান
২৪. ঔস
২৫. মররহ
২৬. সমঈ
২৭. রোজাহ্
২৮. নাজিব
২৯. মোয়াসির
৩০. ঈহাম
৩১. আফতাদ
৩২. ঈসা
৩৩. হাসান
৩৪. আনাফা
৩৫. অরওয়া
৩৬. বলখী
৩৭. হারী
৩৮. হারী
৩৯. ইয়াসিন
৪০. হুমরান
৪১. আলরুযা
৪২. ওবাইদ
৪৩. আন্ফ্
৪৪. আসকী
৪৫. মাহী
৪৬. মাখুর

৪৭. ফাজিম

৪৮.আলেহ

৪৯. বদলান

৫০.ইয়ালদারুম

৫১. হেররা

৫২. নাসিল

৫৩.আবিল আউয়াম

৫৪. মতাসাবিল

৫৫. বরু

৫৬. ঔস

৫৭. সলমান

৫৮. হামিসা

৫৯. উদূদ

৬০.আদনান

৬১. মুঈদ

৬২.হমল

৬৩. নবিত

৬৪. সলমান

৬৫. হুমিসা

৬৬. আল-ঈসাউ

৬৭. উদূদ

৬৮.উদ

৬৯. আদনান

৭০. মা'দ

৭১. নজর

৭২. মুদার

৭৩. ইলিয়াস

৭৪. মুদ্রিকা

৭৫. খুজাইম

৭৬. কিনান

৭৭. নযর

৭৮. মালিক

৭৯. ফিহির (কোরেশ)

৮০. গালিব

৮১. লোবাই

৮২. কা'ব

৮৩. মোরা

৮৪. কিল'ব

৮৫. কাসাই

৮৬. আবদুল মন্নাফ

৮৭. হাশিম

৮৮. আবদুল মুত্তালিব

৮৯. আবদুল্লাহ্

৯০. মুহম্মদ (১)

হযরত মুহম্মদের মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র রক্তধারার মিশ্রণ হল। হযরত ইব্রাহিমের মধ্য দিয়ে আসল পারশ্যের রক্তধারা, বিবি হাজেরার মধ্য দিয়ে আসল মিসরের রক্তধারা এবং বিবি সাঈদার (ইসমাইলের স্ত্রী) মধ্য দিয়ে আসল আরবের রক্তধারা।

তিনটি বিশিষ্ট প্রাচীন সভ্যতার-মিলন-মোহনায় জন্ম হল এই মরুপয়গম্বরের। পক্ষান্তরে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের কেন্দ্রভূমিও হল আরবদেশ। কাজেই হযরত মুহম্মদের মধ্যে যে ফুটে উঠবে একটি উদার বিশ্বজনীন রূপ এতে আর আশ্চর্য কি!

কোরাইশ বংশ:

হযরত মুহম্মদের ঊর্ধ্বতন একাদশ পুরুষের নাম ছিল ফিহির। তিনি 'কোরেশ' নামেও অভিহিত হইতেন। এই কারণে তাঁহার বংশধরগণ কোরাইশ নামে খ্যাতি লাভ করে। এই হিসাবেই হযরত মুহম্মদ কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে কোরেশদিগের মধ্যে নানা শাখার উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাঁরা নানা গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

টীকা ১.বিশ্বনবী - এই তালিকা রসূলুল্লাহ্ এর প্রাথমিক জীবনী-লেখক ইবনে ইসহাক প্রণীত 'সীরাৎই-রাসূলুল্লাহ্' এবং স্যার সৈয়দ আহমদ প্রণীত "Essays on Muhammad and Islam" হতে নেওয়া।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্ম

৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট, মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার, সুবেহ্ সাদিকের সময় হযরত মুহম্মদ ভূমিষ্ঠ হন। জন্ম তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।
অন্য আর একটি মতে,রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় বিখ্যাত বনু হাশিম বংশে ৯ই রবিউল আওয়াল (ফীলের বছর) সোমবার সুবহে সাদেকের সময় জন্মলাভ করেন। ইংরেজী তারিখটি ছিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ২০শে অথবা ২২শে এপ্রিল। এ বছরটি ছিল বাদশাহ নওশেরওয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার চল্লিশতম বছর। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ সুলায়মান মানসুরপুরী সাহেব - এর অনুসন্ধানলব্ধ সঠিক অভিমত হচ্ছে এটাই।'(১)

রবিউল আউয়াল মাস।
সোমবার।
সুবহে-সাদিকের সুখ-নূরে পূর্ব আসমান রাঙা।
আরবের মরু-দিগন্তে মক্কা-নগরীর এক নিভৃত কুটিরে একটি নারী ঠিক এই সময়ে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন।
নাম তাঁর আমিনা।
আমিনা দেখছিলেন : এক অপূর্ব নূরে আসমান-যমীন উজ্জ্বল হয়ে গেছে।
সেই আলোয় চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ঝলমল করছে। কার যেন আজ শুভাগমন, কার যেন আজ অভিনন্দন। যুগ-যুগান্তের প্রতীক্ষিত সেই না-আসা অতিথির আগমনমুহূর্ত আজ যেন আসন্ন।

তাঁরই অভ্যর্থনার জন্য আজ যেন এই আয়োজন। কুল-মাখলুক আজ সেই আনন্দে আত্মহারা। গগনে গগনে ফেরেশতারা ছুটাছুটি করিতেছে, সবাই আজ বিস্মিত পুলকিত কম্পিত শিহরিত। জড়-প্রকৃতির অন্তরেও আজ দোলা লেগেছে।
জলে-স্থলে, লতায়-পাতায়, ফুলে-ফলে আজ এমনি অবিশ্রান্ত কানাকানি আর জানাজানি। যার আসার আশায় যুগযুগান্তর ধরে সারা সৃষ্টি অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছিল, সে যেন এসেছে – এই অনুভূতি আজ সব জায়গায়।

কে এই নতুন অতিথি! কে এই বেহেস্তী নূর - যাঁর আবির্ভাবে আজ দ্যুলোকে ভূলোকে এমন পুলক-শিহরণ লাগলো?

এই মহামানবশিশুই আল্লাহ্ প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ পয়গম্বর-নিখিল বিশ্বের অনন্ত কল্যাণ – মানব জাতির চরম এবং পরম আদর্শ – স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি - বিশ্বনবী – হযরত মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায় হি অ-সাল্লাম)।

যখন নবীজির ও মা আমিনা গর্ভবতী ছিলেন, তাঁর বাবা আবদুল্লাহ আশ-শামে সফররত ছিলেন। কিন্তু তিনি মদীনার কাছাকাছি একটি স্থানে এসে মারা যান। সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। অর্থাৎ আবদুল্লাহ তাঁর পুত্রের জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করেন।

রাসূলুল্লাহর জন্মের সময় তাঁর মা আমিনা একটি আলো দেখতে পেলেন।'(১) তাঁর শরীর থেকে এই আলো বেরিয়ে আসছিল এবং সেই আলো আশ-শাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আলোর দ্বারাই প্রকাশ পাচ্ছিল যে, মুহাম্মাদের বার্তা বিশ্বময় ছড়িয়ে যাবে।

ইমাম আহমেদ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায়, লোকেরা মুহাম্মাদকে নিয়ে নানা রকম কথা বলতো। যেমন তারা বলতো যে, মুহাম্মাদ যেন শুষ্ক মরুভূমিতে জন্ম নেওয়া একটি সবুজ সতেজ গাছ। তারা বোঝাতে চাইতো যে তিনিই তাদের বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইবনে আব্বাস বলেন, 'লোকেদের কিছু কথা রাসূলুল্লাহর নিকট পৌঁছালো, তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা বলো, আমি কে?' তারা বললো, 'আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন,

'আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির সেরা অংশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি সব সৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, এবং আমাকে সেই দুইয়ের মাঝে উত্তম দলটিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি মানুষকে অনেক গোত্রতে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ গোত্রের মাঝে

স্থান দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে অনেকগুলো বংশে ভাগ করেছেন এবং আমাকে সেরা বংশে জন্ম দিয়েছেন যারা তাদের গোত্রের মাঝে সেরা এবং চেতনায় অগ্রগামী।'

রাসূল খারাপ মানুষদের মধ্যে প্রেরিত ভালো মানুষ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন সেরাদের মধ্যে সেরা। তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আযযা ওয়াজাল ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্য থেকে কিনানাকে পছন্দ করেছেন, এবং কিনানার মধ্য থেকে কুরাইশদেরকে মনোনীত করেছেন, এবং তিনি কুরাইশদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন বনু হাশিমকে এবং তিনি বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।(২) অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন, 'আমি বৈবাহিক সম্পর্কজাত সন্তান, আদম থেকে শুরু করে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত আমার বংশধারায় কোনো অবৈধ সন্তান নেই। জাহিলিয়াতের ব্যভিচার আমার বংশকে দূষিত করতে পারেনি।জাহিলিয়াতের যুগে যদিও যিনা ব্যভিচার জাতীয় অনৈতিক কার্যকলাপ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউই এমন জঘন্য কাজে অংশ নেয়নি, আল্লাহ তাঁর বংশধারাকে সবসময় হেফাজত করেছেন।

টীকা ১.মুসনাদ ইমাম আহমাদ, ৫/২৬২।
২. তিরমিযী, অধ্যায় রাসূলুল্লাহর (সা) মর্যাদা, হাদীস ৩৯৬৪ (আরবি রেফারেন্স)।

নবীজীর নাম

মুহামাদের সবচেয়ে সুপরিচিত নাম হলো, মুহাম্মাদ এবং আহমাদ। কিন্তু এলে ছাড়াও তাঁর আরও কিছু নাম আছে। তাঁর পরিবার থেকে তাঁকে নাম দেওয়া হয়েছিল মুহামম্মাদ। তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে এই নাম দেন। "মুহাম্মাদ" নামের ৩৫ হলো যিনি প্রশংসিত। লোকজন তাঁর প্রশংসা করতো তাঁর চরিত্র, তাঁর কাজ, ও তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য, তিনি ছিলেন প্রশংসার মূর্ত প্রকাশ। মুহাম্মাদ হলেন সেই মানুষ যাকে দিনে-রাতে প্রতি মহর্তে প্রশংসা করা হয়। ইতিহাসে এমন আর কোনে মানবসত্তা নেই যাকে মানবজাতি এত প্রশংসা করেছে। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁর নামের অর্থকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। আহমাদ ও মুহাম্মাদ নাম দুটি একই মূল শর থেকে এসেছে, 'হামদ'। হামদ মানে প্রশংসা। 'মুহাম্মাদ' মানে প্রশংসার অধিকারী। 'আহমাদ' মানে হলো, যিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন। রাসূল আল্লাহর প্রশাস করেন, এবং তাঁর প্রশংসা অন্য সবার চাইতে বেশি।

তাঁর আরো কিছু নাম আছে, যা হাদীস থেকে জানা যায়, তার মাঝে একটি হলো "আল হাশির", আল হাশির অর্থ হচ্ছে জড়োকারী, যার জাগরণের সাথে সাথে সমগ্র মানবজাতির পুনরুত্থান ঘটবে এবং তার পেছনে জড়ো হবে। নবী মুহাম্মাদকে হাশরের দিন সর্বপ্রথম পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং পুরো মানবজাতি তাঁর পুনরুজ্জীবনের পর জাগ্রত হবে। "আল-মুকতাফ" বা "উত্তরসূরি" তাঁর আরেকটি নাম। মুহাম্মাদ হলেন নবী ও রাসূলদের মধ্যে সর্বশেষ। আর কেউ তাঁর পরে নবী বা রাসূল হিসেবে আসবেন না, এ কারণে তিনি হলেন সকল নবীর সর্বশেষ উত্তরসূরি। "আল মাহী" তাঁর আরেক নাম, যার অর্থ হলো "নিশ্চিহ্নকারী", যিনি কুফরিকে মুহে ফেলেন বা নিশ্চিহ্ন করেন। মুহাম্মাদ ছাড়া আর কোনো নবীই পুরোপুরিভাবে কুফরিকে অপসারণ করতে পারেননি, যদিও নবীজির এই মিশন তাঁর হাতে পূর্ণ হয়নি, তবে তা তাঁর উম্মাহর হাত দিয়ে অর্জিত হবে, তাঁর উম্মাহ এখনও পর্যন্ত এই মিশন চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় সেই মুহূর্তে আসবে যখন সারা বিশ্ব মুসলিম হয়ে যাবে, সেটা আসবে উম্মাতে মুহাম্মাদীর হাতে, ঈসার নেতৃত্বে। তাই, মুহাম্মাদই কুফরকে সমূলে দূরীভূত করতে সফল হবেন। তাঁর আরেকটি নাম হচ্ছে "নাবিয়্যুল মালহামা" বা "যুদ্ধের নবী।" মালহামা মানে একটি যুদ্ধ নয়, বরং মালহামা দ্বারা বোঝানো হয় একের পর এক সংঘটিত ভয়ংকর যুদ্ধ। নবীজির এই নামের একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি অর্থ হতে পারে যে, তাঁর উম্মাহ জিহাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তবে এই নামের অন্য অর্থও রয়েছে।

মুহম্মদকে আল্লাহ্ 'হাবীব' বা 'দোস্ত' বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি যে 'রহমাতুল্লিল আলামিন' অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির বুকে আল্লাহ্হর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও রহমত এই কথা ঘোষণা করেছেন। এটা খুবই স্বাভাবিক।

রাসূলুল্লাহর শৈশব ও চারিত্রিক মাধুর্য:

রাসূলুল্লাহ ও তাঁর প্রথম জীবনে লালিত হয়েছিলেন তাঁর মা এবং উম্মে আইমানের হাতে, যাঁর আসল নাম বারাকা। উম্মে আইমান ছিলেন একজন আবিসিনিয়ান মহিলা। তিনি মক্কায় বাস করতেন। তিনি পরবর্তীতে মুসলিম হন। রাসূল তাঁকে তাঁর মুক্ত করা দাস যায়িদ ইবনে হারিসের সাথে বিবাহ দেন। আরব নগরীর একটি ঐতিহ্য ছিল তাদের সন্তানদেরকে বড় করার জন্য মরুভূমিতে পাঠানো। তারা বিশ্বাস করতো যে মরুভূমির পরিবেশ হলো স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ। মরুভূমি ছিল গরম এবং শুষ্ক, ফলে তা জীবাণুদের টিকে থাকার জন্য খুবই অনুপযুক্ত পরিবেশ। তারা আরো বিশ্বাস করতো যে, মরুভূমির প্রখরতা তাদের ব্যক্তিত্বকে দৃঢ় আর শক্তিশালী করে তোলে। তাই তারা তাদের সন্তানদের শহর থেকে দূরে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দিত। রাসূলুল্লাহর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। তিনি বেড়ে উঠেছিলেন বনু সাদের ভূমিতে।

হালিমা সাদিয়া ছিলেন রাসূলুল্লাহর দুধ-মা। তিনি তাঁর বান্ধবীদের সাথে মক্কায় এসেছিলেন শিশুর খোঁজে, যাকে তারা লালন-পালন ও দুধ খাওয়াবার জন্য নিয়ে যাবেন। এটা ছিল তাদের ব্যবসা। এই বেদুইন মহিলাগণ মক্কায় আসতো, আর কিছু শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যেতো। এর বিনিময়ে তারা অর্থ লাভ করতো। যে বছর তিনি মক্কায় যান সেটি ছিল দুর্ভিক্ষের বছর। আর তারাও ছিলো হতদরিদ্র। তারা মক্কার বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে দুগ্ধপোষ্য সন্তানদের খোঁজ করতে লাগলো। বেদুইন মহিলাদের প্রত্যেকের কাছেই মুহাম্মাদকে উপস্থিত করা হয়, কিন্তু তারা কেউই তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। এর কারণ ছিল, নবীজি ছিলেন এতিম। তারা বলতে লাগলো, 'এই এতিম আমাদের কী উপকার করবে? কে আমাদেরকে টাকা দেবে, তাঁর তো বাবা মারা গেছে।' তারা ভাবলো যে তাঁর মা তাদেরকে বেশি কিছু দিতে পারবেন না। হালিমার ভাষায়,

"দিন শেষে আমার সব বান্ধবী নিজেদের সঙ্গে শিশুদেরকে নিয়ে তাদের তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছিল, একমাত্র আমি ছাড়া। আমি আমার সাথে নেবার মতো একটি শিশুকেও পেলাম না! রাতের বেলা আমার স্বামীকে ডেকে বললাম, শোনো, আমি আগামীকাল সকালে মুহাম্মাদ নামের ওই বাচ্চাটিকেই নিয়ে আসব, আমি খালি হাতে ফিরে যেতে চাই না।

আমার স্বামী রাজি হলেন। পরদিন সকালে আমি মুহাম্মাদের মা আমিনা বিনতে ওয়াহাবের কাছে গেলাম। তাঁকে গিয়ে বললাম, আমি আপনার সন্তানকে নিতে রাজি আছি।

এর আগের রাতে আমরা একটুও ঘুমাতে পারিনি কারণ আমাদের উটগুলি কোনো দুধ দিচ্ছিল না, দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার কারণে আমি আমার সন্তানকেও দুধ পান করাতে পারিনি। সে সারারাত

কান্নাকাটি করে আমাদেরকেও ঘুমুতে দেয় নি। যখন আমি মুহাম্মাদকে আমার তাঁরতে নিয়ে এলাম, আমার স্তন যেন এই শিশুকে স্বাগত জানালো। তাঁকে সবটুকু দুধ দিলো, যতখানি তাঁর প্রয়োজন ছিল। সেই দুধ আমার সন্তানের জন্যেও যথেষ্ট ছিল। সেই রাতে আমরা অনেকদিন পর পুরো রাত শান্তিতে ঘুমাতে পেরেছিলাম। কারণ আমার ছেলে গত কয়েক রাত ধরে ঠিকমতো ঘুমুতে পারেনি। আমার স্বামী এরপর উটের দুধ দোহন করতে গেলে, উটটি এত দুধ দিল যে আমার স্বামী আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, 'হালিমা, তুমি তো এক বরকতময় আত্মারে নিয়ে এসেছো।'

মক্কায় আসার সময় আমি একটি দুর্বল বৃদ্ধ গাধার পিঠে ছিলাম। এটি এত বীরে চলছিল যে এটার সাথে তাল মিলাতে গিয়ে অন্যদেরও আস্তে চলতে হচ্ছিল আর এ কারণে বাকি সবাই বিরক্ত হচ্ছিল। অথচ ফিরে যাওয়ার দিন আমার গাধাটিই হয়ে যার পুরো দলের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী গাধা!

আমার বান্ধবীরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো,

- তুমি তো এই গাধার পিঠে চড়েই মক্কায় এসেছিলে, তাই না?

- হ্যাঁ, এটা সেই গাধাটাই।

- আল্লাহ শপথ, নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটছে।

সেদিনের পর থেকে আমি এবং আমার স্বামী আমাদের ছাগলগুলোকে যখনই মাঠে চরাতে পাঠাতাম, তারা ভরপেট হয়ে ফিরে আসতো। আমরা যখন খুশি দুধ দোহাতে পারতাম। অথচ আমাদের গোত্রের অন্য সকলের পশুগুলো ক্ষুধার্ত থেকে যেতো। সেগুলো কোনো দুধও দিত না। লোকজন তাদের মেষপালকদের নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল। তারা বলতে লাগল, 'হালিমা তাঁর পশুগুলো যে মাঠে নিয়ে যায় তোমরা কেন সে মাঠে আমাদের পশুগুলোকে চরাতে নিয়ে যাও না?' তারাও তাদের পশুগুলোকে আমাদের পেছন পেছন একই জায়গায় নিয়ে যেতো, এরপরও আমাদের পশুগুলোই ভরপেট ফেরত আসত আর তাদেরগুলো ফিরতো খালি পেটে!

দিনে দিনে শিশুটি বেড়ে উঠতে থাকে, আর আমরা আবিষ্কার করতে থাকি যে আল্লাহ তাআলা এই শিশুর উসিলায় আমাদের সকলের জন্য রহমতের ওপর রহমত বর্ষণ করছেন। দুই বছর

বয়সেই তাঁকে দেখতে খুবই চমৎকার লাগত। তিনি সেই বয়সী অন্য বাচ্চাদের মতো ছিলেন না, আল্লাহর শপথ, দুই বছর বয়সেই তিনি অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন।"

বক্ষ বিদারণ:

দুই বছর বয়সে শিশু মুহাম্মাদকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেবার সময় চলে আসে। তারা মক্কায় ফিরে গিয়ে আমিনার কাছে শিশু মুহাম্মাদকে আরও কিছুদিন রাখার অনুমতি চান। তারা মুহাম্মাদকে অসম্ভব ভালোবাসতেন এবং এটাও জানতেন যে তিনি ছিলেন বরকতময়। তারা আমিনাকে বিভিন্ন রকম অজুহাত দেখিয়ে বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, মুহাম্মাদের জন্য মরুভূমিতে থাকাই শ্রেয়। আমিনা রাজি হওয়া পর্যন্ত তারা চেষ্টা চালিয়ে যান। একসময় আমিনা সম্মতি দেন। এরপর হালিমা মুহাম্মাদকে আবার মরুভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

হালিমা বলতে থাকেন, "একদিন শিশু মুহাম্মাদ তাঁর দুধ-ভাইয়ের সাথে খেলা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর ভাই ছুটে এসে অন্যদের বললো,

- আমার কুরাইশের ভাই!

কী হয়েছে তাঁর?

- আমি দেখলাম, দুইজন সাদা কাপড় পরা লোক মাটিতে নেমে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিল। এরপর তাঁর বুক চিরে ফেললো।

এ কথা শোনার পর আমি আর তাঁর বাবা ছুটে গেলাম। মুহাম্মাদের মুখ ফ্যাকাসে। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,

- কী হয়েছে বাবা?

- দুইজন লোক এসে আমার বুক চিরে আমার ভেতর থেকে কিছু একটা বের করে নিয়ে গেল।

আমি মুহাম্মাদকে খুব বেশি ভালোবাসতাম। কেউ তাঁর কোনো ক্ষতি করুক এটা আমি কিছুতেই চাই না, বিশেষ করে আমার তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায়। তাই দ্রুত মক্কায় ফিরে যাওয়াই সঙ্গত মনে করলাম।

মক্কায় গিয়ে আমিনার কাছে বললাম, 'এই যে মুহাম্মাদ, এখন থেকে আপনি তাঁকে নিজের কাছে রাখতে পারেন। আমরা আমাদের দায়িত্ব পূর্ণ করলাম।'

মাত্র কদিন আগেই তো তোমরা তাঁকে নিজের কাছে রাখার জন্য খুব উৎসাহ দেখাচ্ছিলে। এখন হঠাৎ করে কেন তাঁকে ফিরিয়ে দিতে এলে?

আমরা কোনো উত্তর দিলাম না। কিন্তু মা আমিনাও নাছোড়বান্দা। তিনি আমাদেরকে বারবার প্রশ্ন করতেই লাগলেন, এক পর্যায়ে আমরা তাঁর কাছে আসল ঘটনা খুলে বললাম।

সব শুনে আমিনা বললেন, 'তোমরা কি তাঁকে নিয়ে এই ভয়ে শঙ্কিত যে, শয়তান তাঁর কোনো ক্ষতি করবে? আল্লাহর শপথ, এমনটা হতে পারে না। তাঁকে যখন আমি গর্ভধারণ করি তখন সে ছিল সবচেয়ে হালকা, আর যখন তাঁকে প্রসব করি, তাঁর জন্ম অন্যসব বাচ্চাদের মতো ছিল না। যখন সে বের হয়ে আসলো, আমি আলো দেখতে পেলাম, যা ছিল আশ-শাম পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই বলছি, আল্লাহর সুরক্ষা তাঁর সাথে আছে। আমি নিশ্চিত তাঁর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল হবে।' এটুকু একনাগাড়ে বলে মা আমিনা থামলেন।(১)

মুহাম্মাদ ও তাঁর মায়ের সাথে মক্কায় থেকে যান। ছয় বছর বয়সে তাঁর মা মৃত্যুবরণ করেন। এরপর মুহাম্যাদ পিতমাতহীন হয়ে পড়েন। এরপর তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে লালিত পালিত হতে লাগলেন। আবদুল মুত্তালিব তাঁকে বড় করেন, কিন্তু নবীজির ও আট বছর বয়সে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। তখন মুহাম্মাদ তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে বড় হতে থাকেন। তিনি তাঁকে আশ্রয় ও সুরক্ষা দেন, সাহায্য করেন, এবং তাঁকে তাঁর জীবনের পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে সহায়তা করে যান।

এই ছিল নবীজির জীবনের প্রথম দিকের বছরসমূহ। রাসূলুল্লাহকেও আল্লাহ সর্বদা হেফাযত করেছেন। তৎকালীন সমাজে লোকেদের মাঝে নানান গুনাহ আর পাপকাজের প্রচলন থাকলেও তিনি কখনো সেসবের সাথে জড়াননি। আল্লাহ সুবহানাজ ওয়া তাআলা তাঁকে সেসব কাজ থেকে দূরে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহর এক ঘটনা বর্ণনা করেন।

'আমি ছিলাম একজন মেষপালক। একদিন আমি আমার এক মেষপালক বন্ধুকে বললাম, 'আজ রাতে আমি মক্কার আসরে যেতে চাই, যেখানে অন্য সকলে যায়।'

আমি সেখানে গিয়ে দেখতে চাচ্ছিলাম যে তারা কী করে। তাই আমার বন্ধুকে বললাম, আমি না আসা পর্যন্ত যেন আমার মেষগুলোকে দেখে রাখে। সে রাজি হলো। আমি মক্কায় তাদের আসরের কাছে গেলাম। যেই না আমি সুরেলা ধ্বনি শুনলাম, আল্লাহ আযযা ওয়াজাল সাথে

সাথে আমার কান বন্ধ করে দিলেন এবং আমি গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম। আমি যখন জেগে উঠলাম, তখন আসর শেষ হয়ে গেছে।

পরের দিন, আমি অন্য একটি আসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি আমার বন্ধুর সাথে কথা বলে সেই আগের দিনের মতো একই রকম ব্যবস্থা করে মক্কায় গেলাম। মক্কায় পৌঁছে আমি আসরে গেলাম। যখনই সুর শুনতে পেলাম, আল্লাহ তাআলা আবারও আমার কান বন্ধ করে দিলেন এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে উঠলাম আসর শেষ হওয়ার পর। আর তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, এটা আল্লাহর তরফ থেকে আমার জন্য এক বিশেষ নিদর্শন।'

এমন আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যায়িদ ইবনে হারিসা, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর একজন ক্রীতদাস। তিনি বর্ণনা করেন, ইসাফ ও নাইলা নামে পিতলের দুটো মূর্তি ছিল। মুশরিকরা কাবাঘর তাওয়াফ করার সময় মূর্তিগুলো স্পর্শ করতো। আল্লাহর রাসূল বলেন, 'এগুলো স্পর্শ কোরো না।' তিনি তখনো নবুওয়াত প্রাপ্ত হননি, তারপরেও তিনি কেমন করে যেন জানতেন যে, এগুলো স্পর্শ করা উচিত হবে না।
আসলে এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত। ঘটনা এখানেই শেষ নয়, যায়িদ আরো বর্ণনা করেন, 'আমরা যখন ঘুরে আসলাম, তখন আমি মনে মনে ভাবলাম-একটু ছুঁয়েই দেখি না কী হয়।' যেই না আমি ছুঁয়েছি আল্লাহর রাসূল 'তোমাকে কি এটা করতে নিষেধ করা হয়নি? বললেন,

যায়িদ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ নবুওয়াতের পূর্ববর্তী জীবনে কখনো কোনো মূর্তিকে নমস্কার করেননি।' রাসূলুল্লাহ কখনও কোনো মূর্তির উপাসনা করেননি এবং কোন মূর্তিকে পূজা করার উদ্দেশ্যে স্পর্শও করেননি। তিনি স্বভাবগতভাবেই মূর্তিপূজা অপছন্দ করতেন। আর তিনি এই নিয়মগুলো নিজ পরিবারের জন্যেও খাটাতেন। তিনি যায়িদকে বলতেন, যায়িদ মূর্তিপূজায় অংশগ্রহণ কোরো না। এই কারণেই আলী ইবনে আবি তালিবও কোনোদিন মূর্তিপূজা করেননি কেননা তিনি মুহাম্মাদের বাড়িতেই বড় হয়েছেন। আবু তালিব দরিদ্র হয়ে পড়লে, রাসূলুল্লাহ তাঁর ছেলে আলী ইবনে আবু তালিবের দেখাশোনা করার দায়িত্ব নেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবীজিকে কিছু ইবাদত করার প্রতি নির্দেশনা দিতেন, যা সম্পর্কে এর আগে কেউ জানতো না। কুরাইশদের মধ্যে হাজ্জের সময় তারাই ছিল একমাত্র লোক, যারা আরাফাতে অংশগ্রহণ করতো না। হাজ্জের বিভিন্ন নিয়ম কানুন ছিল, যেমন তাওয়াফ, সাঈ, আরাফাতে অবস্থান এবং মিনায় অবস্থান করা। কুরাইশের লোকজন সব নিয়ম-কানুন পালন করলেও আরাফাতে অবস্থান করতো না এর কারণ হলো তারা এটাকে হারামের সীমানার বাইরে মনে করতো। আরবের অন্য সকলে সেখানে যেতো, আর কুরাইশরা তাদের

বলতো, 'আমরা আল হারামের বাসিন্দা, আমরা কীভাবে আল হারামের বাইরে যেতে পারি?' তারা আরাফাতের সীমানা পর্যন্ত গিয়ে সেখানে থেকে যেতো। জুবাইর ইবনে মুত'ইম একবার তার উট হারিয়ে ফেলেন। তিনি তা খুঁজতে খুঁজতে আরাফাতে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে গিয়ে অর্থাৎ আরাফাতে মুহাম্মাদকে দেখতে পেয়ে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান। তিনি বলে উঠেন, 'সে কি কুরাইশের লোক নয়? সে আরাফাতে কী করছে?'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুহাম্মাদকে ফিতরাতের মাধ্যমে পথ দেখাতেন, তাঁর অজান্তেই তাঁকে দিয়ে হাজ্জের একটি আহকাম পালন করিয়ে নিয়েছেন, যেটা তাঁর গোত্রের লোকেরা করতো না।

নবীর প্রথম পেশা ছিল মেষপালন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি মেষপালক ছিলেন না।'এরপর তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করেন।
*টীকা (১)সীরাতে ইবনে হিশাম ১ ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬১
(২) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৪।

দাদা এবং চাচা আবু তালেবর অভিভাবকত্ব

দাদার অভিভাবকত্বে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মা আমিনা বিনতে ওয়াহাব ও দাদা আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিমের জীবদ্দশায়ও আল্লাহর তদারক ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এই সময় আল্লাহ অতি দ্রুত তাঁর শারীরিক প্রবৃদ্ধি দান করেন, যাতে আল্লাহর ইঙ্গিত অলৌকিকত্ব তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যখন তাঁর বয়স হয় ছয় বছর, তখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'আবওয়া' নামক স্থানে তাঁর মাতা ইনতিকাল করেন। সেখানে শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে নিয়ে তিনি বনী আদী ইবনে নাজ্জার গোত্রে মুহাম্মাদের (সা) মামাদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। মক্কা অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি ইনতিকাল করেন। মায়ের ইনতিকালের পর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদা আবদুল মুত্তালিবের একক তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হতে থাকেন। আবদুল মুত্তালিবের জন্য কা'বা শরীফের ছায়ায় চাদর বিছানো হতো। আবদুল মুত্তালিব সেখানে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ চাদরের আশে পাশে বসে থাকতো তাঁর পুত্র পৌত্ররা। আবদুল মুত্তালিবের সম্মানার্থে কেউ তাঁর ওপর বসতো না। কিন্তু দৃঢ়চেতা কিশোর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেই বিছানার ওপর গিয়ে বসে পড়তেন। তাঁর চাচা তাঁকে ধরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। তা দেখে আবদুল মুত্তালিব বলতেন, "তোমরা আমার পৌত্রকে বাধা দিও না। আল্লাহর কসম, সে এক অসাধারণ ছেলে।" অতঃপর তাঁকে সাথে নিয়ে চাদরের ওপর বসতেন এবং তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতেন। তাঁর সব কাজই তাঁর ভাল লাগতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স আট বছর পূর্ণ হলে আবদুল মুত্তালিব মারা যান। আবরাহার হস্তী বাহিনী নিয়ে কা'বা শরীফ আক্রমণ করার আট বছর পর তিনি মারা যান।

চাচা আবু তালেব এর অভিভাবকত্ব:

আবদুল মুত্তালিবের তিরোধানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে লালিত-পালিত হতে লাগলেন। তৎকালে বনু লেহাব গোত্রের এক ব্যক্তি মানুষের দৈহিক লক্ষণসমূহ দেখে ভাগ্য বিচার করতো। সে যখন মক্কায় আসতো, কুরাইশরা তাদের ছেলেদের নিয়ে তার কাছে ভীড় জমাতো। সে ছেলেদের শরীরের ওপরে নজর বুলিয়ে তাদের ভাগ্য বলতো। অন্যদের সাথে আবু তালিবও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে উক্ত গণকের কাছে গেলেন। গণক তাঁর দিকে তাকালো এবং পরক্ষণেই যেন একটু ভাবতে আরম্ভ করলো। ক্ষণিকের জন্য সে বালক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা এড়িয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর বললো, “এই বালককে নিয়ে একটু বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে।” আবু তালিব বালক মুহাম্মাদের প্রতি গণকের অধিক

মনোযোগ লক্ষ্য করে তাঁকে কৌশলে সরিয়ে দিলেন। এতে গণক বললো, "তোমাদের এ কি কাণ্ড! বালকটাকে আমার কাছে আবার নিয়ে এসো। আল্লাহর কসম, এ এক অসাধারণ বালক।"

আল আমিন (সা) এর হিলফুল ফুযুল:

রাসূলুল্লাহর প্রাথমিক জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো 'হিলফুল ফুযুল' চুক্তি।

এর পেছনের একটা গল্প আছে। ইয়েমেনের যাবিদ নামের এক এলাকা থেকে একজন লোক ব্যবসা করতে মক্কায় আসে। তার ব্যবসায়ের পণ্যসামগ্রী সাহম গোত্রের এক স্বনামধন্য ব্যক্তি আল আস ইবন ওয়াইল কিনে নেয়, টাকা পরিশোধ করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞাও করে। কিন্তু কিছু সময় পর গড়িমসি আরম্ভ করে। লোকটাকে পাওনা বুঝিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ইয়েমেনি লোকটি মক্কায় ভিনদেশী, আল-আস আশা করেছিল যে লোকটি কিছুদিনের মধ্যে চলে যাবে, সেই সুযোগে আল-আস তার টাকা আত্মসাৎ করার পরিকল্পনা করে।

কিন্তু ইয়েমেনি লোকটি এত সহজে চলে গেল না। সে হক আদায় না করে নড়বে না। মক্কায় মানুষের ভীড়ের মাঝে গিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা শুরু করলো। 'হে মক্কাবাসী, আমি তোমাদের দেশে এসে যুলুমের শিকার হয়েছি, অন্যায়ের শিকার হয়েছি, হে লোকসকল, তোমরা কে আছ যে আমার পাশে দাঁড়াবে, তোমরা কি তোমাদের দেশে এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে?' তার আবেগী কথা শুনে কুরাইশের কিছু গোত্র জড়ো হয়ে একটা চুক্তি করলো। চুক্তির কথা ছিল, মক্কার দুর্বল ও নিপীড়িত মানুষদের অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

চুক্তিতে অংশ নেওয়া গোত্রগুলোর একটি ছিল নবীজির পরিবার। নবীজি সেই সময় কিশোর, কিন্তু আবদুল মুত্তালিব তাঁকেও সভায় নিয়ে যান। সভা অনুষ্ঠিত হয় আবদুল্লাহ ইবনে জাদানের বাড়িতে। সে ছিল খুবই উদার প্রকৃতির মানুষ, অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল। মানুষের অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার। তার সম্মানে সে বাড়িতেই তারা সভার আয়োজন করলো। সভায় চুক্তি হলো যে, তারা সকলে একত্রিত হয়ে মজলুমদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার হবে। এ ঘটনা নবুওয়াতের আগেই ঘটেছিল আর চুক্তিটাও মুশরিকদের মধ্যকার একটি চুক্তি। রাসূল বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে জাদানের বাড়িতে যে চুক্তি সম্পাদিত হলো, আমি এক পাল ভালো পশুর বিনিময়ে হলেও সেই চুক্তিতে থাকার সুযোগ হাতছাড়া করতাম না। আর যদি ইসলামের পরে এমন ঘটনা ঘটতো তখনও আমি বিষয়টিকে স্বাগত জানাতাম।'

অর্থাৎ যদি ইসলাম আসার পরে এমন কোনো চুক্তি করার সুযোগ আসতো, রাসূল সেই চুক্তিতে সানন্দে অংশ নিতেন, এমনকি যদি এই ধরনের চুক্তি কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত হয়, তবুও। এখানে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে, তা হলো, মুসলিমরা সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে, চাই সেই ন্যায় একজন মুসলিমের পক্ষে বা কোনো অমুসলিমের পক্ষে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মুসলিমরা হকের পক্ষ, নিপীড়িত মানুষের পক্ষ, মজলুমের পক্ষাবলম্বন করবে।
এতদুদ্দেশ্যে আরবের কতিপয় উৎসাহী যুবককে লইয়া তিনি সেবা সংঘ গঠন করিলেন। সেবকগণ আল্লাহ্ নামে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন:

১. আমরা নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্গতদিগকে সেবা করব।

২. অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দিব।

৩. অত্যাচারিতকে সাহায্য করব।

৪. দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করব।

৫. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনেরও চেষ্টা করব।

এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা-বাণীর নাম হল 'হিলফুল-ফুযুল'।
হযরতের প্রতিষ্ঠিত সেবা সংঘ বেশ ভালভাবেই চলতে লাগল। হযরত এর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কোথায় কোন অনাথ শিশু ক্ষুধার জ্বালায় কান্না করছে, কোথায় কোন দুঃস্থ পীড়িত রুগ্ন ব্যক্তি আর্তনাদ করছে, কোথায় কোন বিধবা নারী নিরাশ্রয় হয়েছে, তাই তিনি সন্ধান করে ফিরতেন। কোথাও বা তিনি এতিম শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করতেন, কোথাও বা রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসে তার পরিচর্যা করতেন, কোথাও বা অন্য কোন কল্যাণকার্যে আত্মনিয়োগ করে প্রতিবেশীকে সাহায্য করতেন। এমনভাবে লোকসেবায় তিনি ব্রতী হয়েছিলেন।

এই সেবা, এই ত্যাগ, এই মানব-প্রীতি কি কখনও ব্যর্থ যেতে পারে? সত্যিকার কল্যাণচেষ্টা ও নিঃস্বার্থ সেবা মানুষ কতদিন অস্বীকার করে চলবে? আরবাসী তাই দিনে দিনে মুহম্মদের (সা) প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল। মুহম্মদ (সা) যে ভণ্ড নয়, এই বিশ্বাস সবার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল। অবশেষে এমন হল যে, আরবগণ একবাক্যে তাঁহাকে 'আল্-আমিন' অর্থাৎ 'বিশ্বাসী' এই উপাধি দান করে ফেলল। মুহম্মদ (সা)নাম চাপা পড়ে 'আল-আমিন' নামই হয়ে গেল। দেখা হলেই লোকেরা বলে উঠত "এই যে আমাদের 'আল্-আমিন' আসতেছেন।"

নীতিধর্ম বিবর্জিত ঈর্ষাবিদ্বেষ কলুষিত পরশ্রীকাতর দুর্ধর্ষ আরব-চিত্তে এতখানি স্থান লাভ করা তখনকার দিনে সহজসাধ্য ছিল না। অনুপম চরিত্র-মাধুর্য, সততা, আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম মানব-প্রেম ছিল বলেই মুহম্মদে (সা)এর পক্ষে এটি সম্ভব হয়েছিল।

বস্তুত হযরতের 'আল্-আমিন' উপাধি লাভের মধ্যে এই সত্যই আমরা উপলব্ধি করলাম যে, ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত সার্থকতা নির্ভর করে বাল্য জীবনের চরিত্র মাধুর্যের উপরে। সত্যবাদিতা সেই চরিত্র গঠনের প্রথম উপকরণ।

হযরত খাদিজা (রা) এর সাথে বিয়ে

যুবক বয়সে নবীজির ও জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো খাদিজার সাথে বিয়ে। খাদিজা মক্কার বিখ্যাত এক নারী, সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলা। তাঁর আগেও বিয়ে হয়েছিল। খাদিজার নিজস্ব ব্যবসা ছিল। সে সময় ব্যবসার কাজে প্রায়ই ইয়েমেন ও সিরিয়া যাতায়াত করা লাগতো। তিনি ব্যবসার কাজ সামলাবার জন্য বিভিন্ন লোক ভাড়া করতেন, নিজে ঘরের বাইরে গিয়ে ব্যবসা করতেন না। কুরাইশের লোকেরা শীত ও গ্রীষ্মে বছরের দুই সময়ে সফরে বের হতো একবার ইয়েমেনে, আরেকবার শামে। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল মক্কার সে সময়ের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন,

"কুরাইশদের নিরাপত্তার জন্য, শীত ও গ্রীষ্ম সফরে তাদের নিরাপত্তার জন্য।" (সূরা কুরাইশ, ১০৬: ১-২)

নবীজির সততা ও সত্যবাদিতার কথা তখন মক্কার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর কথা শুনে খাদিজা তাঁকেই ব্যবসার কাজে নিয়োজিত করলেন। মুহাম্মাদ যখন শামে সফরের উদ্দেশ্যে বের হলেন, খাদিজা তাঁর দাস মায়সারাহকে তাঁর সঙ্গে পাঠালেন। তাঁরা দুজন শামে ব্যবসা শেষ করে ফিরে এলেন।

মায়সারাহ খাদিজার কাছে তাদের সফরের বর্ণনা দিতে এসে মুহাম্মাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি বলেন, 'এই মানুষটার সততা ও বিশ্বস্ততা মুগ্ধ হওয়ার মতো!' খাদিজা নবীজির কথা যত শুনছেন, ততই তাঁর প্রতি আগ্রহ বোধ করছেন। নবীজির চারিত্রিক গুণাবলি এমনই ছিল যে সবাইকে টানতো। খাদিজা, মক্কার একজন বিত্তশালী মহিলা, এক সাধারণ কর্মচারীর অসাধারণ চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ খাদিজার প্রস্তাব মেনে নিয়ে বিয়ের জন্য সম্মতি জানালেন। বিয়ের সময় নবীজির বয়স ছিল পঁচিশ, আর খাদিজার

বয়স ছিল চল্লিশ। দুজনের বয়সের পার্থক্য পনেরো বছর, কিন্তু বয়সের এই সুবিশাল ফারাক তাদের বৈবাহিক জীবনে কোনো আঁচ ফেলতে পারে নি।

খাদিজা বেঁচে থাকা অবস্থায় নবীজি আর কোনো বিয়ে করেননি। নবীজির বেঁচে থাকা সন্তানদের প্রত্যেকেই ছিলেন মা খাদিজার সন্তান। তাদের ছয় সন্তান-যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা, আল কাসিম আর আবদুল্লাহ। কেবল ফাতিমা বাদে বাকি সবাই নবীজির জীবদ্দশাতেই মারা যান। ফাতিমা ও আলী থেকেই নবীজীর বংশের ধারা চলছে।

প্রকৃতপক্ষে এই বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল 'আল-আমিন' ও 'তাহিরা'র মধ্যে – সত্য ও পবিত্রতার মধ্যে। একদিকে সত্য ও বিশ্বাসের জ্বলন্ত প্রতীক মুহম্মদ (সা) ,অপরদিকে পূর্ণ ও পবিত্রতার শুভ্র প্রতিক খাদিজা-কেন তবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট না হবে।সত্য ও পবিত্রতার আকর্ষণ এমনই সুন্দর ও স্বাভাবিক।

কা’বা ঘর পুনঃ নির্মাণ ও হাজরে আস ওয়াদ বিবাদ মীমাংসা

রসূলুল্লাহ(সা) যখন পঁয়ত্রিশ বছরে পদার্পণ করেন তখন কুরাইশগণ কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। কারণ, কা'বা গৃহের স্থানটি চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিল মাত্র। দেয়ালের উপর কোন হাদি ছিল না। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু সংখ্যক চোর এর মধ্যে প্রবেশ করে রক্ষিত বহু মূল্যবান সম্পদ এবং অলঙ্কারাদি চুরি করে নিয়ে যায়। ইসমাঈল আই-এর আমল হতেই এ ঘরের উচ্চতা ছিল ৯ হাত।

গৃহটি বহু পূর্বে নির্মিত হওয়ার কারণে দেয়ালগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যে-কোন মুহূর্তে তা ভেঙ্গে পড়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া সেই বছরেই মক্কা প্লাবিত হয়ে যাওয়ার কারণে কা'বামুখী জলধারা সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া প্রবাহিত হওয়ায় কা'বাগৃহের দেওয়ালের চরম অবনতি ঘটে এবং যে-কোন মুহূর্তে তা ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা ঘণীভূত হয়ে ওঠে। এমন এক নাজুক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কুরাইশগণ সংকল্পবদ্ধ হলেন কা'বা গৃহের স্থান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে তা পুনঃনির্মাণের জন্য।

কা'বাহ গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সকল গোত্রের কুরাইশগণ একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করে নিলেন। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমেঃ কা'বাহ গৃহ নির্মাণ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বৈধ অর্থ-সম্পদ (হালাল) ব্যবহার করা হবে। এতে বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ, সুদের অর্থ এবং হক নষ্ট করে সংগৃহীত হয়েছে এমন কোন অর্থ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা চলবে

না। এ সকল নীতির প্রপ্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন করে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল।

নতুন ইমারত তৈরির জন্য পুরাতন ইমারত ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহর ঘর ভেঙ্গে ফেলার কাছে হাত দিতে কারো সাহস হচ্ছে না, অবশেষে ওয়ালীদ বিন মুঙ্গীরাহ মাখযমী সর্বপ্রথম ভাঙ্গার কাজে হাত দিলেদ এবং কোদাল হাতে নিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ। আমাদের তো ভাল বাতীত কোন মন্দ উদ্দেশ্য নেই।" সং অন্যেরা ভীত-সন্ত্রস্ত চিত্তে তা প্রত্যক্ষ করতে থাকলেন। কিন্তু দু'বুকনের কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলার পরও যখন তাঁরা দেখলেন যে তাঁর উপর কোন বিপদ আপদ আসছে না তখন দ্বিতীয় দিনে সকলেই ভাঙ্গার কাজে অংশ গ্রাহল করলেন। যখন ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তি পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা হল তখন নির্মাণ কাজ শুরু হল। প্রত্যেক গোত্র যাতে নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে তার জন্য কোন গোত্র কোন অংশ নির্মাণ করবেন পূর্বাহ্নেই তা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে প্রত্যেক গোত্রই ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রস্তর সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। বাকুম নামক একজন রুমীয় মিস্ত্রির তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছিল। নির্মাণ কাজ যখন কৃষ্ণ প্রস্তরের স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল তখন নতুনভাবে এক সমস্যার সৃষ্টি হল। সমস্যাটি হল কে 'হাজারে আসওয়াদ' তথা 'কালো পাথর স্থাপন করার মহা গৌরব অর্জন করবেন তা নিয়ে। এ ব্যাপারে ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি চার বা পাঁচ দিন চললো।

সকলেই নিজে বা তাঁর গোত্র কালো পাথর যথাস্থানে স্থাপন করার দাবীতে অনড়। সকলেরই এক কথা, এ কাজটি তাঁরাই করবেন। কেউই সামান্য ছাড় দিতেও তৈরি নন। সকলেরই একই কথা, একই জেদ। জেদ ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হল রেষারেষিতে। রেষারেষির পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে রক্তারক্তি। এ ব্যাপারে রক্তারক্তি করতেও তাঁরা পিছপা হবেন না। সকল গোত্রের মধ্যেই চলছে সাজ সাজ রব। হারামে শুরু হয়েছে অস্ত্রের মহড়া। একটু নরমপন্থীগণ সকলেই আতঙ্কিত কখন যে যুদ্ধ বেধে যায় কে তা জানে।

এমন বিভীষিকাময় এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্ষীয়ান নেতা আবু উমাইয়া মাখযুমী এ সমস্যা সমাধানের একটি সূত্র খুঁজে পেলেন। তিনি সকলকে লক্ষ্য করে প্রস্তাব করলেন যে, আগামী কাল সকালে যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন তাঁর উপরেই এ বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করা হোক। সকলেই এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। আল্লাহর কী অপার মহিমা। দেখা গেল সকল আরববাসীর প্রিয়পাত্র ও শ্রদ্ধেয় আল-আমিনই সর্ব প্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন। নাবী কারীম (স)-এর এভাবে আসতে দেখে সকলেই চিৎকার করে বলে উঠল:

هذَا الأَمِينُ، رَضِيْنَاهُ، هَذَا مُحَمَّدٌ

আমাদের বিশ্বাসী, আমরা সকলেই এর উপর সন্তুষ্ট, তিনিই মুহাম্মদ (স)।

তারপর নাবী কারীম (সা) যখন তাঁদের নিকটবর্তী হলেন তখন ব্যাপারটি সবিস্তারে তাঁর নিকট পেশ করা হল। তখন তিনি একখানা চাদর চাইলেন। তাঁকে চাদর দেয়া হলে তিনি মেঝের উপর তা বিছিয়ে দিয়ে নিজের হাতে কালো পাথরটি তার উপর স্থাপন করলেন এবং বিবাদমান গোত্রপতিগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'আপনারা সকলে চাদরের পার্শ্ব ধরে উত্তোলন করুন। তাঁরা তাই করলেন। সবাই মিলে চাদরকে যখন কালো পাথর রাখার স্থানে পৌঁছাল তখন তিনি স্বীয় মোবারক হাতে কালো পাথরটি উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন। এ মীমাংসা সকলেই হৃষ্টচিত্তে মেনে নিলেন। অত্যন্ত সহজ, সুশৃঙ্খল ও সঙ্গত পন্থায় জ্বলন্ত একটি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

এ দিকে কুরাইশগণের নিকট বৈধ অর্থের ঘাটতি দেখা দিল। এ জন্যই উত্তর দিক হতে কা'বা ঘরের দৈর্ঘ্য আনুমানিক ছয় হাত পর্যন্ত কমিয়ে দেয়া হল। এ অংশটুকুই 'হিজর' ও 'হাতীম' নামে প্রসিদ্ধ।এবার কুরাইশগণ কা'বার দরজা ভূমি হতে বিশেষভাবে উঁচু করে দিলেন যেন এর মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে যাকে তাঁরা অনুমতি দেবেন। যখন দেয়ালগুলো পনের হাত উঁচু হল তখন গৃহের অভ্যন্তর ভাগে ছয়টি পিলার বা স্তম্ভনির্মাণ করা হল এবং তার উপর ছাদ দেয়া হল। কা'বাহ গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে একটি চতুর্ভুজের রূপ ধারণ করল। বর্তমানে কা'বাহ গৃহের উচ্চতা হচ্ছে পনের মিটার। কালো পাথর বিশিষ্ট দেয়াল এবং তার সামনের দেয়াল অর্থাৎ: দক্ষিণ ও উত্তর দিকের দেয়াল হচ্ছে দশ দশ মিটার। কৃষ্ণ প্রস্তর মাতাফের জায়গা হতে দেড় মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। দরজা বিশিষ্ট দেয়াল এবং এর সঙ্গে সামনের দেয়াল অর্থাৎ পূর্ব এবং পশ্চিম দিকের দেয়াল বার মিটার করে। দরজা রয়েছে মেঝে থেকে দু'মিটার উঁচুতে। দেয়ালের পাশেই চতুর্দিকে নীচু জায়গা এক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চেয়ার সমতুল্য অংশ দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে যার উচ্চতা পঁচিশ সেন্টিমিটার এবং গড় প্রস্থ ত্রিশ সেন্টিমিটার। একে শাজরাওয়ান (চলন্ত দুর্লভ) বলা হয়। এটাও হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে বায়তুল্লাহর অংশ। কিন্তু কুরাইশগণ এটাও ছেড়ে দিয়েছিলেন।(১)

টীকা ১)ইবনু হিশাম ১ম খন্ড,ফিকহুস সীরাহ।সহীহুল বুখারী মক্কা ফজিলত অধ্যয়।

হেরা গুহায় ধ্যান মগ্ন

রাসূলুল্লাহ যখন চল্লিশে পদার্পণ করলেন, ঐ সময় তাঁর এতদিনের বিচার বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা-ভাবনা যা জনগণ এবং তাঁর মধ্যে ব্যবধানের এক প্রাচীর সৃষ্টি করে চলেছিল তা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠতে থাকলেন। খাবার এবং পানি সঙ্গে নিয়ে মক্কা নগরী হতে দু'মাইল দূরত্বে অবস্থিত (জাবালে নূর) নূর পর্বতের হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন। এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র আকার-আয়তনের একটি গুহা। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার গজ এবং প্রস্থ পৌনে দু'গজ। এর নীচ দিকটা তেমন গভীর ছিল না। একটি ছোট্ট পথের প্রান্তভাগে অবস্থিত পর্বতের উপরি অংশের একত্রে মিলে মিশে ঠিক এমন একটি আকার আকৃতি ধারণ করেছিল যা শোভাযাত্রার পুরোভাগে অবস্থিত আরোহী শূন্য সুসজ্জিত অশ্বের মতো দেখায়।

পুরো রমাযান রাসূলুল্লাহ (সা) হেরা গুহায় অবস্থান করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকনে। বিশ্বের দৃশ্যমান বস্তুনিচয়ের অন্তরাল থেকে যে মহাশক্তি প্রতিটি মুহূর্তে সকল কিছুকে জীবন, জীবিকা ও শক্তি জাগিয়ে চলেছেন, সমগ্র বিশ্বময় সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের এক শাশ্বত ব্যবস্থা বজায় রেখে চলেছেন, সেই মহা মহীয়ান ও গরীয়ান সত্ত্বার ধ্যানে মশগুল থাকতেন। স্বগোত্রীয় লোকেদের অর্থহীন বহুত্ববাদী বিশ্বাস ও পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা তাঁর অন্তরে দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত। কিন্তু তাঁর সামনে এমন কোন পথ খোলা ছিল না যে পথ ধরে তিনি শান্তি ও স্বস্তির সঙ্গে পদচারণা করতে সক্ষম হতেন।('১)

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্জন-প্রিয়তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতের এক মহতী কর্মসূচীর জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন।

যে আত্মার নসীবে নবুওয়াতরূপী এক মহান আসমানী নেয়ামত নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে এবং যিনি পথভ্রষ্ট ও অধঃপতির মানুষকে সঠিকপথ নির্দেশনা দিয়ে করবেন ধন্য তাঁর জন্য যথার্থই প্রয়োজন সমাজ জীবনের যাবতীয় ব্যস্ততা, জীবন যাত্রা নির্বাহের যাবতীয় ঝামেলা এবং সমস্যা থেকে মুক্ত থেকে নির্জনতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মদ (স)-কে বিশ্বব্যবস্থায় সব চেয়ে মর্যাদাশীল ও দায়িত্বশীল-আমানতদার মনোনীত করে তাঁর কাঁধে দায়িত্বভার অর্পণের মাধ্যমে বিশ্বমানবের জীবন বিধানের রূপরেখা পরিবর্তন এবং অর্থহীন আদর্শের জঞ্জাল সরিয়ে শাশ্বত আদর্শের আঙ্গিকে ইতিহাসের পরিমার্জিত ধারা প্রবর্তন করতে চাইলেন, তখন নবুওয়াত প্রদানের তিন বছর পূর্ব হতেই তাঁর জন্য একমাসব্যাপী নির্জনত অবলম্বন অপরিহার্য করে দিলেন যাতে তিনি গভীর ধ্যানের সূত্র ধরে দিব্যজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হন। নির্জন হেরা গুহার সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি বিশ্বের আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ করতেন এবং সকল অস্তিত্বের অন্তরালে লুক্কায়িত

অদৃশ্য রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করতেন যাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসা মাত্রই তিনি বাস্তবায়নের ব্যাপারে ব্রতী হতে পারেন।'

জিবরাঈল (আ)এর আগমন:

নাবী কারীম(সা)-এর বয়সের ৪০তম বছর যখন পূর্ণ হল- এটাই হচ্ছে মানুষের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির বয়স এবং বলা হয়েছে যে, এ বয়স হচ্ছে পয়গম্বরগণের নবুওয়াত প্রাপ্তির উপযুক্ত বয়স-তখন নবুওয়াতের কিছু স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ হতে লাগল। সে লক্ষণগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি যখনই কোন স্বপ্ন দেখতেন তা প্রতীয়মান হতো সুবহে সাদেকের মত। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল ছয়টি মাস যা ছিল নবুওয়াতের সময়সীমার ছয়চল্লিশতম অংশ এবং নবুওয়াতের সময়সীমা ছিল তেইশ বছর। এরপর তিনি যখন হেরাগুহায় নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন এবং এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর অতিবাহিত হতে হতে তৃতীয় বর্ষ অতিবাহিত হতে থাকল তখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর মানুষের উপর স্বীয় রহমত বর্ষণের ইচ্ছে করলেন। তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিবরাঈল (আ)এর মাধ্যমে তাঁর কুরআনুল কারীমের কয়েকটি আয়াতে কারীমা নাযিল করে মুহাম্মদ (সা)-কে নবুওয়াতের মহান মর্যাদা প্রদানে ভূষিত করেন।(২)

বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রমাণাদি গভীরভাবে অনুধাবন করলেই জিবরাঈল এ'র আগমনের প্রকৃত দিন তারিখ ও সময় অবগত হওয়া সম্ভব হবে। আমাদের সন্ধানের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রমাযান মাসে ২১ তারিখ সোমবার দিবাগত রাত্রে। খ্রীষ্টিয় হিসাব অনুযায়ী দিনটি ছিল ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই আগষ্ট। চান্দ্রমাসের হিসাব অনুযায়ী নাবী কারীম (স)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর ছয় মাস বার দিন এবং সৌর হিসাব অনুযায়ী ছিল ৩৯ বছর ৩ মাস ২০ দিন।(৩)

১. আল্লামা সুলায়মান মানসুরপুরী, রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১ম খণ্ড ৪৭ পৃষ্ঠা, ইবনু হিশাম, ১ম খণ্ড, ২৩৫ ও ২৩৬ পৃষ্ঠা। ফী যিলালিল কুরআন:
২,৩.আর রাহীকুল মাখতুম বই হতে।

নবুয়াত লাভ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন চল্লিশ বছর হলো, আল্লাহ তাঁকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য করুণাস্বরূপ এবং গোটা মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা করে পাঠালেন। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের নিকট থেকে আল্লাহ তায়ালা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তাঁরা নাকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনবেন, তাঁকে সমর্থন করবেন এবং তাঁর বিরোধীদের মুকাবিলায় তাঁকে সাহায্য করবেন। আর তাদের প্রতি যারা ঈমান আনবে ও সমর্থন জানাবে তাদেরকেও এ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেবেন। সেই অঙ্গীকার অনুসারে প্রত্যেক নবী নিজ নিজ অনুসারীদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেনে নেয়া ও তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে যান।

'আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন,
"আল্লাহ তায়ালা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করতে ও মানব জাতিকে তাঁর দ্বারা অনুগৃহীত করতে মনস্থ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের অংশ হিসেবে নির্ভুল স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তখন তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের সূর্যোদয়ের মতই বাস্তব হয়ে দেখা দিত। এই সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নির্জনে অবস্থান করার প্রতি আগ্রহী করে দেন। একাকী নিভৃতে অবস্থান তাঁর কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় হয়ে ওঠে।"

তথাহন ইবনে উমাইর থেকে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর এক মাস হেরা গুহায় কাটাতেন। জাহিলিয়াতের যুগে কুরাইশরাও এই একইভাবে মূর্তিপূজা বাদ দিয়ে নিভৃত তপস্যায় মগ্ন হতো। প্রতি বছর একটা মাস তিনি এভাবে নির্জনে ইবাদাত করে কাটাতেন। উক্ত মাসে তাঁর কাছে যত দরিদ্র লোকই থাকতো তাদেরকে তিনি খাবার দিতেন। এক মাসের এই নির্জনবাস সমাপ্ত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাড়ীতে ফিরে যাবার আগে সর্বপ্রথম কা'বা শরীফে প্রবেশ করে সাতবার বা ততোধিক বার তাওয়াফ করতেন এবং একাজ করার পরই কেবল বাড়ীতে ফিরে আসতেন। অতঃপর আল্লাহ কর্তৃক তাঁকে পরম সম্মানে ভূষিত করার মাসটি অর্থাৎ নবুওয়াত প্রাপ্তির বছরের রমযান মাস সমাগত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথারীতি হেরায় অবস্থানের জন্য রওয়ানা হলেন। অবশেষে সেই মহান রাতটি এলো, যে রাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রিসালাত দিয়ে গৌরবান্বিত করলেন। এই সময় আল্লাহর নির্দেশে জিবরীল আলাইহিস্ সালাম তাঁর কাছে আসলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এই অবস্থায় জিবরীল একখণ্ড রেশমী কাপড় নিয়ে আবির্ভূত হলেন। ঐ রেশমী বস্ত্রখণ্ডে কিছু লেখা ছিল। জিবরীল আমাকে বললেন, "পড়ুন"! আমি বললাম, "আমি পড়তে পারি না।”
তখন তিনি আমাকে এমন জোরে আলিঙ্গন করলেন যে, আমি ভাবলাম, মরে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন।" আমি বললাম, "আমি পড়তে পারি না।" তিনি পুনরায় আমাকে সজোরে আলিঙ্গন করলেন। এবারও চাপের প্রচণ্ডতায় আমার মৃত্যুর আশংকা হলো। আবার তিনি ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, "পড়ুন"। আমি বললাম, "কি পড়বো?” তিনি বললেন, "ইকরা বিসমি রাব্বিকা...। অর্থাৎ পড়ুন আপনার সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন, আর আপনার প্রভু সদাশয় অতি। তিনিই কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে সেইসব জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর আমি শোনানো আয়াত কয়টি পড়লাম। এই পর্যন্ত পড়িয়েই জিবরীল থামলে এবং তারপর চলে গেলেন। এরপর আমি ঘুম থেকে উঠলাম। মনে হলো যেন আমি আমার মানসপটে কিছু লিখে নিয়েছি।

এরপর আমি হেরা গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম। পর্বতের মধ্যবর্তী একস্থানে পৌঁছে হঠাৎ ওপর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম "হে মুহাম্মাদ, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরীল।" আমি ওপরে আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, জিবরীল একজন মানুষের আকৃতিতে আকাশের দূর দিগন্তে ডানা দু'খানা ছড়িয়ে দিয়ে আছেন এবং বলছেন, "হে মুহাম্মাদ, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরীল।" আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আকাশের অন্যান্য প্রান্তে তাকিয়ে দেখি, সর্বত্রই তিনি একই আকৃতিতে বিরাজমান। এইরূপ নিশ্চলভাবে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি পিছনে সরতে বা সামনে এগুতে সক্ষম হচ্ছিলাম না। এই সময় খাদীজা আমাকে খুঁজতে লোক পাঠালো। মক্কার উঁচু এলাকায় পৌছে তারা আবার খাদীজার কাছে ফিরে গেল। অথচ আমি তখনো ঐ একই স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এরপর জিবরীল অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে চললাম। খাদীজার কাছে উপনীত হয়ে তার কাছে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলাম। সে বললো, "হে আবুল কাসিম, আপনি কোথায় ছিলেন? আমি আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলাম। তারা মক্কার উচ্চভূমিতে আপনাকে খুঁজে ফিরে এসেছে।" আমি যা কিছু দেখেছিলাম সবকিছু খাদীজাকে খুলে বললাম। খাদীজা বললো, "এ ঘটনাকে আপনি পরম শুভ লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করুন এবং অবিচল থাকুন। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলেছি, আপনি এ যুগের মানবজাতির জন্য নবী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

অতঃপর খাদীজা কাপড়-চোপড়ে আবৃত হয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন খাদীজার চাচাতো ভাই। তিনি খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং আসমানী

কিতাবের জ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিশেষতঃ তাওরাত ও ইনজীল বিশ্বাসীদের নিকট থেকে অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। খাদীজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা ও শোনা সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন। সব শুনে ওয়ারাকা বলে উঠলেন, "কুদ্দুসুন কুদ্দুসুন! মহা পবিত্র ফেরেশতা!
মহা পবিত্র ফেরেশতা!! আল্লাহর শপথ করে বলছি, হে খাদীজা, তুমি বিশ্বাস কর, মুহাম্মাদের নিকট সেই মহান দূতই এসেছেন যিনি মূসার নিকট আসতেন। বস্তুতঃ মুহাম্মাদ বর্তমান মানব জাতির জন্য নবী মনোনীত হয়েছেন। ২১ তাঁকে বলো, তিনি যেন অবিচল থাকেন।"

খাদীজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে গেলেন এবং ওয়ারাকা যা বলেছেন তা তাঁকে জানালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেরা গুহায় মাসব্যাপী ইবাদাত শেষ হলে তিনি মক্কায় ফিরে যথারীতি কা'বার তাওয়াফ করতে শুরু করলেন। এই সময় ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাতিজা, তুমি যা দেখেছো ও শুনেছো- বলতো।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সমস্ত ঘটনা বললেন। সব শুনে ওয়ারাকা বললেন, "নিশ্চিত জেনো, তুমি এ যুগের মানব জাতির নবী। সেই মহাদূতই তোমার কাছে এসেছিলেন যিনি মূসার কাছেও আসতেন। তুমি এটাও নিশ্চিত জেনে রেখো যে, তোমার বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে, নির্যাতন করা হবে। তোমাকে দেশান্তরিত করা হবে এবং তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। আমি যদি তখন জীবিত থাকি তাহলে অবশ্যই আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করবো।" অতঃপর ওয়ারাকা তাঁর কাছে মাথা এগিয়ে নিয়ে এলেন এবং তাঁর কপালে চুমু খেলেন। তাওয়াফ সমাপ্ত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ী ফিরে গেলেন।(১)
টীকা ১.সীরাতে ইবনে হিশাম বই।

খাদিজা (রা) ইসলাম গ্রহণ

খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনলেন। আল্লাহর কাছ থেকে যে প্রত্যাদেশ তিনি পেলেন তা সত্য বলে মেনে নিলেন। নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের কাজে তাঁকে সহযোগিতা করলেন। বস্তুতঃ তিনিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও তাঁকে সত্যরূপে গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি।

এভাবে আল্লাহ তাঁর নবীর দুঃখ-কষ্টকে লাঘব করেন। যখনই অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হতো, কেউ তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করতো ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো, তখন তিনি মর্মাহত হতেন। কিন্তু খাদীজার কাছে গেলেই আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর মনোকষ্ট দূর হয়ে যেতো। খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন, তাঁর মনের দুঃখ-বেদনা হালকা করে দিতেন, তাঁর দাওয়াতকে সম্পূর্ণ সত্য বলে স্বীকৃতি দিতেন এবং মানুষের আচরণকে যাতে তিনি হালকাভাবে গ্রহণ করেন, সেজন্য অনুপ্রাণিত করতেন। আল্লাহ তাঁর (খাদীজার) ওপর রহমত নাযিল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এ কারণে আমি খাদীজাকে জান্নাতে এমন একটি গৃহের সুসংবাদ দিতে আদিষ্ট হয়েছি, যে গৃহ অনুপম কারুকার্যখচিত মুক্তার তৈরী এবং যেখানে কোন হৈ চৈ, দুঃখ-কষ্ট ও অসুস্থতা থাকবে না।"

অগ্রগামী ইসলাম কবুলকারী

খাদিজা ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম। তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত নবীজিকে সাহায্য-সহযোগিতা করে যান। ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দাস হলেন যাইদ ইবন হারিসা, ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম শিশু হলেন আলী ইবন আবি তালিব এবং ইসলাম গ্রহণকারী সর্বপ্রথম পুরুষ হলেন আবু বকর সিদ্দীক। তবে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম পুরুষ কে তা নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন আবু বকর, কেউ বলেন আলী ইবন আবি তালিব। ইবন হাজার আল-আসকালানী এ মতবিরোধটি সমাধানের চেষ্টা করেন, তাঁর মতে, ইসলাম গ্রহণকারী সর্বপ্রথম পুরুষ আবু বকর, কেননা, আলী ইবন আবি তালিব বড়ই হয়েছেন নবুওয়াতের ঘরে, তিনি মক্কার কুরাইশদের ধর্ম গ্রহণই করেননি। ছোটবেলা থেকেই তিনি মুসলিম হিসেবে বড় হয়েছেন, তাই তাঁর অমুসলিম অবস্থা থেকে মুসলিম হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আবু বকর দাসদেরকে মুক্ত করা ছাড়াও নানানভাবে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন, তিনি ছিলেন অনেক ধনী এবং কুরাইশদের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ দান করার জন্য তিনি অনেক নন্দিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজের প্রভাবশালী লোকেদের একজন। সমস্ত সম্পদ ইসলামের উপকারে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। তাঁর সব সম্পদ, জ্ঞান ঢেলে দিয়েছিলেন নবী করীমের সেবায়। তিনি ছিলেন ইসলামের একজন মিশনারী। আর এ কারণেই তাঁকে বলা হয় 'সিদ্দীক্ব', তিনি ছিলেন মু'মিন পুরুষদের মধ্যে প্রথম জন। সিদ্দীক মানে যে বিশ্বাস করেছে। লোকেরা রাসূলুল্লাহকে অবিশ্বাস করেছিল, আর আবু বকর তাঁকে বিশ্বাস করেছেন। বলা হয়ে থাকে, ইসলাম গ্রহণের সময়ে প্রত্যেকেই অন্তত মুহূর্তের জন্যে হলেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছে, কিন্তু আবু বকরের ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। যখনই তাঁর সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করা হয়, তিনি সেটা সাথে সাথে গ্রহণ করেন, তাঁকে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হয়নি। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে আল্লাহর রাসূলের সামনে হাজির হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সেই স্বাধীন পুরুষ যিনি সর্বাগ্রে মুহাম্মাদকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেন, তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মিরাজের ঘটনায় সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেন, তিনি হলেন সেই মুসলিম যিনি রাসূলের হিজরতের বিপদসংকুল সময়ে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহর সাহাবীদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি আপন ছিলেন তা নিয়ে একটি হাদীস আছে: আবু দারদা বর্ণনা করেন, একবার আবু বকর এবং উমারের মধ্যে ঝগড়া হয়। এই দুইজন ছিলেন রাসূলুল্লাহর সবচে কাছের মানুষ, তাঁর উপদেষ্টা। আলী ইবন আবি তালিব বলেন, 'আমি দেখেছি, রাসূল যখনই কোথাও যেতেন, আবু বকর ও উমারকে সাথে করে যেতেন, কোথাও

থেকে আসলে তাদের সাথে করে আসতেন, যখন তিনি বসতেন তাঁর এক পাশে থাকতো আবু বকর আর আরেক পাশে উমার।'

কিন্তু তারপরেও রাসূলুল্লাহর বিশেষ টান ছিল তাদের প্রতি যারা ইসলামের একেবারে প্রথম যুগে মুসলিম হয়েছিলেন। কাজেই যখন আবু বকরের সাথে উমারের ঝগড়া হলো, রাসূলুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের নিকট আমাকে পাঠিয়েছেন আর তোমরা আমাকে বলেছিলে-আপনি মিথ্যা বলছেন, কিন্তু তোমাদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল আবু বকর, সে আমাকে বলেছিল-আপনি সত্য বলছেন, সে নিজেকে ও তার ভাগ্যকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিল, এরপরেও কি তোমরা আমার এই বন্ধুকে শান্তিতে থাকতে দেবে না? দেবে না শান্তিতে থাকতে?'

প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত

ইসলামের প্রারম্ভিক দাওয়াহ ছিল গোপন পর্যায়ে, কুরআনে আল্লাহ এই আদেশ করেছেন।

"আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।" (সূরা আশ-শুআরা, ২৬: ২১৪)

এই আয়াতটি যখন নাযিল হলো তখন মুহামাদ বেরিয়ে পড়লেন এবং আস-সাফা পাহাড়ে উঠে বলে উঠলেন, "ইয়া সাবাহা!" – ইয়া সাবাহা বলাটা সে যুগে ঘন্টা বা সাইরেন বাজানোর মতো একটি বিষয় ছিল। খুব গুরুতর কোনো ঘটনা হলে এই কথাটি বলা হয়। কাজেই যারাই তাঁর ডাক শুনতে পেল, তারা তার দিকে চলে গেল এবং যারা যেতে পারছিল না তারা অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিল তিনি কী বলেন তা শুনে আসার জন্য।
যখন সবাই একত্রিত হলো, রাসূল ও তাদেকে জিজ্ঞেস করলেন,

আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের পেছনে এক সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা করছে তোমাদের অতর্কিতে হামলা করার জন্য, তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?

আমরা তো কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি।

আমি এসেছি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতে, যদি তোমরা বিশ্বাস না করো, তাহলে তা তোমাদের উপর আপতিত হবে। (১)

রাসূলুল্লাহর এই কথাগুলোই ছিল কুরাইশদের প্রতি ইসলামের প্রথম দাওয়াহ। লক্ষণীয়, তাঁর কথাগুলো খুব সোজাসাপ্টা এবং পরিমিত। এভাবে কথা বলার কারণ হলো আল্লাহ নবীদেরকে আদেশ করেছেন স্পষ্ট বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। তাদের দায়িত্ব হলো 'বালাঘুল মুবীন', এর অর্থ হলো, ইসলামকে মানুষের সামনে অস্পষ্টভাবে, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে, এদিক-ওদিক করে, রাখ-ঢাক রেখে, কিছুটা গোপন করে, কিছুটা প্রকাশ করে, মধু-মাখাভাবে উপস্থাপন করা যাবে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আজকে আমরা যখন মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছি, আমাদের দাওয়াতে শ্রোতাদের মনে বিভ্রান্তির জন্ম হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ তাঁর দাওয়াতে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখেননি। তাঁর কথা শুনে শ্রোতারা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে, যদি তারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাহলে তারা জান্নাতে যাবে আর অবিশ্বাস করলে জাহান্নাম।

যাই হোক, রাসূলুল্লাহ সবাইকে ডাকলেন এবং তারা ভাবলো নিশ্চয়ই খুব জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ডাকা হচ্ছে। বিষয়টি আসলেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু তা অনুধাবনের ক্ষমতা সকলের ছিল না। তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব বলে উঠলো, 'তোমার সারা দিন মাটি হোক, এই কথা বলতে তুমি আমাদের ডেকেছ?' আবু লাহাব খুবই বিরক্ত ও রাগান্বিত হলো। কারণ তাকে তার কাজ ছেড়ে এসে এসব কথা শুনতে হয়েছিল। ব্যবসার ব্যস্ত সময়ে কেনাবেচা ছেড়ে রাসূলের কথা শোনা ছিল তার জন্য নিতান্তই গুরুত্বহীন একটি ব্যাপার। আবু লাহাবদের মতো লোকদের কাছে কাজ ফেলে জীবন, মৃত্যু, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কথা শোনা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। সে ছিল প্রচণ্ড দুনিয়াবী, ওই সময়টা তার কাছে নিছকই টাকা কামানোর সময়। এমন ভাবনা তার একার নয়, মুসলিমদের মধ্যেও তার মতো অনেকেই আছে। তারা ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলাকে স্রেফ সময় নষ্ট জ্ঞান করে, তারা শুধু সেই কাজে ও কথায় মন দেয় যা তাদেরকে দুনিয়াতে উপকার করবে। কিন্তু দুনিয়ার পরের জীবনে কী তাদের উপকারে আসবে সেটা জানার সময় তাদের হয়ে ওঠে না।

সূরা লাহাবের প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,
"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের উভয় হাত, আর সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ ও যা সে অর্জন করেছে তা তার কোনো কাজে আসবে না।” (সূরা লাহাব, ১১১: ১-২)

আল্লাহ তাআলা বলছেন তার এই সম্পদ, অর্থ কোনো কাজেই আসবে না। যারা দুনিয়ার পেছনে ছুটে বেড়ায়, দুনিয়া তাদের কোনো কাজে আসবে না, যদি না তারা ইসলামের আলোকে জীবনযাপন করে। এই সূরাটি কুরআনের অলৌকিকত্বের একটি প্রমাণও বটে। কেননা, এই আয়াতে বলছে, আবু লাহাব ও তার স্ত্রী জাহান্নামে যাবে। এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন তারা বেঁচে ছিল, যদি তারা কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চাইতো, তারা মুসলিম হয়ে গেলেই তা করে ফেলতে পারতো, কেননা কুরআন বলেছে তারা জাহান্নামী হবে আর তারা মুসলিম

হয়ে গেলে এই কথা মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু না, তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাফের ছিল আর সে অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে।

টীকা ১.আল বিদায়া ওয়া নিহায়া।সীরাহ ব ই।

প্রকাশ্য দাওয়াতের পর মক্কার মানুষের প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহর ও দাওয়াহর জবাবে কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া ছিল বহুমাত্রিক। এক এক পর্যায়ে তারা এক এক রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। সামগ্রিকভাবে তাদের প্রতিক্রিয়াকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যেতে পারে:

১। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

২। অপমান

৩। চরিত্রহননের চেষ্টা

৪। ইসলামের বার্তাকে বিকৃত করা এবং কুৎসা রটানো

৫। রাসূলুল্লাহর সাথে আপোস করা বা সমঝোতার চেষ্টা করা

৬। প্রলোভন

৭। চ্যালেঞ্জ

৮। চাপ প্রয়োগ

৯। হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা

১০। নির্যাতন-নিপীড়ন

১১। গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা

ক্রমেই কুরাইশরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সহচরদের শত্রুতায় তারা বেসামাল হয়ে উঠলো। তারা মূর্খ ও বখাটে ধরনের লোকদের উস্কিয়ে দিতে লাগলো। এইসব অর্বাচীন তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে গালাগালি এবং নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগলো। তাঁকে কবি, যাদুকর, জ্যোতিষী ও পাগল বলে অপবাদ দিলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দীন প্রচার ও প্রসার করার কাজে অবিচল থাকলেন। ক্রমেই তিনি অধিকতর প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দিতে লাগলেন। 'আরবদের বাতিল রসম রেওয়াজের সমালোচনা, তাদের মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান ও তাদের কুফরী মতবাদের সাথে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদের কথা তাদের কাছে ঘোর আপত্তিকর হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তা করতে লাগলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বলেন-

"একদিন যখন কুরাইশ সরদারগণ হাজরে আসওয়াদের নিকট সমবেত হয়েছে, তখন আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে

বললো, "এই লোকটার ব্যাপারে আমরা যতটা সহিষ্ণুতা দেখিয়েছি তা নজিরবিহীন। সে আমাদেরকে বোকা বানিয়েছে এবং আমাদের দেবদেবীকে গালাগালি করেছে। অত্যন্ত নাজুক ও মারাত্মক ব্যাপারে আমরা তাকে সহ্য করেছি।" এভাবে তাদের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকাকালে সহসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আবির্ভূত হলেন। শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। অতঃপর সমবেত লোকদের পাশ দিয়ে তিনি পবিত্র কা'বার তাওয়াফ করতে লাগলেন। তাদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলে আমি সে মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। দ্বিতীয়বার যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন তখন তারা আবার শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেহারায় আমি তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। তৃতীয় বারে তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় আবার তারা অনুরূপ মন্তব্য করলে তিনি সেখানে থেমে বললেন, "হে কুরাইশগণ, শোন, যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের সর্বনাশ বয়ে এনেছি (যদি তোমরা ঈমান না আন)।"

তাঁর উক্তিতে জনতা বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ ও হতবাক হয়ে গেল। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ক্ষণকাল আগেও তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী আক্রোশ ও উস্কানিমূলক কথা বলেছে, সেও যথাসম্ভব মিষ্ট কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শান্ত করতে উদ্যত হলো। এমনকি সে বলতে বাধ্য হলো, "আবুল কাসিম, তুমি যাও। তুমি তো আর নির্বোধ নও।"

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে চলে গেলেন। পরদিন আবার সবাই একই স্থানে সমবেত হলো। আমিও সেখানে ছিলাম। তখন তারা বলাবলি করতে লাগলো, "দেখলে তো! মুহাম্মাদের কতদূর বাড় বেড়েছে এবং সে কতদূর ধৃষ্টতা দেখালো। তোমরা যে কথা একেবারেই পছন্দ কর না তা সে তোমাদের মুখের ওপর স্পষ্ট বলে দিল। আর তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আবির্ভূত হলেন। আর যায় কোথায়! সকলে একযোগে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সবাই তাঁকে ঘেরাও করে বলতে থাকলো, "তুমিই তো আমাদের ধর্ম ও দেব-দেবীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর কথা বলে থাকো।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, আমিই ঐসব কথা বলে থাকি।" আমি দেখলাম তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে তাঁর গলার ওপরের চাদরের দু'পাশ ধরে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। সেই মুহূর্তে হযরত আবু বাক্স এগিয়ে গিয়ে বাধা দিলেন।

তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, “একটি লোক আল্লাহকে নিজের রব বলে ঘোষণা করেছে, এই কারণে কি তোমরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে।"

এরপর জনতা সেখান থেকে চলে গেল। সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরাইশদের যেরূপ মারাত্মক আক্রমণ দেখেছি, তেমন আর কখনও দেখিনি।"

হামযার ইসলাম গ্রহণ

"একদিন সাফা পর্বতের পাশে আবু জাহল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পায়। ঐ সময় সে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে ও তাঁকে গালি দেয়। সে তাঁকে অত্যন্ত অপ্রীতিকর কথা বলে। ইসলামের বিরুদ্ধে কটূক্তি এবং তাঁর দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রতি শ্লেষাত্মক বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে কোন একটি কথা বললেন না। আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের এক দাসী নিজের ঘরে বসে এসব কটূক্তি শুনতে পায়। অতঃপর আবু জাহল সে স্থান ত্যাগ করে কা'বার পাশে কুরাইশদের এক দরবারে গিয়ে বসে।

এর অল্পক্ষণ পরেই আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হামযা তীর-ধনুক সজ্জিত অবস্থায় শিকার থেকে ফিরছিলেন। তিনি একজন ভাল শিকারী ছিলেন। শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপে ও শিকারের সন্ধান করায় তিনি বেশ পটু ছিলেন। এ রকম শিকার করে যখনই তিনি ফিরতেন তখন পথে কুরাইশদের কোন দরবার বা জটলা দেখলে সেখানে থামতেন, সালাম দিতেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। তিনি ছিলেন কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত ও তাগড়া জোয়ান। তিনি যখন আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের দাসীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ী ফিরে গিয়েছেন। দাসী হামযাকে দেখেই বললো, "একটু আগে হিশামের পুত্র আবুল হাকাম(১) তোমার ভাতিজা মুহাম্মাদের সাথে কি আচরণ করেছে তা যদি দেখতে। এখানে মুহাম্মাদ বসা ছিল। তাকে দেখেই সে তার সাথে দুর্ব্যবহার ও গালাগালি করেছে। তার সাথে অত্যন্ত আপত্তিকর আচরণ করেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা কথাও না বলে চলে গেল।"

হামযা এ কথা শুনে ক্রোধে অধীর হয়ে পড়লেন। কেননা আল্লাহ তাঁকে ইসলামের গৌরব মুকুট পরাতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি আবু জাহলের সন্ধানে দ্রুত ছুটে গেলেন। পথে কারো কাছে দাঁড়ালেন না। তাঁর ইচ্ছা আবু জাহলকে পেলেই তাকে শিক্ষা দেবেন। মসজিদে হারামে

ঢুকেই দেখলেন, সে দরবার জমিয়ে বসে আছে। তিনি তার দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছে গিয়েই ধনুক দিয়ে তাকে প্রচণ্ড আঘাত করে গুরুতরভাবে জখম করে দিলেন। অতঃপর বললেন, "তুই মুহাম্মাদকে গালাগালি করিস? অথচ আমি তার ধর্ম গ্রহণ করেছি। সে যা কিছুই বলে আমি তা সমর্থনকারী। পারিস তো আমাকে পাল্টা আঘাত কর দেখি।"

তৎক্ষণাৎ বনী মাখযুম গোত্রের কিছু লোক ছুটে এল হামযার বিরুদ্ধে আবু জাহলকে সাহায্য করতে। কিন্তু আবু জাহল বললো, "তোমরা হামযাকে কিছু বলো না। কেননা আমি সত্যিই তার ভাতিজাকে অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় গালাগালি করেছি।"

হামযা ইসলামের ওপর দৃঢ় ও অবিচল রইলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রমে সাহায্য ও সহায়তা অব্যাহত রাখলেন। হামযার (রা) ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশরা উপলব্ধি করলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এখন আর নিপীড়ন ও হেয় করা সহজ হবে না। কিছু করতে গেলেই হামযা এসে রুখে দাঁড়াবে। তাই আপাততঃ তারা উৎপীড়নের মাত্রা কিছুটা কমিয়ে দিল।

টীকা ১. আবুল হাকাম আবু জাহলের উপনাম বা উপাধি। তার নাম আমর ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে মাখযুম।

কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে নবীজীর কথোপকথন

মক্কার কুরাইশ গোত্রসমূহের নারী ও পুরুষদের মধ্যে ইসলাম ক্রমান্বয়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। আর কুরাইশরা মুসলমানদের যাকে পারতো আটক করে রাখতো এবং যাকে পারতো তার ওপর কঠিন অত্যাচার চালাতো!

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একদিন সূর্যাস্তের পর প্রত্যেক গোত্র থেকে কুরাইশ সরদারগণ কা'বা শরীফের নিকট জমায়েত হলো। যারা জমায়েত হলো তারা হচ্ছে উতবা ইবনে রাবীয়া, শাইবা ইবনে রাবীয়া, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, নাদার ইবনে হারেস, আবুল বুখতারী ইবনে হিশাম, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, যামআ ইবনে আসওয়াদ, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আবু জাহল ইবনে হিশাম, আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া, আস ইবনে ওয়ায়েল, নুবাইহ্ ইবনে হাজ্জাজ, মুনাববিহ ইবনে হাজ্জাজ এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ। তারা পরস্পরকে বলতে লাগলো, "মুহাম্মাদকে ডেকে পাঠাও তার সাথে কথা বল, প্রয়োজনে ঝগড়াও কর। তাহলে জনতার কাছে তোমরা দোদ এড়িয়ে যেতে পারবে।" যথার্থই তাঁর কাছে দূত পাঠানো হলো। দূত গিয়ে বললো, "কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তোমার সাথে কথা বলার জন্য জমায়েত হয়েছেন। তাদের কাছে একটু চলো।"

একথা শোনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রস্তপদে তাদের কাছে ছুটে এলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, তিনি তাদের কাছে যে দাওয়াত দিয়েছেন সে সম্পর্কেই বোধ হয় তারা নতুন কিছু চিন্তাভাবনা করেছে। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্তরিকভাবে কামনা করতেন যে, তারা সঠিক পথে ফিরে আসুক। তাদের গোয়ার্তুমী ও অত্যাচারে তিনি ভীষণ দুঃখিত ছিলেন। তিনি গিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের পাশে বসলেন। তারা বললো, "হে মুহাম্মাদ, তোমার সাথে কিছু কথা বলার জন্য আমরা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। খোদার কসম, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ, তেমন আর কোন আরব কখনো করেছে বলে আমাদের জানা নেই। তুমি পূর্বপুরুষদের ভর্ৎসনা করেছ, প্রচলিত ধর্মের নিন্দা করেছ, দেব-দেবীকে গালিগালাজ করেছ, বুদ্ধিমান লোকদের বোকা ঠাউরিয়েছ এবং জাতির ঐক্যে ভাঙ্গন ধরিয়েছ। মোটকথা, আমাদের ও তোমার মধ্যে কোন খারাপ জিনিসই আনতে তুমি বাকী রাখনি। এখন কথা হলো এসব কথা বলে তুমি যদি সম্পদ অর্জন করতে মনস্থ করে থাক, তাহলে আমরা তোমাকে টাকা কড়ি সংগ্রহ করে দিই, যাতে তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী হতে পার। আর যদি এর দ্বারা তুমি পদমর্যাদার প্রত্যাশী হয়ে থাক, তাহলে আমরা তোমাকে সরদার বানিয়ে দিই। আর যদি তুমি রাজা বাদশাহ হতে চাও তাহলে এস তোমাকে আমাদের রাজা বানিয়ে নিই। আর তোমার কাছে যে দূত আসে সে যদি কোন জ্বিন-ভূত হয়ে থাকে এবং তোমার ওপর পরাক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে আমরা যত টাকা লাগুক,

তোমার চিকিৎসা করাতে প্রস্তুত যাতে তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ অথবা তোমার সম্পর্কে জনতার কাছে আমাদের কোন জবাবদিহি করতে না হয়।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেন, "তোমরা যা যা বলছ তার কোনটাই আমি চাই না। আমি যে দাওয়াত তোমাদের কাছে পেশ করেছি তার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমি তোমাদের সম্পদ চাই কিংবা তোমাদের মধ্যে পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ হতে চাই কিংবা তোমাদের রাজা হতে চাই। আমাকে আল্লাহ তোমাদের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার প্রতি এক কিতাব নাযিল করেছেন এবং তোমাদের জন্য সাবধানকারী ও সুসংবাদ দানকারী হতে আমাকে আদেশ করেছেন। তাঁর আদেশ অনুসারে আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণের জন্য সদুপদেশ দিয়েছি। এখন তোমরা যদি আমার এই দাওয়াত গ্রহণ করে নাও, তাহলে সেটা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য বয়ে আনবে। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান কর তাহলে তোমাদের ও আমার ব্যাপারে আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধারণ করবো।"

তারা বললো, "হে মুহাম্মাদ, আমরা যে কয়টা প্রস্তাব তোমার কাছে পেশ করলাম তার কোনটাই যদি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে আর একটা কথা শোনো। তুমি তো জান, দুনিয়ায় আমাদের মত সংকীর্ণ আবাসভূমি আর কারো নেই, পানির অভাব ও অন্যান্য উপকরণের দৈন্যের কারণে আমরা যেরূপ দুঃসহ জীবন যাপন করি, পৃথিবীতে আর কোন জাতি এমন জীবন যাপন করে না। সুতরাং তোমার যে প্রভু তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তার কাছে প্রার্থনা কর যেন তিনি এই পাহাড় পর্বতগুলোকে এখান থেকে দূরে সরিয়ে নেন যাতে আমাদের আবাসভূমি আরো প্রশস্ত হয় এবং তিনি যেন ইরাক ও সিরিয়ার নদ-নদীর ন্যায় আমাদের এ দেশেও নদ-নদী প্রবাহিত করে দেন। তাঁর কাছে আরো প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের পূর্বপুরুষদের পুনর্জীবিত করেন এবং পুনর্জীবিত পূর্বপুরুষদের মধ্যেই কুসাই ইবনে কিলাবও যেন অন্তর্ভুক্ত থাকেন যিনি অন্যতম সত্যবাদী ন্যায়নিষ্ঠ নেতা ছিলেন। তাদেরকে আমরা তোমার কথা সত্য না মিথ্যা জিজ্ঞেস করবো। তারা যদি বলেন তুমি সত্যবাদী এবং আমাদের দাবী অনুসারে তুমি যদি কাজ কর তাহলে আমরা তোমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবো, তোমার খোদাপ্রদত্ত মর্যাদা আমরা স্বীকার করবো এবং তোমাকে যথার্থই আল্লাহর রাসূল বলে মেনে নেব।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, "এসব ব্যাপার নিয়ে আমি তোমাদের কাছে আসিনি। আমাকে আল্লাহ যে জিনিস দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাছাড়া

আর কোন কিছু আমার ইখতিয়ারে নেই। আর যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এটা যদি তোমরা গ্রহণ কর তাহলে এটা দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দেবে। আর যদি অগ্রাহ্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের ও আমার মধ্যে একটা চূড়ান্ত ফায়সালা না করা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধারণ করবো।"

তারা বললো, "এ প্রস্তাবও যদি তোমার মনঃপূত না হয়, তাহলে তুমি নিজের জন্য একটা কাজ কর। তোমার প্রতিপালককে বল তোমার সাথে একজন ফেরেস্তা পাঠাতে। তিনি আমাদের সামনে তোমার কথা সত্য বলে সাক্ষ্য দেবেন এবং তোমার পক্ষ হয়ে আমাদের সাথে কথা বলবেন। আর আল্লাহ তোমার জন্য অনেকগুলো বাগবাগিচা ও প্রাসাদ বানিয়ে দিক এবং অনেক সোনা রূপার ধনদৌলত দান করুক। এতে করে তোমার যে অর্থলিপ্সা দেখতে পাই তা মিটবে। কেননা তুমি তো আমাদেরই মত বাজারে ঘোরাফেরা কর এবং আমাদেরই মত জীবিকা অন্বেষণ কর। তোমার এসব ধনদৌলত হলে আমরা বুঝবো, তুমি যথার্থই আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং তোমার প্রভুর কাছে মর্যাদাবান। তুমি নিজের ধারণা মুতাবিক সত্যিই যদি রাসূল হয়ে থাক তাহলে এসব করে দেখাও তো দেখি।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "না, এটাও আমি করবো না। আমি আল্লাহর কাছে এসব জিনিস চাইতে পারবো না। আমি তোমাদের কাছে এসব জিনিস নিয়ে আসিনি। আল্লাহ আমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছেন। তোমরা যদি আমার আহ্বানে সাড়া দাও, তবে সেটা হবে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের সৌভাগ্যের উৎস। আর যদি প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে আল্লাহ যা করেন তাই হবে। তিনি যতক্ষণ আমার ও তোমাদের মধ্যে নিষ্পত্তি না করে দেন ততক্ষণ আমি ধৈর্য ধারণ করবো।"

তারা বললো, "তাহলে কয়েক টুকরো মেঘ আমাদের মাথার ওপর ফেলে দাও, যেমন তুমি বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা করতে পারেন। এটা না করলে আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো না।"

রাসূলুল্লাহ বললেন, "এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইখতিয়ারাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে অবশ্যই তা করতে পারেন।"

তারা বললো, "হে মুহাম্মাদ, তোমার প্রতিপালক কি এটা জানতেন না যে, আমরা তোমার সাথে বৈঠকে বসবো এবং যা এখন তোমার কাছে চাইলাম তা তোমার কাছে চাইবো? তিনি কি তোমার কাছে এসে আমরা যেসব কথা উত্থাপন করলাম তার জবাব তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারলেন না এবং তোমার দাওয়াত অগ্রাহ্য করলে আমাদের তিনি কি করবেন তা জানাতে

পারলেন না? আমরা জানতে পেরেছি যে, ইয়ামামায় বসবাসকারী 'রাহমান' নামক এক ব্যক্তি তোমাকে এসব কথা শিখিয়ে দেয়।(১) আল্লাহর শপথ, আমরা কখনো রাহমানকে বিশ্বাস করবো না। মুহাম্মাদ, তোমার কাছে আমরা আমাদের অক্ষমতার কথা জানাচ্ছি। তোমার আচরণ আমাদের সাথে যতদূর গড়িয়েছে তাতে আমরা তোমাকে ছাড়বো না। হয় তুমি আমাদের ধ্বংস করবে নচেৎ আমরা তোমাকে ধ্বংস করবো- তার আগে আমরা ক্ষান্ত হবো না।" সমবেত লোকদের একজন বললো, "আমরা ফেরেশতাদের পূজা করি। ফেরেশতারা হলো আল্লাহর মেয়ে।" আর একজন বললো, "আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে হাজির কর। নচেৎ আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো না।"

এসব কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে চলে এলেন। তাঁর ফুফাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরাও তাঁর সাথে এলো। সে বললো, "শোনো মুহাম্মাদ তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমার কাছে কতকগুলো প্রস্তাব পেশ করলো। তার একটাও তুমি গ্রহণ করলে না। তারপর তারা এমন কতকগুলো জিনিস তোমার কাছে দাবী করলো যা দ্বারা আল্লাহ তোমাকে যে পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন বলে তুমি নিজে বলে থাক তা জানতে ও বুঝতে পারে এবং তোমাকে স্বীকার করতে ও তোমার অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু তুমি সে দাবীগুলোও পূরণ করলে না। তুমি যে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তুমি যে আল্লাহর রাসূল তা জানার জন্যও তারা কিছু দাবী জানালো তোমার কাছে। তুমি তাও রাখলে না। আল্লাহর কসম, তুমি একটা সিঁড়ি দিয়ে আকাশে চড়বে এবং তোমাকে আকাশে উঠে যেতে আমি স্বচোখে দেখবো, অতঃপর তোমার সাথে চারজন ফেরেশতা আসবেন এবং তারা তোমার দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য দেবে- তা না হলে আমি তোমার ওপর ঈমান আনবো না। এমনকি তুমি যদি এসব করে দেখিয়ে দাও তাহলেও আমার মনে হয় না যে, আমি তোমার ওপর ঈমান আনব।”

এরপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে ত্যাগ করে অত্যন্ত ব্যথিত ও বিষণ্ণ মনে বাড়ী চলে এলেন। কেননা তাঁকে যখন ডেকে নেয়া হয় তখন তিনি খুবই আশান্বিত হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ যখন দেখলেন যে, তারা তাঁর থেকে আরো দূরে সরে গেল, তখন তাঁর দুঃখের সীমা থাকলো না।

(১) লোকটি হলো মুসাইলিমা ইবনে হাবিব হানফী। সে মুসাইলিমা কাযযাব (মিথ্যাবাদী) নামে প্রসিদ্ধ। সে বয়সে প্রবীণ ছিল এবং জাহিলী যুগে তাকে 'রাহমান' বলে ডাকা হতো। (রাউদুল আনফ)

দুর্বল মুসলিম দের উপর অত্যাচার

যারা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করছিলো সেসব সাহাবার ওপর মুশকিরা ভীষণ অত্যাচার চালাতে লাগলো। প্রত্যেক গোত্র তার মধ্যকার মুসলমানদের ওপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কোথাও বা তাদেরকে অন্তরীণ রেখে মারপিট করে, ক্ষুৎপিপাসায় অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়ে, কোথাও বা দ্বি-প্রহরের প্রচণ্ড গরমের সময় মক্কার রৌদ্রতপ্ত মরুপ্রান্তরে শুইয়ে দিয়ে নির্যাতন চালাতে থাকলো।

যারা দুর্বল এভাবে নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হতো। কেউ কেউ অসহ্য নির্যাতনের চাপে ইসলাম ত্যাগ করতো। আবার কেউ কেউ সাহায্য সমর্থন পেত এবং এভাবে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করতেন।

আবু বাক্স রাদিয়াল্লাহু আনহুর আযাদকৃত ক্রীতদাস বিলাল এক সময় বনু জুমাহ গোত্রের এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বিলাল ইবনে রাবাহ। তাঁর মার নাম ছিল হামামাহ। তিনি তাদের মধ্যেই আশৈশব লালিত পালিত হয়েছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান ও পবিত্রাত্মা মুসলিম ছিলেন। উমাইয়া ইবনে খালাফ ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযাফা ইবনে জুমাহ রৌদ্রতপ্ত দুপুরে তাঁকে মক্কার সমভূমিতে নিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিতো। অতঃপর তাঁর বুকের ওপর একটা প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়ে রাখার নির্দেশ দিত। তারপর তাকে বলতো, "মুহাম্মাদকে অস্বীকার করে লাত ও উয্যার পূজা করতে রাজী না হলে আমৃত্যু এভাবেই থাকতে হবে" এহেন কঠিন যন্ত্রণা ভোগের মুহূর্তেও তিনি বলতেন, "আহাদ! আহাদ" অর্থাৎ আল্লাহ এক, আল্লাহ এক। তিনি এভাবে নির্যাতন ভোগের সময় যখন 'আহাদ', 'আহাদ' উচ্চারণ করতেন, তখন মাঝে মাঝে ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল তাঁর কাছ দিয়ে যেতেন। বিলালের ঐ কথা শুনে ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলও সাথে সাথে বলতেন, "আল্লাহর শপথ, হে বিলাল, সত্যই আল্লাহ এক, আল্লাহ এক।" এরপর ওয়ারাকা উমাইয়া ইবনে খালাফের কাছে এবং বিলালকে নির্যাতনকারী বনী জুমাহ গোত্রের অন্যান্যদের কাছে যেয়ে বলতেন, "আল্লাহর শপথ, এই কারণে তোমরা যদি তাকে মেরে ফেল, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই মহাপুণ্যবান মনে করবো এবং তার পদধূলি নেবো।" একদিন সেখান দিয়ে আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন বিলালকে সেই একই পন্থায় নির্যাতন করা হচ্ছে। তিনি উমাইয়া ইবনে খালাফকে বললেন, "এই অসহায় মানুষটাকে নির্যাতন করতে তোমার কি একটুও আল্লাহর ভয় হয় না? আর কত দিন এটা চালাবে?"

সে বললো, "তুমিই তো ওকে খারাপ করেছো। এখন তুমিই ওকে এ অবস্থা থেকে রেহাই দাও।"

আবু বাক্স বললেন, "আমি তাই করবো। আমার কাছে ওর চেয়েও তাগড়া ও শক্তিশালী একটা ছেলে আছে। সে তোমার ধর্মের অনুসারী। এর বদলে আমি তাকে দিয়ে দেবো।" সে বললো, "আমি রাজী।" আবু বাকর বললেন, "আমি রাজী। সেটা তোমাকে দিলাম।" অতঃপর তিনি সেটা দিয়ে দিলেন উমাইয়াকে এবং উমাইয়ার কাছ থেকে বেলালকে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।

হিজরাতের আগে আবু বাকর বিলাল সহ মোট সাতজন নওমুসলিম গোলামকে স্বাধীন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন আমের ইবনে ফুহাইরা, উম্মে উবাইস এবং যিননীরা। যিননীরাকে মুক্ত করার সময় তাঁর চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশরা তা দেখে বললো, "ওর চোখ নষ্ট হয়েছে লাত ও উয্যার অভিশাপেই।" যিননীরা বললেন, "আল্লাহর ঘরের শপথ, ওরা মিথ্যা বলছে। লাত ও উযযা কারো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না।" পরে আল্লাহ তাঁর চোখ ভালো করে দিয়েছিলেন। ১

বনী আবদুদ দারের এক মহিলার বাঁদী নাহদিয়া ও তাঁর মেয়েকেও তিনি মুক্ত করেন। তাঁদের মনিব যখন তাঁদেরকে কিছু আটা দিয়ে কোথাও পাঠাচ্ছিল এবং বলছিল, "আল্লাহর শপথ, তোদের আমি কখনো মুক্ত করবো না", তখন আবু বাক্স সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কথাটা শোনামাত্রই বললেন, "হে অমুকের মা, তুমি শপথ ভঙ্গ কর।" সে বললো, "কী বলছো! শপথ ভঙ্গ করবো? তুমিই তো ওদেরকে খারাপ করেছো। এখন তুমিই মুক্ত কর।" আবু বাকর বললেন, "আমি ওদেরকে নিয়ে নিলাম। ওরা মুক্ত ও স্বাধীন।" মেয়ে দুটিকে বললেন, "তোমরা মহিলার আটা ফিরিয়ে দাও।" মেয়েদ্বয় বললো, "হে আবু বাক্স, আগে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেব এবং পরে আটা ফিরিয়ে দেব কি?" আবু বাকর বললেন, "সে তোমাদের ইচ্ছা।"

আর একবার তিনি বনী মুয়াম্মালের একজন নও মুসলিম বাঁদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব তাঁর উপর নির্যাতন চালিয়ে তাঁকে ইসলাম ত্যাগের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। উমার তখনো মুশরিক। তিনি মারতে মারতে যখন ক্লান্ত হয়ে গেলেন তখন তাকে বললেন, "তোর কাছে আমি ওজর জানাচ্ছি যে, শুধু ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই তোকে আর মারতে পারলাম না।" মেয়েটি বললো, "আল্লাহ তোমার সাথে যেন এরূপ আচরণই করেন।" এই দৃশ্য দেখে আবু আর তৎক্ষণাৎ বাঁদীটি কিনে নিয়ে যুক্ত করে দিলেন।

আবু বাক্সের (রা) পিতা আবু কুহাফা একদিন তাঁকে বললেন, "বেটা, আমি দেখছি তুমি শুধু দুর্বল দাস দাসীদেরকে মুক্ত করছো। যদি তুমি শক্তিশালী জোয়ান পুরুষ দাসদের মুক্ত করতে তাহলে প্রয়োজনের সময় তারা তোমার পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারতো।" একথা শুনে আবু বাকর বললেন, "হে পিতা, আমি যা করছি তা একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করছি।"

বনু মাখযুম গোত্রের লোকেরা আম্মার ইবনে ইয়াসার ও তাঁর পিতামাতাকে তপ্ত দুপুরের সময় মক্কার উতপ্ত মরুভূমিতে নিয়ে নির্যাতন করতো। তাঁদের গোটা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ওপর নির্যাতন চলাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাছে উপস্থিত হতেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, হে ইয়াসারের পরিবার, ধৈর্য ধারণ কর। তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।" আম্মারের মাতাকে (সুমাইয়া) তারা মারতে মারতে মেরেই ফেললো। তথাপি তিনি ইসলাম ত্যাগ করেননি।

আর পাপিষ্ঠ আবু জাহল যখনই শুনতো যে অমুক ইসলাম গ্রহণ করেছে, অমনি তার বিরুদ্ধে কুরাইশদেরকে উস্কিয়ে দিত। ইসলাম গ্রহণকারী যদি ভালো পদমর্যাদাধারী ব্যক্তি হতো তাহলেও তাঁকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতো এবং বলতো, "তুমি তোমার বাপের ধর্ম ত্যাগ করেছ। অথচ তোমার বাপ তোমার চেয়েও উত্তম। কাজেই আমরা তোমাকে বেকুফ প্রতিপন্ন করবো, তোমার মতামত যে খারাপ ও ভুল, তা আমরা প্রমাণ করে ছাড়বো, তোমার মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে তবে ক্ষান্ত হবো।" আর যদি তিনি ব্যবসায়ী হতেন তবে তাঁকে বলতো, "আমরা তোমার ব্যবসায়ের সর্বনাশ ঘটাবো এবং তোমার মালপত্র নষ্ট করে দেবো।" আর যদি দুর্বল কেউ হতো তাহলে মারপিট করতো ও তার বিরুদ্ধে লোকজনকে লেলিয়ে দিত।

সাঈদ ইবনে যুবাইর বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের ওপর কি এতদূর অত্যাচার চালাতো যার ফলে তারা ইসলাম ত্যাগ করলেও তাদের ওপর দোষারোপ করা চলতো না?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ। তারা তাঁদেরকে প্রহার করত এবং অনাহার ও পিপাসায় কষ্ট দিত। তাঁদের এক একজন এ ধরনের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে এতদূর হীনবল হয়ে পড়তেন যে, সোজা হয়ে বসে থাকতেও পারতেন না।

মুসলমানদের প্রথম হিজরত আবিসিনিয়ায়

হাবাশা অর্থাৎ আবিসিনিয়াতে দু'বার হিজরত হয়েছিল। প্রথমবার বারো জন পুরুষ ও চার জন মহিলার একটি ছোট দল সেখানে হিজরত করে। এটি নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের ঘটনা। আর দ্বিতীয়বার বেশ বড়সড় একটি দল হিজরত করে। সে দলে ছিল তিরাশি জন পুরুষ এবং আঠারো-উনিশ জন মহিলা।

প্রথম দলটি আল-হাবাশাতে পৌঁছে গুজব শুনতে পায় যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলিম হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল ভিন্ন। রাসূলুল্লাহ সূরা আন-নাজমের আয়াতগুলো কুরাইশদের লোকদের পড়ে শোনালে সেই আয়াতগুলো তাদেরকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। তিনি শেষ আয়াতে পৌঁছানো মাত্রই সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। এই শেষের আয়াতটি ছিল সিজদাহ'র আয়াত। সে সময় নবীজি আর মুসলিমদের সাথে সাথে কাফেররাও সিজদা দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কুরাইশের লোকেরা মুসলিম হয়ে গেছে। ফলে হাবাশা থেকে মুসলিমরা মক্কায় ফিরে আসেন। এসে বুঝতে পারেন যে, এ খবর মিথ্যা।

সাহাবীদের কষ্ট আর যন্ত্রণা দেখে রাসূলুল্লাহ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা হাবাশাতে চলে গেলেই পারো, কেননা সেখানে একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা আছেন। তিনি কারো সাথে জুলুম করেন না।' এই রাজা হলেন আন-নাজ্জাশী, খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। নবীজির পরামর্শ অনুযায়ী সাহাবারা দ্বিতীয়বারের মতো হাবাশায় হিজরত করেন। সবার আগে উসমান ইবন আফফান, তাঁর স্ত্রী নবীকন্যা উম্ম কুলসুমকে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেন। তাঁরা চলে গেলে দ্বিতীয় দলটিও মক্কা ত্যাগ করে। কিন্তু মক্কার লোকেরা তাদেরকে এত সহজে ছেড়ে দেয়নি।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমরা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনোদিক দিয়েই মক্কার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল না। তারপরও কুরাইশরা মুসলিমদের পিছু নিলো। আন-নাজ্জাশীর কাছে দূত পাঠালো যেন সে আবিসিনিয়ার মুসলিমদেরকে তাদের হাতে হস্তান্তর করে দেয়। এই মিশনের জন্য মনোনীত করা হয় আমর ইবন আস এবং আবদুল্লাহ ইবন রাবিআ অথবা আমর ইবন রাবিয়াকে। ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র আমর ইবন আস একজন দক্ষ কূটনীতিবিদ, কুরাইশদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। দেশ বিদেশের বহু লোকের সাথে তার পরিচয়, রাজাবাদশা এবং বড় বড় লোকদের সাথে তার ওঠাবসা। কূটকৌশল আর কথার লড়াইয়ে তুখোড়। তাই এ কাজের জন্য কুরাইশরা তাকেই বেছে নেয়।

আমর ইবন আস নাজ্জাশীর দরবারে গেলো। কথা ছিল, সে প্রথমে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করবে। তাদের প্রত্যেককে কিছু 'উপহার' দিয়ে-সোজা বাংলায় ঘুষ দিয়ে, তারপর

নিজের প্রস্তাবনা তুলবে। তার কথার সারমর্ম হবে এরকম: মক্কার কিছু মূর্খ লোক পালিয়ে তোমাদের দেশে ঢুকেছে, আমরা চাই তোমরা তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও। অর্থাৎ তাঁর পরিকল্পনা ছিল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে কথাবার্তা বলে আগেভাগেই সব ঠিক করে রাখবে। এরপর নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাতের আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেবে। তাহলে নাজ্জাশীর সাথে যখনই সে মুসলিমদের বিষয়ে কথা তুলবে, তখন এই ঘুষখোর কর্মকর্তারা আমরের পক্ষে সায় দেবে। আমর ঠিক এই কাজটাই করলো। কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সাথে দেখা করে তাদেরকে উপহার দিয়ে কথাবার্তা বলে রাখলো, বললো, 'নাজ্জাশীর সাথে দেখা করার আগেই যদি তোমরা এই (মুসলিম) লোকগুলোকে আমাদের হাতে হস্তান্তর করতে পারো, তাহলে আমি আরও খুশি হবো।' কারণ মুসলিমদের কথা নাজ্জাশীর মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সে এই ঝুঁকি নিতে চায় নি। মূলত তারা কুরআনের আয়াতকে ভয় পেতো। তাই চাচ্ছিলো না যে মুসলিমদের সাথে রাজার দেখা হোক।

এরপর আমর গেলো নাজ্জাশীর সাথে দেখা করতে। বললো, 'আমাদের ভেতর কিছু গণ্ডমূর্খ আছে। ওরা আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তারা আমাদের ধর্ম তো ত্যাগ করেছেই, আপনার ধর্মও তারা গ্রহণ করেনি...', এভাবে আরও নানা রঙ্গচঙ্গে উত্তেজক কথা বলে নাজ্জাশীকে বিভ্রান্ত করতে চায়, ক্ষেপিয়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। তারপর বললো, 'আমি চাই আপনি ওদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন।' এসময় নাজ্জাশীর বাদ বাকি কর্মকর্তারাও আমর ইবন আসকে সমর্থন করছিল।

আন-নাজ্জাশী বললেন, 'না, যারা আমার দেশে আশ্রয় নিয়েছে আমি তাদের কথা না শুনে অন্য কারো হাতে তাদেরকে তুলে দেবো না।' রাসূলুল্লাহ এ কারণেই মুসলিমদেরকে হাবাশায় হিজরত করতে বলেছিলেন। কেননা তিনি জানতেন আন-নাজ্জাশী একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা, তিনি তাঁর আদর্শকে সব কিছুর ওপরে স্থান দেন।

নাজ্জাশী মুসলিমদের ডেকে পাঠান। তাদেরকে বলা হলো যে, মক্কার আমর ইবন আস নাজ্জাশীর সাথে দেখা করেছে। এখন নাজ্জাশী তোমাদের সাথে দেখা করতে চান। এ কথা শুনে মুসলিমরা শুরা (পরামর্শ) করে। সিদ্ধান্ত হয় যে, জাফর ইবন আবি তালিব মুসলিমদের মুখপাত্র হবেন। যা সত্যি তিনি সেটাই বলবেন। তারা নাজ্জাশীর দরবারে এলে নাজ্জাশী তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কোন ধর্মে বিশ্বাসী? তোমরা তোমাদের দেশের লোকেদের ধর্ম ত্যাগ করেছো, আবার আমাদের ধর্মও গ্রহণ করোনি। তোমরা পৃথিবীর কোনো ধর্মই মানছো না। তোমরা কারা?'

জাফর উত্তরে যা বলেন, তাঁর পুরো বক্তব্য উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে। আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই জাফর বলেন,

'হে রাজা। আমরা ছিলাম মশরিক। মূর্তিপজা করতাম, মৃত পশুর মাংস খেতাম, আতিথেয়তার ঘোড়াই-কেয়ার করতাম, অবৈধ কাজকে বৈধ করে নিতাম, একে-অপরের রক্ত ঝরাতাম। আমরা ভালো-মন্দের তোয়াক্কা করতাম না। আর তাই আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে আমাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন নবী প্রেরণ করেছেন, যাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনোকালেই আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না।

তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর ইবাদতে আর কাউকে শরীক না করতে। তিনি আমাদেরকে আত্মীয়ের হক আদায় করতে আদেশ করেছেন, অতিথিদের সম্মান করতে বলেছেন আর শিখিয়েছেন মহান রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা ও রোজা রাখার কথা- তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করার কথা। তিনি আমাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। যেন আমরা আমাদের রবের একত্ববাদের ঘোষণা দিই, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি আর তিনি ছাড়া আর যত মূর্তি, পাথর আছে, যেগুলোকে আমাদের বাপদাদারা পূজা করেছে, সেগুলো ভেঙে ফেলি। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার আদেশ দেন, লোকের আমানত রক্ষা করতে বলেন, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ও আতিথেয়তার নিয়ম মেনে চলতে নির্দেশ দেন। হারাম কাজ, অবৈধ কাজ, একে-অপরের রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি আমাদেরকে সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেন। মিথ্যা বলা, এতিমের সম্পদে ভাগ বসানো, সতী-সাধ্বী নারীর নামে কুৎসা রটাতে নিষেধ করেন। তিনি আমাদের বলেন আল্লাহর ইবাদত করতে, ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করতে।'

এভাবে জাফর আন-নাজ্জাশীর কাছে একেবারে অল্প কথায় ইসলামের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। জাফর ইসলামের এমন সব সুন্দর শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন, যা সৎ গুণসম্পন্ন যেকোনো লোক ভালো বলে মানতে বাধ্য। তিনি নাজ্জাশীর কাছে এটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যে, ইসলাম কোনো খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় না. কোনো অনৈতিক কাজকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং এর প্রতিটি হুকুম-আহকাম, প্রতিটি শিক্ষাই কল্যাণকর। এর মাঝেই তিনি ইসলামের চারটি স্তম্ভের কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল সংক্ষিপ্ত, পরিমিত। সবশেষে জাফর বলেন,

'আর তাই আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি, তাঁকে বিশ্বাস করেছি, তিনি আল্লাহর থেকে যা কিছু দিকনির্দেশনা এনেছেন, সেগুলোকে মেনে চলেছি। আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি, কাউকে তাঁর সাথে শরীক করি না। আল্লাহ তাআলা যেগুলো হারাম করেছেন, আমরাও

সেগুলোকে হারাম হিসেবে মানি আর তিনি যেগুলোর অনুমতি দিয়েছেন, আমরাও সেগুলোকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করে নিই। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা আমাদের সাথে সীমালঙ্ঘন করে। আমাদের ওপর অত্যাচার করে। তারা চায় আমাদেরকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে, আমাদেরকে জাহেলি যুগের মূর্তিপূজায় ফিরিয়ে নিতে। তারা চায় আমাদের দিয়ে সেই সব হীন কাজ করাতে যেগুলোকে আমরা আগে সঠিক মনে করতাম। যখন তারা আমাদের ওপর জোর-জুলুম করতে লাগলো, দ্বীন পালনে একের পর এক বাধার সৃষ্টি করতে শুরু করলো, তখন আমরা আমাদের দেশ ত্যাগ করলাম, অন্য সবার ওপর আপনাকে পছন্দ করলাম। আমাদের আশা ছিল যে আমরা আপনার আতিথেয়তা পাবো, আর আমরা আশা রাখি আপনার এ রাজ্যে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে আসবে না।

জুলুম-নির্যাতনের কথায় নাজ্জাশীর মন নরম হয়ে পড়ে। তাঁর মনে পড়ে যায় ঈসা ও তাঁর অনুসারীদের সাথেও কী পরিমাণ অন্যায়-অত্যাচার করা হয়েছিল। তিনি নিজেও খুব ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। জাফরের বক্তব্যের সমাপ্তিটা ছিল সবচেয়ে চমৎকার এবং উপযুক্ত। তাঁর সব কথা শেষে নাজ্জাশী প্রশ্ন করলেন, 'মুহাম্মাদ তোমাদের কাছে যা এনেছেন, তাঁর কিছু কি তোমরা এনেছো?' তিনি কুরআনের আয়াত শুনতে চাচ্ছিলেন। জাফর ইবন আবি তালিব কুরআনের কয়েকটি আয়াত তাঁকে পড়ে শোনালেন। তিনি কুরআন থেকে যেকোনো অংশই তিলাওয়াত করতে পারতেন, কিন্তু বিচক্ষণ জাফর সূরা মারইয়ামের থেকে পড়তে শুরু করলেন, তিলাওয়াত করলেন প্রথম আটাশটি আয়াত।

"কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এটা আপনার রবের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি। যখন সে তাঁর রবকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে, সে বলেছিল, হে আমার রব! আমার হাড় দুর্বল হয়ে পড়েছে, বার্ধক্যে মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। হে আমার রব! আমি তো কখনো তোমাকে ডেকে ব্যর্থ হই নি। আমি আমার স্বগোত্রের দ্বীনের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি, (অপরদিকে) আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে এক জন উত্তরাধিকারি দান করুন।" (সূরা মারইয়াম, ১৯: ১-৬)

নাজ্জাশী জাফরের তিলাওয়াত শুনে কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাঁড়ি কান্নায় ভিজে গেল। আর তাঁর সব সভাসদরাও এতো করে কাঁদলো যে তাদের বাইবেলগুলো ভিজে গেলো। সেটি ছিল এক আবেগঘন, হৃদয়গ্রাহী কিরাত!

আন-নাজ্জাশী কুরাইশদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, মুসলিমদের হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানালেন। কুরাইশ প্রতিনিধিরা চলে গেলো। যাওয়ার সময় আমর ইবন আস হুমকি দিয়ে গেলো যে করেই হোক মুসলিমদের সে মক্কায় ফিরিয়ে আনবে, তাদেরকে শেষ করে ছাড়বে।

আমর ইবন আসের সঙ্গী তাকে বললো, 'এমন করে বোলো না, এরা তো তোমাদেরই আত্মীয়। নাজ্জাশী যদি এদেরকে ফিরিয়ে দিতে রাজি না-ই হয়, তাহলে বাড়াবাড়ি না করে দেশে ফিরে যাও।' কিন্তু আমর ইবন আস বললো, 'না, আমি কালই আবার আসবো, রাজাকে শুনিয়ে যাবো যে, মুসলিমরা ঈসাকে দাস বলে।'

আমর ইবন আস পরদিন আবার এসে নাজ্জাশীকে বললো, মুসলিমরা ঈসাকে এ আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করে না, তাঁকে নিছক দাস বলে বিশ্বাস করে। আমর ইবন আস ছিল সে সময় একজন মুশরিক, নবী ঈসাকে নিয়ে আদতে তার এত মাথাব্যথার কিছু নেই। তিনি খোদা হন বা নবী হন বা নিছক একজন দাসই হন-তাতে তার কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সে এই বিষয়টাকে পুঁজি করে নিজের ফায়দা হাসিল করতে চাচ্ছিল। তাই সে ফিতনা তৈরি করছিল। আন-নাজ্জাশী এ কথা শুনে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক। তাঁর রাজ্যে এসব নিয়ে কোনো ফিতনা হোক সেটা তাঁর কাম্য ছিল না। তাই তিনি মুসলিমদের আবার ডাকলেন।

মুসলিমরা আগের সিদ্ধান্তেই অটল। তারা পূর্বের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন, যা-ই হোক না কেন, তারা সত্য কথাই বলবেন। এবারও আগের দিনের মত জাফর ইবন আবি তালিবই তাদের মুখপাত্র। দরবারে উপস্থিত হলে আন-নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ঈসা সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কী?'

- তিনি আল্লাহর দাস, আল্লাহর নবী, আল্লাহর কালাম, জন্ম নিয়েছিলেন পবিত্র ও কুমারী নারী মারইয়ামের গর্ভে।'

- তাঁর সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য আর আমার বক্তব্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

এই কথা শোনার সাথে সাথে বিশপেরা উত্তেজিত হয়ে পড়লো। কীভাবে আন-নাজ্জাশী এই ধরনের কথা বলতে পারলেন! আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানরা ছিল অর্থোডক্স খ্রিস্টান। তারা ঈসাকে ঈশ্বর মনে করতো, তাই তারা ঈসার ব্যাপারে মুসলিমদের বিশ্বাস শুনে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট, মুসলিমরা যে তাঁকে আল্লাহর দাস মনে করে এটা তারা মানতে পারলো না। আন-নাজ্জাশী উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'তোমরা যা খুশি বলতে পারো। আমি এই মানুষগুলোকে আমার রাজ্যে স্বাধীন ঘোষণা করলাম।

মক্কার প্রতিনিধিরা আবিসিনিয়ায় এলে আন-নাজ্জাশী প্রথমেই তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা আমার জন্য তোমাদের দেশ থেকে কী এনেছো?' আমর ইবন আস বলেছিলেন, 'আমি

আপনার জন্য চামড়ার তৈরি কিছু জিনিস এনেছি।' চামড়ার জিনিস ছিল আন-নাজ্জাশীর খুব পছন্দের। কিন্তু সেদিন, উম্মে সালামার ভাষায়, 'সেদিন আমর ইবন আস ও তার সঙ্গীরা অপমানিত হলো, কেননা আন-নাজ্জাশী তাদের বের করে দেন, এমনকি তাদের দেওয়া উপহারগুলিও ফেরত দেন।' আমর ইবন আসের সাথে আন-নাজ্জাশীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু আদর্শের প্রশ্নে তিনি বন্ধুত্বকেও প্রশ্রয় দেননি, বরং সত্যের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলেন।

উমার ইবনে খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ

উমার ইবন খাত্তাব ছিলেন ইসলামের গোঁড়া শত্রু, কট্টর ইসলামবিদ্বেষী একজন মানুষ। অত্যন্ত নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সাথে তিনি মুসলিমদের নির্যাতন করতেন। একদিন আমর ইবন রাবিয়ার স্ত্রী লাইলার সাথে উমারের এ দেখা হয়, উমার তাকে বললেন, 'কোথায় চললে, উম্মে আবদুল্লাহ?'

তোমরা আমাদের উপর অত্যাচার করেছো, তাই আমার রবের ইবাদত করার জন্য অন্য দেশে চলে যাচ্ছি।

তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমার ভ্রমণ নিরাপদ হোক।

উম্ম আবদুল্লাহ খুব অবাক হলেন উমার তো এমন সহানুভূতি নিয়ে মুসলিমদের সাথে কথা বলার পাত্র নন! ঘরে ফিরলে তাঁর স্বামীকে তিনি ঘটনাটি বললেন, তাঁর স্বামী হাসতে হাসতে বললেন,

- তুমি আশা করছো উমার মুসলিম হবে?

- হতেও তো পারে, কেন নয়?

- উমারের বাবার একটা গাধা আছে না? সেই গাধাটা মুসলিম হলেও হতে পারে কিন্তু উমার মুসলিম হবে না।

উমার সম্পর্কে কারোই উঁচু ধারণা ছিল না। জাহেলিয়াতের সময়ে উমার কেমন ছিলেন-সে বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন:

"আমি মদ খেতে ভালবাসতাম। আমার কিছু মদ্যপায়ী সঙ্গী ছিল, তাদের সাথে প্রতি রাতে দেখা করতাম, আড্ডা মারতাম। এক সন্ধ্যায় বের হলাম, মদশালায় গিয়ে দেখি কেউ নাই। তখন রাত হয়েছে, ভাবলাম মদের দোকানে যাই, কিন্তু গিয়ে দেখি দোকানও বন্ধ। অনেক খুঁজেও সময় কাটানোর মতো কিছুই পেলাম না। তখন ভাবলাম, যাই দেখি, কাবাঘরে গিয়ে কাবার চারপাশে তাওয়াফ করি। তাওয়াফ করতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে আমি বাদে আরও একজন আছেন-মুহাম্মাদ! আমি আর তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তবে তিনি আমার উপস্থিতি টের পাননি।

রাসূলুল্লাহ জেরুসালেমের দিকে মুখ করে কাবায় সালাত আদায় করছিলেন। আমি আস্তে আস্তে হেঁটে সামনের দিকে আসলাম। কাবার চাদরের আড়ালে চুপচাপ লুকিয়ে আছি। মুহাম্মাদ তখন আমার একদম সামনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু চাদরের কারণে আমাকে দেখতে পান নি। আমি এত কাছে যে তাঁর তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছি। তিনি সূরা আল হাক্কাহ থেকে তিলাওয়াত করছেন- কুরআন শুনে আমার বুক ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিজেকে বোঝালাম, এগুলো নিশ্চয়ই কোনো কবির কথা। এ কথা ভাবার পরেই সুরা আল হাক্কাহর পরের যে আয়াতটি রাসুলুল্লাহ তিলাওয়াত করলেন তা হলো,

"এগুলো কোনো কবির কথা নয়, তোমাদের খুব অল্প লোকই সেটা বিশ্বাস করে থাকো।" (সূরা হাক্কাহ:৪১)

আমি হতচকিত হয়ে গেলাম। নিজেকে বললাম, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো গণকের কথা। আর এরপরের আয়াতেই ছিল,

"এগুলো কোন গণকের কথা নয়, খুব কমই তোমরা স্মরণ কর।" (সূরা হাক্কাহ: ৪২)"

একটি বর্ণনা অনুসারে এই ঘটনার পর উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্য মত অনুসারে, এই ঘটনা উমারকে খুব নাড়া দেয়, তার অন্তরে কুফরের ভিত দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ও মুসলিমদের প্রতি তাঁর ঘৃণা কমলো না। একদিন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন, তিনি কুরাইশদের এই ঝামেলা দূর করবেন, দীর্ঘদিনের অনৈক্যের অবসান একমাত্র এক ভাবেই ঘটবে-যে করেই হোক, মুহাম্মাদকে হত্যা করতে হবে। মক্কাকে "সাবেইন" (মুসলিমদের) হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

উমার বদ্ধপরিকর। নবীজির খোঁজ করা শুরু করলেন, খুঁজে পেলেই হত্যা। জানতে পারলেন দারুল আরকামে রাসূলুল্লাহ তাঁর চল্লিশ অনুসারীসহ আছেন। উমার একাই চললেন, হাতে

উন্মুক্ত তলোয়ার। তিনি জানতেন মুহাম্মাদকে হত্যা করতে গেলে তাকেও মেরে ফেলা হতে পারে, কিন্তু তিনি সেসব পরোয়া করেন না। রাস্তায় তাঁর এক আত্মীয় নাঈমের সাথে দেখা। নাঈম গোপনে মুসলিম হয়েছিলেন, উমার ইবন খাত্তাবের চোখ দেখেই নাঈম বুঝে গেলেন উমার খুব রেগে আছেন, নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ঘটাবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

- কোথায় যাচ্ছো উমার?

- মুহাম্মাদকে হত্যা করতে যাচ্ছি, কোনো রাখঢাক না রেখে অকপটে নিজের উদ্দেশ্য জানিয়ে দিলেন উমার।

পরিস্থিত গুরুতর দেখে নাঈম তৎক্ষণাৎ বুদ্ধি করে বললেন,

- আগে তোমার নিজের বাড়িরই খোঁজ নাও, তারপরে মুহাম্মাদ!

- কেন? কী হয়েছে! আমার বাড়িতে আবার কী সমস্যা? উমার জানতে চাইলেন।

- যাও খোঁজ নিয়ে দেখ, তোমার আপন বোন মুসলিম হয়ে গেছে।
এই কথা বলে নাঈম রাসূলুল্লাহকে বাঁচালেও উমারের বোন আর তাঁর স্বাীং বিপদে ফেলে দিলেন। উমারের বোন ফাতিমা - ছিলেন সাঈদ ইবন যায়িদ আমর ইবন নুফাইলের স্ত্রী। সাঈদ ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সজন একজন। উমার এবার তাঁর গন্তব্য পরিবর্তন করে বোনের বাড়ির দিকে রওনা দিলে সেখানে তাঁর বোন ফাতিমা আর তাঁর স্বামী সাঈদকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন খালা ইবন আরাত। খাব্বাব তাদেরকে ভাঁজ করা একটি কাগজ থেকে সূরা ত্বাহা পাঠ শুনাচ্ছিলেন।

উমার ইবন খাত্তাবের পায়ের শব্দ শুনে খাব্বাব লুকিয়ে পড়লেন। ফাতিমাও করে কাগজটি নিয়ে লুকিয়ে ফেলেন। উমার ভিতরে এসে বললেন,

- কী সব আবোল-তাবোল বকছিলে তোমরা শুনি?

- কই। আমরা তো কিছু শুনিনি।

- আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু একটা তিলাওয়াত করতে শুনেছি। বলো সেটা এ ছিল। আমি শুনলাম তোমরা নাকি মুসলিম হয়ে গেছো?

এই কথা বলেই তিনি হঠাৎ সাঈদ ইবন যায়িদকে আঘাত করে বসলেন আর তাঁরে। ঘুষি মারতে গেলেন। ফাতিমা স্বামীকে বাঁচাতে ছুটে গেলেন, তাঁর মুখেও উমার ইবন খাত্তাব আঘাত করে বসলেন।

ফাতিমার মুখ থেকে রক্ত পড়তে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে উমার অপ্রস্তুত হয়ে যান, তাঁর খারাপ লাগতে থাকে, তিনি অনুতপ্ত হয়ে বোনের কাছে মাফ চাইলেন। ফাতিমা বললেন,

- হ্যাঁ, আমি ও আমার স্বামী দুজনই মুসলিম হয়েছি। তুমি যা খুশি করো।

- তোমরা যে কাগজটি পড়ছিলে, সেটা আমাকে দাও, উমার বললেন।

- না, দেব না। তুমি মুশরিক, তুমি নাপাক।

- ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি, আমি সেটা নষ্ট করবো না।

উমার ইবন খাত্তাব নিজেকে পরিষ্কার করে ফিরে আসলে তাঁর বোন তাঁকে ভাঁজ করা কাগজটি দিলেন। উমার কাগজ থেকে সূরা ত্ব-হা'র প্রথম আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

"ত্ব-হা। আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি। কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য যারা ভয় করে। এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমন্ডল ও সমুচ্চ নভোমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমুন্নত হয়েছেন। নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য ইলাহ নেই। সব সৌন্দর্যমন্ডিত নাম তাঁরই।" (সূরা ত্ব-হা, ২০: ১-৮)

উমার ইবন খাত্তাব তিলাওয়াত শেষ করে বললেন, 'কথাগুলো তো অসাধারণ।' খাব্বাব ইবন আরাত এতক্ষণ লুকিয়ে ছিলেন, উমারের এই কথা শুনে বের হয়ে এলেন, বললেন, 'উমারা আশা করি আল্লাহ আপনাকে বেছে নেবেন। গতকাল আমি শুনেছি আল্লাহর নবী দুআ করছিলেন, হে আল্লাহ। যেকোনো একজন উমারকে পথ দেখান-উমার ইবন খাত্তাব অথবা উমার ইবন হিশাম। আমি আশা করছি আপনাকেই আল্লাহ নির্বাচন করেছেন।'

রাসূলুল্লাহ মাত্র একদিন আগেই আল্লাহর কাছে এই দুআ করেছিলেন যে, আল্লাহ যেন দুইজন উমারের মধ্যে একজনকে পথ দেখান-উমার ইবন খাত্তাব অথবা উমার ইবন হিশাম (আবু

জাহেল)। নবীজি আল্লাহর কাছে এই দুইজনের একজনের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য দুআ করেছিলেন। উমার ইবন খাত্তাব খাব্বাবকে বললেন, 'আমি মুসলিম হতে চাই। আমাকে মুহাম্মাদের কাছে নিয়ে চলো।' খাব্বাব তাঁকে বললেন, 'আপনি দারুল আরকামে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করুন।' উমার ইবন খাত্তাব দারুল আরকামে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন। সেই সময়ে রাসূলুল্লাহ সাহাবাদের নিয়ে গোপন বৈঠক করছিলেন। সে সময় মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলামের কোনো কার্যক্রম হতো না, তাই এই গোপন বৈঠকের আয়োজন।

সাহাবাদের মধ্যে একজন উঠে দরজার ওপাশে উঁকি দিয়ে দেখে রাসূলুল্লাহকে জানালেন উমার এসেছে। খানিকটা শঙ্কা, খানিকটা বিস্ময় মেশানো কণ্ঠে সেই সাহাবা বললেন, 'উমার ইবন খাত্তাব বাইরে দাঁড়িয়ে! তাঁর সাথে তলোয়ার!' আরেকজন সাহাবী সাহস করে প্রস্তাব দিলেন দরজা খোলা হোক। কিন্তু উমার ইবন খাত্তাবের মুখোমুখি হওয়ার মতো সাহস সবার ছিল না। যার ছিল তিনি হলেন হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব। হামযা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, যদি উমার ভালো নিয়তে এসে থাকে তাহলে আমরা তাঁর সাথে সুন্দরভাবে বোঝাপড়া করে নেব। কিন্তু যদি সে খারাপ নিয়তে আসে, তাহলে তাঁর তলোয়ার দিয়েই তাকে মারবো।' রাসূলুল্লাহ হামযাকে বললেন, 'সমস্যা নেই, আমি নিজেই দরজা খুলে ব্যাপারটা দেখছি।' রাসূলুল্লাহ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন।

রাসূলুল্লাহ ছিলেন মাঝারী উচ্চতা ও মাঝারী গড়নের, অন্যদিকে উমার ইবন খাত্তাব ছিলেন দীর্ঘাকায়, সুঠামদেহী। বিশালদেহী উমারের পোশাক ধরে তাকে টেনে ভিতরে এনে রাসূলুল্লাহ বললেন, 'উমার! তুমি কবে এসব বন্ধ করবে? তুমি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাবের জন্য অপেক্ষা করছো?' উমার ইবন খাত্তাব বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি মুসলিম হতে এসেছি।'

রাসুলুল্লাহ ও বলে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবর।' ঘটনাটি ঘটছিল দরজার সামনে। সাহাবারা অন্য ঘরে থাকায় কিছুই দেখতে বা শুনতে পাননি। কিন্তু আল্লাহু আকবার শুনেই বুঝতে পারলেন যে, উমার মুসলিম হয়ে গেছেন। তাঁরা এই খবরে এত খুশি হলেন যে, জোরে জোরে তাকবীর দিতে লাগলেন আল্লাহু আকবর। আল্লাহ আকবরা" মক্কার লোকেরা তাদের তাকবীর শুনে ফেললো, সেদিনের মত সভা ভেঙে সবাই তাড়াহুড়ো করে সরে পড়লেন।

উমারের মুসলিম হওয়া ছিল বিজয়, তাঁর মদীনায় হিজরত ছিল ইসলামের সহায় আর তাঁর শাসন ছিল রাহমাহ।'

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের একটি কথায় বোঝা যায় উমার ইসলামের ইতিহাসে কয়ে উঁচু স্থান দখল করে আছেন। উমারের ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলামের ইতিহাসে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া

একটি ঘটনা। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, 'উমার মসলিম হওয়ার আগে আমরা কখনও কাবাঘরের সামনে প্রকাশ্যে সালাত আদায় করতে পারতাম না।' তাঁর ইসলাম গ্রহণ পুরো মসলিম সমাজের পরিস্থিতি বদলে দেয়। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ আরও বলেন, 'উমার মসলিম হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা আমাদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতাম। তিনি মুসলিম হওয়ার পর আমরা গর্বের সাথে আমাদের ইসলামের কথা বলে বেড়াতাম।'

সীরাতের এক বর্ণনায় এসেছে, যখন উমার মুসলিম হন, রাসূল মুসলিমদের দুই সারিতে দাঁড় করান। এক সারির নেতা হামযা, আরেক সারির নেতা উমার, তাঁরা ইসলামের ঘোষণা দিতে দিতে মক্কার রাস্তায় প্রকাশ্যে হাঁটতে থাকেন, আর রাসূল এই দুই সারির মধ্য দিয়ে হেঁটে যান।

উমার ইবন খাত্তাব মুসলিম হওয়ার পর জানতে চান, 'মক্কার সবচেয়ে বড় মুখ কার? কে পারবে আমার ইসলাম গ্রহণের খবর সবার কাছে ছড়িয়ে দিতে?' উমার ইবন খাত্তাব এই খবর চুপিসারে প্রকাশ করতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন সবাই জানুক যে তিনি মুসলিম হয়েছেন। তাকে বলা হলো জামিল আজ-জুমাহির কথা, সে ছিল মক্কার মিডিয়া। মজার এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন উমারের ছেলে আবদুল্লাহ ইবন উমার, তাঁর ভাষায়:

'ঐসময় আমি বেশ ছোট, কিন্তু সেদিন যা দেখেছি তার সবই মনে করতে পারি। আমি বাবার পিছুপিছু গেলাম। বাবা জামিল আজ-জুমাহিকে বললেন,

তুমি কি জানো আমি কী করেছি?

কী করেছেন আপনি?

আমি মুসলিম হয়েছি।

বাস, এতটুকুই। জামিল এই খবর শোনা মাত্র সাথে সাথে তার জোব্বা টেনে তুলে দৌড়ে কাবাঘরের দিকে গেল আর সবার সামনে গিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'হে কুরাইশের লোকসকল। উমার সাবিঈন হয়ে গেছে। উমার সাবিঈন হয়ে গেছে!' সাবিঈন শব্দটা শুনে উমার তাকে শুধরে দিয়ে বললেন, 'আরে, সাবিঈন না, বলো আমি মুসলিম হয়েছি।' কিন্তু কে শোনে কার কথা! জামিল তখন এই 'তাজা খবর' প্রচার করতে চারিদিকে পাগলের মত ছুটছে।

এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে মানুষ সবদিক দিয়ে বাবাকে ঘিরে ধরলো। তারা তাঁকে মারতে লাগলো আর তিনিও তাদের সাথে মারামারি করতে লাগলেন। ঘন্টাখানেক ধরে এভাবে চললো। সূর্য যখন একেবারে মাথার উপরে, তখন তারা ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত দিল।'

উমার ইবন খাত্তাব বাড়ি ফিরলেন, সেখানেও লোকজন তাঁর বাড়ি ঘেরাও করলো। তারা তাঁকে মেরেই ফেলবে। উমারের ইসলাম গ্রহণ ছিল তাদের জন্য বিরাট ধাক্কা, তারা সহ্যই করতে পারছিল না বিষয়টা। তাঁর ঘরে এক লোক আসলো, তিনি উমারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?' উমার বললেন, 'এরা আমাকে মেরে ফেলতে চায়।' লোকটি বললো, 'বিষয়টা আমি দেখছি, তারা তোমাকে মারবে না।' এরপর তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই মানুষটিকে তোমরা একা ছেড়ে দাও। তাঁর কি নিজের পছন্দমতো ধর্ম গ্রহণ করার অধিকার নেই? আমি তাঁকে নিরাপত্তা দিচ্ছি।' এ কথা শুনে সবাই চলে গেল।

অনেকদিন পরের কথা, আবদুল্লাহ ইবন উমার তাঁর বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বাবা, সেদিন আপনাকে যে লোকটা সাহায্য করেছিল তিনি কে ছিলেন?' উমার বললেন, 'তিনি হলেন আল আস ইবন ওয়াইল।' আল আস ইবন ওয়াইল ছিলেন আমর ইবন আসের পিতা, তিনি মুসলিম ছিলেন না। উমার ইবন খাত্তাবের গোত্র খুব একটা শক্তিশালী ছিল না, কিন্তু আল আস ইবন ওয়াইলের গোত্রের সাথে তাদের মিত্রতা ছিল।

(১) সীরাহ ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৩।

আবিসিনিয়া থেকে মক্কার লোকদের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব সাহাবী আবিসিনিয়ায় হিজরাত করেছিলেন, তাঁরা শুনলেন যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। একথা শুনে তাঁরা মক্কা অভিমুখে রওনা দিলেন। মক্কা নগরীর কাছাকাছি পৌঁছলে তাঁরা জানতে পারলেন যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে যে কথা তাঁরা শুনেছেন তা ঠিক নয়। ফলে মক্কাবাসীদের কারো সহযোগিতা নিয়ে অথবা গোপনে ছাড়া কেউই নগরীতে প্রবেশ করলেন না। সর্বমোট ৩৩ জন সাহাবী আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। উসমান ইবনে মাযউন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার আশ্রয়ে এবং আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ আবু তালিব ও তার মাতা রাবাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন।

মুজিযা: চাঁদ দ্বীখন্ডিত হওয়ার ঘটনা

কুরাইশের লোকেরা নিদর্শন দেখানোর জন্য রাসূলুল্লাহকে বারবার চাপাচাপি করছিল। কুরআন তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না, যদিও কুরআনের চেয়ে বড় অলৌকিক বিষয় আর কিছুই নেই। আল্লাহ তাআলা জিবরীলের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর কাছে ওয়াহী পাঠালেন, 'যদি তারা নিদর্শন দেখতে চায়, আমরা তাদের জন্য চাঁদকে দুইভাগ করে দেব।' রাসূলুল্লাহ কাফিরদের ডেকে বললেন, 'চাঁদ দুই ভাগ হয়ে যাবে।' রাতের বেলা কাফিররা সবাই একত্রে জড়ো হলো। তারা সবাই তাদের চোখের সামনে দেখলো চাঁদ দুইভাগ হয়ে আবার জোড়া লেগে গেল। এটা ছিল একটা অদ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা। এই ঘটনা বুখারি, মুসলিম এবং কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

"কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোনো নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু।" (সূরা কুমার, ৫৪: ১-২)

তারা অপবাদ দিলো, রাসূলুল্লাহ তাদেরকে জাদু করেছে, কিন্তু আদতে এটি কোনো দৃষ্টিবিভ্রম ছিল না। সংশয়বাদীরা এই ঘটনা নিয়ে নানান রকম সন্দেহ তুলে এই ঘটনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। যেমন তারা বলে, "চাঁদ দুই ভাগ হলে, পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষরা কীভাবে এই ঘটনা দেখলো না?

প্রথম যুগের একজন আলিম আল খাত্তাবি বলেন, 'চাঁদ বিভক্ত হওয়ার ঘটনাটি ছিল পূর্ববর্তী নবীদের নিদর্শনের তুলনায় একটা বড় মাপের নিদর্শন। এর কারণ ছিল, এটা বিশাল এলাকা জুড়ে দৃশ্যমান হয়েছিল এবং এটি ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম একটি ঘটনা। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তার সত্যতা প্রমাণিত হয়।'

শোকের বছর:আমুল হুযান

আবূ ত্বালিবের মৃত্যু:

বার্ধক্য, দুশ্চিন্তা, অনিয়ম ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আবু ত্বালিবের অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু গিরি সংকটে অন্তরীণাবস্থা শেষ হওয়ার ৬ মাস পর নবুওয়ত ১০ম বর্ষের রজব মাসে।

এ ব্যাপারে অন্য একটি মত হচ্ছে, তিনি খাদীজা রা-এর মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পূর্বে রমাযান মাসে মৃত্যু বরণ করেন।

সহীহ বুখারীতে মুসাইইব রা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু ত্বালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নবী কারীম (স) তাঁর নিকটে আগমন করেন। সেখানে আবু জাহলও উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ) বললেন,

'চাচাজান। আপনি শুধু একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি বিচার দিবসে প্রমাণ হিসেবে তা আল্লাহর সমীপে পেশ করতে পারি।"

আবু জাহল এবং আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়া বলল, আবু ত্বালিব আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত বিমুখ হয়েই যাবেন? তারপর এরা উভয়েই অবিরাম তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। সব শেষে আবু ত্বালিব যে কথাটি বলেছিলেন তা হচ্ছে, 'আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর।' নবী কারীম (স) বললেন,

'আমি যতক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত না হব ততক্ষণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব।' এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়,

(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) 'নবী ও মু'মিনদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে তারা আত্মীয়স্বজন হলেও, যখন এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।' (আত্-তাওবাহ ৯ : ১১৩)

আরো অবতীর্ণ হয় :

'তুমি যাকে ভালবাস তাকে সৎপথ দেখাতে পারবে না।' (আল-ক্বাসাস ২৮: ৫৬)

এখানে এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আবু ত্বালিব রাসূলুল্লাহ (স)-কে কী পরিমাণ সাহায্য সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। মক্কার অনাচারী মুশরিকগণের আক্রমণ থেকে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রকৃতই তিনি ছিলেন দূর্গ স্বরূপ। কিন্তু আল্লাহর নবী (স) এবং ইসলামের জন্য এত করেও যেহেতু তিনি বংশপম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত বহুত্ববাদের প্রভাব কাটিয়ে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না, সেহেতু দোরগোড়ায় আগত কামিয়াবি থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেলেন। যেমন সহীহুল বুখারী শরীফে 'আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তোমার চাচার কি উপকারে আসবে? 'কারণ নবী কারীম (স)-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।
রসূলুল্লাহ্ সা বললেন,

তিনি এখন জাহান্নামের অগভীর স্থানে অবস্থান করেছেন। যদি আমি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত না হতাম তা হলে তিনি জাহান্নামের অতলে ডুবে যেতেন।"

আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন যে, এক দফা রাসূলুয়াহ সা-এর নিকট তাঁর চাচা আবু ত্বালিবের আলোচনা উপস্থিত হয়। আলোচনা সূত্রে তিনি বলেন, 'সম্ভবত কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তাঁর উপকারে আসবে এবং তাঁকে জাহান্নামের এক অগভীর স্থানে রাখা হবে যা শুধু তাঁর দু'পায়ের গিঁটে পৌঁছবে।

আল্লাহর অনন্ত রহমতের পথে খাদীজা রা:

আবূ ত্বালিবের মৃত্যুর দু'মাস পর (মতান্তরে মাত্র তিনদিন পর) উম্মুল মুমেনীন খাদিজাতুল কুবরা (রা) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু নবুওয়ত দশমবর্ষের রমাযান মাসে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। রাসুলুল্লাহ তখন অতিবাহিত করেছিলেন তাঁর জীবনের ৫০তম বছর।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে খাদীজা রা ছিলেন আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ। দীর্ঘ পচিশ বছর যাবৎ আল্লাহর নবী)-কে সাহচর্য দিয়ে, সেবা-যত্ন দিয়ে, বিপদাপদে সাহস ও শক্তি দিয়ে, অভাব অনটনে অর্থ সম্পদ দিয়ে, ধ্যান ও জ্ঞানের প্রয়োজনে প্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে ইসলাম বীজের অংকুরোদগম এবং শিশু ইসলামের লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনি যে

অসামান্য অবদান রেখেছেন ইসলামের ইতিহাসে তার কোন তুলনা মিলেনা। খাদীজা (রা) সম্পর্কে বলতে গিয়ে নবী কারীম বলেছেন,

أَمَنَتْ فِي حِينَ كَفَرَ فِي النَّاسُ، وَصَدَقَتْنِي حِيْنَ كَذَبَنِي النَّاسُ، وَأَشْرَكَتْنِي فِي مَالِهَا حِينَ حَرَّمَنِي) النَّاسُ

وَرَزَقَنِي اللهُ وَلَدَهَا وَحَرَّمَ وَلَدَ غَيْر (যে সময় লোকেরা আমার সঙ্গে কুফরী করল সেই সময়ে তিনি আমার প্রতি অটোল বিশ্বাস স্থাপন করলেন, যে সময় লোকেরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল সে সময় তিনি আমাকে সত্যায়ন করলেন, আর লোকেরা যখন আমাকে বঞ্চিত করল, তখন তিনি আমাকে তাঁর সম্পদে অংশীদার করলেন। আল্লাহ আমাকে তাঁর গর্ভে সন্তানাদি প্রদান করলেন, অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দেন নাই।

সহীহুল বুখারীতে আবু হুরায়রা (রা)হতে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল গেঞ্জি নবী কারীম সা-এর নিকট আগমন করে বললেন যে, 'হে আল্লাহর রাসূল। ইনি খাদীজা রা আগমন করছেন। তাঁর নিকট একটি পাত্র আছে। যার মধ্যে তরকারী, খাদ্যবস্তু অথবা পানীয় বস্তু আছে। যখন সে আপনার নিকট এসে পৌঁছবে তখন আপনি তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে মতির তৈরি একটি মহলের সুসংবাদ প্রদান করবেন। যার মধ্যে কোন হট্টগোল বা হৈচৈ হবে না, কোন প্রকার ক্লান্তি ও শ্রান্তি আসবে না।

আমুল হুয়ান:

প্রাণপ্রিয় চাচা আবূ ত্বালিবের মৃত্যু এবং প্রাণাধিকা প্রিয়া ও সহধর্মিনী উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা)-এর মৃত্যু এ দুটি মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে। এ দুটি মৃত্যুর সুদূর প্রসারী ফল প্রতিফলিত হতে থাকল নবী (স)-এর জীবনে। একদিকে যেমন তাঁর জীবনে বিস্তার লাভ করল নিদারুণ শোকের ছায়া, অন্যদিকে তিনি বঞ্চিত হলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী অভিভাবকের অভিভাবকত্ব এবং সহধর্মিনীর অনাবিল প্রেম ভালবাসা ও সাহচর্য থেকে। পিতৃব্যের মৃত্যুর ফলে মুশরিকগণের সাহস বৃদ্ধি পেয়ে গেল বহুগুণে। নবী সা ও মুসলিমগণের উপর নতুন উদ্যমে তারা শুরু করল নানামুখী নির্যাতন। একে তো প্রিয় পরিজনদের বিয়োগ ব্যথা, অন্যদিকে দুঃখ, যন্ত্রণা, নির্যাতন পর্বতসম ধৈর্য্যের অধিকারী হয়েও নবী সা এর জীবন হয়ে উঠে বিষাদময় ও বিপর্যস্ত, হয়ে উঠে নৈরাশ্যে ভরপুর। নৈরাশ্যের মাঝে কিছুটা আশার এক অগ্রসর হন তিনি ত্বায়িফের পথে যদি সেখানকার লোকজন দাওয়াত গ্রহণ করেন, কিংবা দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেন, কিংবা তাঁকে একটু আশ্রয় প্রদান করে তাঁর জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। কিন্তু সেখানে দাওয়াত কবুল, আশ্রয় কিংবা, সাহায্য প্রদান কোন কিছু তো নয়ই, বরং তাঁর সঙ্গে এতই নির্মম আচরণ করা

হল এবং এতই দৈহিক নির্যাতন চালানো হল যে, তা অতীত নির্যাতনের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে গেল ।

এ দিকে মক্কার মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ সা এবং তাঁর অনুগামী ও অনুসারীদের উপর ইতোপূর্বে যেভাবে জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল এখনো অব্যাহতভাবে তা চালিয়ে যেতে থাকল। শুধু তাই নয়, বরং নির্যাতনের মাত্রা এত বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকল যে, আবু বকর রা -এর মতো অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তিও অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠলেন এবং উপায়ান্তর না দেখে মক্কা ছেড়ে হাবশের উদ্দেশ্যে যাত্র করেন। কিন্তু পথিমধ্যে 'বারকে গিমাদ' নামক স্থানে পৌছলে ইবনু দুগুন্নার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। সে তাঁকে নিরাপত্তা বিধানের আশ্বাস দিয়ে নিজ আশ্রয়ে মক্কায় ফিরে নিয়ে আসে।'

ইবনু ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবু ত্বালিব মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন কুরাইশগণ রাসুলুল্লাহ সা কে এত কষ্ট দেন যা আবু ত্বালিবের জীবদ্দশায় কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ কর হল। একদিন এক নির্বোধ ও গোঁয়ার প্রকৃতির কুরাইশ রাসূলুল্লাহ -এর সামনে এগিয়ে এসে মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করে দেয়। সেই অবস্থাতেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর এক কন্যা সেই মাটি ধুইয়ে পরিস্কার করে দেন। ধোয়ানোর সময় তিনি ক্রন্দন করছিলেন। রাসুলুল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দানেরজন্য বললেন,

"পুত্রী ক্রন্দন কোরো না। আল্লাহই তোমার পিতার হিফাজতকারী।"

"যতদিন আমার চাচা আবু ত্বালিব জীবিত ছিলেন কুরাইশগণ আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করে নি যা আমার সহ্যের বাইরে ছিল।"২

এমনিভাবে অবিরাম একের পর এক বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণে নবী কারীম (স) নাম রাখেন 'আমুল হুযন' অর্থাৎ দুঃখ কষ্টের বছর। ইতিহাসে সে বছরটি এ নামেই প্রসিদ্ধ।

১. সহীহুল বুখারী আবু তালিবের ঘটনা অধ্যায় ১ম খণ্ড ৫৪৮ পৃ.।

২. মুসনাদে আহমদ ৬ষ্ঠ ১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩. সহীহুল বুখারী খাদীজার সঙ্গে নবী সে-এর বিবাহ ও তাঁর ফযীলত অধ্যায় ১ম খণ্ড ৫৩৯ পৃঃ।

মিরাজ: ইসরা, রাত্রিকালীন সফর

রাসুলুল্লাহ সা এর এই কষ্টের সময়ের পরে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে অনন্য সাধারণ উপহার লাভ করেছেন। কষ্টের পরিমাণ যত বেশি হবে তার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অনুগ্রহের পরিমাণও অনেক বেশি হবে। এই অনুগ্রহ হলো আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনা। আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনাটি বিভিন্ন হাদীসে এসেছে এবং প্রতিটি বর্ণনার মধ্যে কিছু পার্থক্য এবং নতুনত্ব আছে। এই বইয়ে সংক্ষিপ্ত এই যাত্রার সার অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

রাসূলুল্লাহর বর্ণনায় মিরাজের রাত:

আমি তখন আল হিজরে (কাবার নিকটে অর্ধগোলাকার একটি জায়গা), আমার কাছে আসলেন একজন ফেরেশতা। তিনি আমার বক্ষ উন্মুক্ত করলেন, তারপর হৃৎপিণ্ডকে বের করে এনে ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের পাত্রে রাখলেন। সেটিকে এই পাত্রে ধুয়ে আমার বক্ষে বসিয়ে দেওয়া হলো হলো। এরপর আমার সামনে এমন একটি জন্তু (বুরাক) উপস্থিত করা হলো যা আকৃতিতে ঘোড়ার চেয়ে ছোটো কিন্তু গাধার চেয়ে বড়। এই জন্তুটি যতদূর সম্ভব দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত এক লাফে চলতো।'

আল্লাহর রাসূল এই জন্তুটির অস্বাভাবিক দ্রুততা সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই জন্তুর দু'চোখ যতদূর যায়, সেই পরিমাণ দুরত্ব সে এক ধাপে অতিক্রম করে। অর্থাৎ এটি প্রচণ্ড দ্রুতগতিসম্পন্ন জন্তু ছিল। তার ওপর চড়লে মনে হবে পুরো পৃথিবীটা যেন গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে।

'জিবরীল আমাকে সেই জন্তুর ওপর উঠতে বললেন। এরপর তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে জেরুসালেম নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে আমি আমার বাহনটিকে মসজিদের গেটে বেঁধে ভিতরে প্রবেশ করলাম। তারপর সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করলাম।'

সেখানে ওইসময় অন্যান্য নবী-রাসূলগণও সালাত আদায় করেছিলেন এবং এই জামাতের নেতৃত্বে ছিলেন রাসূলুল্লাহ, তিনি ইমামের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ বলেন, 'এরপর জিবরীল আমাকে আসমানের দিকে নিয়ে গেলেন। আমরা সবচেয়ে নিচের আসমানের দরজায় পৌঁছলাম, জিবরীল দরজায় টোকা দিলেন। দরজার প্রহরীরা জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করলো,

- আপনি কে?

- আমি জিবরীল।

- আপনার সাথে কে আছেন?
মুহাম্মাদ সা।

তাঁকে কি আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ।

- তাঁকে স্বাগতম, তাঁর আগমনে আমরা আনন্দিত।

প্রহরীরা আনন্দের সাথে গেট খুলে দিল। এখানে লক্ষণীয়, অনুমতি ছাড়া কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না, এমনকি রাসূলুল্লাহও পারেননি। গেট খুলে দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ও ভেতরে প্রবেশ করলেন।

'আমি ভেতরে প্রবেশ করে পিতা আদম আ কে দেখতে পেলাম। জিবরীল তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। জিবরীল বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম, তাঁকে সালাম দিন। আমি আসসালামু আলাইকুম বললাম। তিনি আমাকে ওয়া আলাইকুসসালাম বললেন। এরপর আদম বললেন, আমার পবিত্র পুত্রকে স্বাগতম। পবিত্র রাসূলকে স্বাগতম।'

আদম দেখা পেলেন তাঁর কোটি কোটি সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ সা। হাজার বছর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ পুত্রের সাথে দেখা করার সুযোগ পাওয়া ছিল পিতা আদমের জন্য এক মহা আনন্দের ঘটনা। রাসূলুল্লাহর জন্যও সেই মুহূর্তটি অবশ্যই একটি অভূতপূর্ব আনন্দময় মুহূর্ত ছিল। কিন্তু তাদের আলাপচারিতার সময় ছিল বেশ অল্প, কেননা রাসূলুল্লাহর হাতে সময় ছিল কম, তাঁর জন্য আরো অনেক কিছু অপেক্ষা করছিল। এরপর জিবরীল রাসূলুল্লাহকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানের দিকে রওনা দেন। তাঁরা সেখানকার দরজায় পৌঁছলে আগের মতো প্রহরীরা তাদের পরিচয় জানতে চাইলো। পরিচয়পর্ব শেষে তারা দরজা খুলে দিল। নবীজি বলেন, 'আমি ভিতরে প্রবেশ করে ঈসা ও ইয়াহইয়ার দেখা পেলাম। তাঁরা দুইজন ছিলেন আত্মীয়।' রাসূলুল্লাহ বর্ণনা করেন, 'আমি তাদের সাথে সালাম বিনিময় করলাম।' অর্থাৎ নবীরা একে অপরকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে অভিবাদন জানাতেন।

'এরপর তৃতীয় আসমানের দিকে রওনা দিলাম। সেখানে পৌঁছে দেখা হলো ইউসুফের সাথে।' ইউসুফ (আ) সম্পর্কে রাসূল বলেছেন, 'তাঁকে দুনিয়ার সৌন্দর্যের অর্ধেক দেওয়া হয়েছিল।' চতুর্থ আসমানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ দেখা করলেন নবী ইদ্রিসের সাথে। নবী করীম বর্ণনা করেন, 'আমরা এরপর পঞ্চম আসমানে গেলাম। সেখানে হারুনের সাথে দেখা হলো। মূসা ছিলেন ষষ্ঠ আসমানে। তাঁর সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়।'

রাসূলুল্লাহকেও দেখে সালাম বিনিময় ও স্বাগত জানানোর পর মূসা কাঁদতে শুরু করলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'এক যুবককে রিসালাতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার পরে, কিন্তু জান্নাতে তাঁর অনসারীর সংখ্যা আমার চেয়ে বেশি হবে।' মুহাম্মাদের আবির্ভাবের আগে অন্য যে কোনো নবীর চেয়ে মূসার অনুসারীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। বনী ইসরাইল ছিল সংখ্যার দিক থেকে অন্য সকল মুসলিম জাতি অপেক্ষা সর্ববৃহৎ। কিন্তু মুহামাদের উম্মাতের সংখ্যা বনী ইসরাইল থেকেও বেশি। একারণেই মুসা কাঁদছিলেন। মুসা (আ) ও মুহাম্মাদ সা এর মধ্যে উম্মাতের সংখ্যা নিয়ে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিল কিন্তু এ প্রতিযোগিতার মধ্যে কোনোরকম ঈর্ষাবোধ বা হিংসা ছিল না। তাদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ প্রতিযোগিতা ছিল, মুসা এর ও মুহাম্মাদের পরবর্তী কথোপকথন থেকে তা স্পষ্ট হয়।

রাসুলুল্লাহ বললেন, 'এরপর আমাকে নেওয়া হলো সপ্তম আসমানে। সেখানে আমি আমার পিতা ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর সাথে সালাম বিনিময় করলাম। তারপর আমাকে দেখানো হলো বাইতুল-মা' মুর।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে ইবরাহীম বাইতুল-মা' মুরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। 'বাইতুল-মামুর এর নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বাইতুল-মা মুরের শপথ নিয়েছেন। কাবাঘর যেমন আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ঘর, বাইতুল-মা'মুরও তেমন। তবে সেখানে ইবাদাত করে ফেরেশতারা। মুসলিমরা যেমন কাবার চারপাশে তাওয়াফ করে তেমনি ফেরেশতারা বাইতুল-মা'মুরে আল্লাহর ইবাদত করে। রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে, প্রতিদিন বাইতুল-মা' মুরে সত্তর হাজার ফেরেশতা যায়। তারা আর কোনোদিনই

সেখানে ফিরে আসে না।

বাইতুল-মা' মুরের ফেরেশতাদের সংখ্যার কাছে দুনিয়ার মানুষের সংখ্যা কিছুই না। মহাবিশ্বের সর্বত্র, চার আঙুল পরপর ফেরেশতারা ছড়িয়ে আছে। তারা রুকু অথবা সিজদায় আল্লাহর ইবাদাত করছে। এই সুবিশাল সৃষ্টির কাছে মানবজাতির সংখ্যা অতি নগণ্য।

ইবরাহীমের বাইতুল-মা'মুরে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার ঘটনাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তিনিই দুনিয়াতে কাবা নির্মাণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে দুনিয়া থেকে নিয়ে গেলেন তখন তাঁকে ফেরেশতাদের ঘর বাইতুল-মা'মুরে

বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'আমি সেখানে সিদরাতুল মুনতাহা দেখেছি। আরো কিছু দূর গিয়ে আমি সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলাম।' সিদরাতুল মুনতাহা একটি গাছ। এটি আসমানের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। এরপরেই শুরু রয়েছে আখিরাতের জীবন, জান্নাত, আল্লাহ তাআলার 'আরশ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট এই বিশ্বের শেষ প্রান্ত হলো সিদরাতুল মুনতাহা। একটার পর একটা করে মোট সাত আসমান, সবশেষে রয়েছে সিদরাতুল মুনতাহা। এরপরেই শুরু হয়েছে অন্য একটি জগৎ, আখিরাতের আবাস।

রাসুলুল্লাহ মুনতাহায় পৌঁছে দেখলেন এর নিচ থেকে চারটি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি জিবরীলকে এ নদীগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। জিবরীল বললেন, 'দুইটি নদী দৃশ্যমান আর বাকি দুইটি নদী লুকোনো। যে দুইটি নদী দেখা যায় সেগুলো হলো নীলনদ ও ইউফ্রেটিস। আর লুকোনো নদীগুলো জান্নাতের নদী।' দুনিয়ার নীলনদ ও ইউফ্রেটিস এতটাই পবিত্র যে এই দুইটার সমতুল্য নদী আসমানে রয়েছে। আর এই গাছটি জান্নাতের এত কাছে যে জান্নাতের দুইটি নদী এর নিচ দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে।

এই সাত আসমানের আকার সম্পর্কে বলা আছে-প্রথম আসমান দ্বিতীয় আসমানের তুলনায় মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি ছোট্ট আংটির মতো, দ্বিতীয় আসমান তৃতীয় আসমানের তুলনায় মরুভূমিতে পড়ে থাকা আংটির মতো এবং এভাবে পরেরগুলোও। আর সপ্তম আসমান কুরসির তুলনায় মরুভূমিতে একটি ছোট্ট আংটির মতো।

সর্বনিম্ন আসমানের তুলনায় কুরসি কতটা বিশাল তার কোনো ধারণাই মানুষের নেই। আমরা যে দুনিয়ায় আছি তা সর্বনিম্ন আসমানের মধ্যে অবস্থিত, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমরা সর্বনিম্ন আসমানকে নক্ষত্ররাজি দিয়ে সজ্জিত করেছি", অর্থাৎ সমস্ত নক্ষত্ররাজি সর্বনিম্ন আসমানে অবস্থিত, আর সমস্ত নক্ষত্ররাজির সর্বশেষ সীমানায় মানুষ এখনো পৌঁছতে পারেনি। আর রাসূলুল্লাহ এই সুবিশাল সৃষ্টি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এটি ছিল অসাধারণ এক সফর। সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করে সামনে যাওয়ার পর তিনি আরো ওপরে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এটাই ছিল তাঁর ভ্রমণের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ বলেন, 'আমি ফিরে আসছিলাম, পথিমধ্যে মূসার সাথে দেখা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনাকে কী বলেছেন? আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতকে প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার হুকুম দিয়েছেন। মূসা বললেন, আপনার উম্মত তা পালন করতে পারবে না। আমি আপনার আগে অনেক লোককে দেখেছি এবং আমার ক্বওম বনী ইসরাইলের সাথে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি। মানুষের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে। আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যান, সালাতের সংখ্যা কমিয়ে দিতে বলুন যাতে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।' রাসূলুল্লাহ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ রাসূলের কথা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, 'সালাতের সংখ্যা কিছু কমিয়ে দিন।' আল্লাহ তাআলা সালাতের সংখ্যা দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। মুহাম্মাদ নতুন নির্দেশ নিয়ে নিচে নেমে আসছিলেন। তাঁর সাথে আবার মূসার দেখা হলো। মূসা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?', রাসূলুল্লাহ তাঁকে খুলে বললেন। তখন মুসা বললেন, 'আবার ফিরে যান। সালাতের সংখ্যা আরও কিছু কমিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলাকে বলুন।'

রাসূলুল্লাহ আবার আল্লাহ তাআলার কাছে গেলেন, আরও দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেওয়া হলো। ফিরতি পথে মূসা তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলেন। রাসুলুল্লাহ সা তাঁকে জানালেন যে, আল্লাহ তাআলা সালাতের সংখ্যা কমিয়ে তিরিশ ওয়াক্তের নির্দেশ দিয়েছেন। মুসা সালাতের সংখ্যা আরও কমিয়ে আনার জন্য ফিরে যেতে বললেন। মুহাম্মাদ আবারও ফিরে গেলেন এবং আরও দশ কমিয়ে দেওয়া হলো। মুসা একথা শুনে আবারও ফিরে যেতে বললেন। এবার কমিয়ে দশ করা হলো। মুসার উপদেশ অনুযায়ী মুহাম্মাদ আবার গেলেন। এবার কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হলো। তিনি ফিরে এসে মুসাকে তা জানালেন। মুসা বললেন, 'মুহাম্মাদ, মানুষ সম্পর্কে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে, আমি বনী ইসরাইলের সাথে ছিলাম। আপনার উম্মাতের জন্য এটাও কষ্টকর হবে। আপনি আবার ফিরে যান এবং আরও কমিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলাকে অনুরোধ করুন।' মুহাম্মাদ বললেন, 'আবার অনুরোধ করতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আমি আর পারব না।

মুহাম্মাদ ও মূসার ব্যক্তিত্বের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্যগুলো আছে। মূসা সালাতের সংখ্যা কমানোর জন্য আল্লাহ তাআলাকে বারবার অনুরোধ করেছেন। মূসা-ই হচ্ছেন সেই নবী যিনি আল্লাহ তাআলাকে বলেছিলেন যে তিনি আল্লাহকে দেখতে চান। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন যার সুযোগ অন্য নবীরা পাননি। তারপরও মূসা শুধু কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না, আল্লাহর সাথে দেখাও করতে চাইলেন! এর ফলে কী ঘটেছিল তা কুরআনে আছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। আবার তিনিই মৃত্যুর ফেরেশতাকে ঘুষি মেরেছিলেন। এতে সেই ফেরেশতার চোখ ভালোভাবেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সমস্ত

নবী-রাসূলগণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই ছিল। কিন্তু তাদের একেকজনের ব্যক্তিত্ব একেকরকম ছিল। এদিকে, মুহাম্মাদ সালাতের সংখ্যা কমানোর জন্য যেতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। এসময় তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, 'এটাই আপনার উম্মাতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে, তবে এর জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্তের পুরস্কার দেওয়া হবে।'

সেই একই রাতে রাসূলুল্লাহ দুনিয়াতে ফিরে আসেন। এরপর তিনি উম্ম আয়মানের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তিনি বলেন, 'আমি রাতে জেরুসালেম গিয়ে ফিরে এসেছি।' উম্ম আয়মান বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, এ কথা আপনি কাউকে বলবেন না। কেউ আপনার কথা বিশ্বাস করবে না। সবাই বলবে যে এটা অবাস্তব ঘটনা।' উম্ম আয়মান রাসূলুল্লাহকে ঠিকই বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু তিনি আশঙ্কা করছিলেন অন্য লোকেরা এই কথায় বিশ্বাস নাও করতে পারে। আর কুরাইশ মুশরিকরা তো এ কথা নির্ঘাৎ উড়িয়ে দিবে। যেখানে জেরুসালেমে যেতে প্রায় এক মাস সময় লাগে সেখানে রাসূলুল্লাহ এক রাতের মধ্যেই সে জায়গায় গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং ওই এক রাতেই সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসেছেন এবং এরই মধ্যে সাত আসমান ঘুরে দেখেছেন। তাই উম্ম আয়মান তাঁকে এ ঘটনা সবাইকে বলতে মানা করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ বললেন, 'না, আমি এ ঘটনা সবাইকে জানাবো। লোকেরা যা-ই বলুক না কেন আমি সত্য ঘটনা প্রচার করতে পিছপা হবো না। এটা আমার ওপর অর্পিত দায়িত্বের একটি অংশ। আমার দায়িত্ব হচ্ছে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া।'

এ বিশাল ঘটনার তাৎপর্য ও এই ঘটনা নিয়ে লোকেদের প্রতিক্রিয়া সামলে নেওয়া কতটা কঠিন হবে সে সম্পর্কে রাসুলুল্লাহর ধারণা ছিল, তিনি জানতেন বিষয়টা সহজ হবে না। তিনি বেশ চুপচাপ ও চিন্তিত ছিলেন। কয়েকজনকে এ ঘটনাটি জানালেন। এক পর্যায়ে তা আবু জাহেলের কাছে পৌঁছে গেল। রাসুলুল্লাহ তখন মসজিদে, লোকজন কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে তা নিয়ে তিনি বেশ উদ্বিগ্ন। আবু জাহেল তাঁর কাছে এসে বললো,

- মুহাম্মাদ, কোনো নতুন সংবাদ আছে নাকি?

- হ্যাঁ, আছে।

- কী সেই খবর?

- আমি গত রাতে জেরুসালেম গিয়ে আবার সেই রাতেই ফিরে এসেছি।

জেরুসালেম?

- হ্যাঁ, জেরুসালেম।

মুহাম্মাদ, আমি যদি এখনই তোমার লোকদের এখানে ডেকে আনি তাহলে কি তুমি তাদের সামনে ঠিক এ কথাটাই বলতে পারবে যা আমাকে এইমাত্র বলেছো?

- হ্যাঁ, অবশ্যই পারবো।'

আবু জাহেল বেশ খুশি মনে কুরাইশদের ডাকতে লাগলো, এটা ছিল তার জন্য মুহাম্মাদকে পাগল প্রমাণ করার 'সুবর্ণ সুযোগ', সে সবাইকে ডাকলো, 'হে কুরাইশের লোকেরা, এদিকে এসো, শুনে যাও।' সবাই উপস্থিত হলে সে রাসূলুল্লাহকে বললো, 'হে মুহাম্মাদ, তুমি কিছুক্ষণ আগে আমাকে যা বলেছো তা তোমার লোকদেরকে শুনাও দেখি।' রাসূলুল্লাহ কোনোরকম দ্বিধা-দ্বন্দু বা অস্বস্তি ছাড়াই তাদেরকে বললেন, 'আমি গতরাতে জেরুসালেম গিয়ে ফিরে এসেছি।' উপস্থিত লোকেরা এ কথা শুনে হাসাহাসি করতে লাগলো, শিস বাজিয়ে, হাততালি দিয়ে অবজ্ঞা করতে লাগলো। এ ঘটনা তাদের জন্য নতুন এক 'বিনোদন' এর জন্ম দিল।

পরিস্থিতি খুব অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো, চারপাশের মানুষেরা এ ঘটনা নিয়ে মজা করছে, হাসিঠাট্টা করছে, হাততালি দিচ্ছে। সেখানে তখন এমন কিছু লোক ছিল যারা নিয়মিত জেরুসালেমে যেতো। তারা রাসূলুল্লাহকে মসজিদের বর্ণনা দিতে বললো, জেরুসালেমের বর্ণনা দিতে বললো। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'আমি জেরুসালেমের বর্ণনা দেওয়া শুরু করলাম এবং একসময় আমি আটকে গেলাম।' রাসূলুল্লাহ সেখানে খুব বেশি সময় কাটাতে পারেননি। তাই তিনি ওই জায়গার খুঁটিনাটি বর্ণনা মনে করতে পারছিলেন না।

এরপর রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'তখন আল্লাহ তাআলা আমাকে জেরুসালেম দেখালেন এবং আমি এর বিস্তারিত বর্ণনা তাদেরকে শোনাতে লাগলাম, প্রতিটা পাথরের, প্রতিটা ইটের।' তখন লোকেরা অবাক হয়ে গেল, তারা স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে, তিনি একেবারে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। তবে ইবন ইসহাকের আরেকটি বর্ণনায় অন্য একটি জিনিসও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যখন রাসূলুল্লাহ মক্কায় ফিরে আসছিলেন তখন তিনি কুরাইশদের একটি কাফেলা দেখতে পান। সেই কাফেলাটি তাদের একটি উট হারিয়ে ফেলেছিল। রাসূলুল্লাহ ও ভ্রমণকালে উপরে ছিলেন, তাই তিনি তাদের হারানো উটটি দেখতে পেয়ে তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের হারানো উটটি এই জায়গাতে আছে।' কাফেলার লোকেরা বুঝতে পারছিল না যে এই আওয়াজ কোথা থেকে আসছে। এরপর তিনি নীচে নেমে তাদের পানির পাত্র থেকে পানি খেয়েছিলেন। এই কাফেলার বর্ণনা তাঁর মনে ছিল।

তাই রাসূলুল্লাহ প্রমাণস্বরূপ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, 'তোমাদের অমুক কাফেলাটি তমুক স্থানে আছে, তারা তাদের উট হারিয়ে ফেলেছিল। আমি তাদের পাত্র থেকে পানি পান করেছিলাম। কাফেলাটির সামনে একটি উট ছিল।" এরপর তিনি সেই উটের বর্ণনা দিলেন এবং উটের ওপর কী কী ছিল তাও বলে দিলেন। রাসূলুল্লাহর দেওয়া তথ্য যাচাই করার জন্য তারা তখনই কাফেলার কাছে কিছু লোক পাঠালো। এটি তখনো মক্কার বাইরে ছিল। পরে তারা মিলিয়ে দেখলো যে রাসূলুল্লাহ যা যা বলেছেন তার সবই সত্য। কাফেলার লোকেরা উট হারিয়ে ফেলেছিল এবং আকাশ হতে আগত একটি আওয়াজ শুনে তারা তা খুঁজে পেয়েছিল। এমনকি তাদের কাছে যে খাওয়ার পানি ছিল তার পরিমাণও কিছু কমে গিয়েছিল। এতসব নিদর্শন আর প্রমাণ তাদের সামনে উপস্থিত করা সত্ত্বেও তারা এ ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। মিরাজের ঘটনাটি হজম করা সবার জন্য এতটাই কষ্টকর ছিল যে, বেশ কিছু দুর্বল ঈমানের মুসলিম মুরতাদ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই ধরনের মু'জিযা তাঁর নবীদেরকেই দেখিয়ে থাকেন।

মদীনায় ইসলাম বিস্তার

অবশেষে সেই সময়টি এসে উপনীত হলো যখন আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়নালে। ভূষিত করা, তাঁর নবীকে অধিকতর মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা এবং তাঁকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবারও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথারীতি হজ্জ উৎসবে আগত লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে ও তাঁতে আপন করে গ্রহণ করার জন্য আরব গোত্রগুলিকে অনুরোধ করতে লাগলেন। এবার তিনি কিছুসংখ্যক মদীনাবাসীর সাক্ষাত পেলেন। এরা ছিলেন মদীনার খাজরাজ গোত্রের একটি দল। আকাবার (১) কাছাকাছি এক স্থানে তাদের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। আল্লাহ এই দলটির কল্যাণ সাধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলেই এই ঘটনা ঘটেছিলো।(২)

তাদের সাথে দেখা হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজেস করলেন, "আপনারা কারা?" তারা বললো, "আমরা খাজরাজ গোত্রের লোক।" তিনি পুনরায় বললেন, "যারা ইহুদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ আপনারা কি তাদের অন্তর্ভুক্ত?" তাঁরা বললো, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "আপনারা একটু বসবেন কি? আমি আপনাদের সাথে কিছু কথা বলতে চাই।" তারা বললো, "বেশ, বলুন।" এরপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে বসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দাওয়াত দিলেন, তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন।

আগে থেকেই মহান আল্লাহ তাদের ইসলাম গ্রহণের সহায়ক একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। মদীনায় তাদের আশেপাশে ইহুদীরা বাস করতো। তারা আসমানী কিতাবের অধিকারী ছিলো এবং সেই সুবাদে তাদের কাছে ঐশী জ্ঞান ছিল। খাজরাজ ও অন্যান্য আরব গোত্র ছিল মুশরিক তথা প্রতিমাপূজারী। ইতিপূর্বে এইসব পৌত্তলিক আরবকে আগ্রাসী যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করে ইহুদীরা তাদের এলাকা দখল করে বসতি স্থাপন করে। পৌত্তলিক ও ইহুদীদের মধ্যে যখনই কোন অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হতো, তখনই ইহুদীরা পৌত্তলিকদেরকে এই বলে শাসাতো, "এ যুগের নবীর আগমনের সময় আসন্ন হয়ে উঠেছে। ঐ নবী এলে আমরা তাঁর নেতৃত্বে 'আদ ও ইরাম জাতিকে যেভাবে পাইকারী হত্যা করা হয়েছিল, তোমাদেরকে সেইভাবে কচুকাটা করবো।"

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাজরাজ গোত্রের দলটির সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিলেন তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগলো, "আল্লাহর শপথ, ইনিই তো সেই নবী যার কথা বলে ইহুদীরা আমাদেরকে হুমকি দেয় ও শাসায়। এখন ইহুদীদেরকে কিছুতেই আমাদের আগে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিত হবে না।" এইরূপ চিন্তার বশবর্তী হয়ে তারা তৎক্ষণাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। তারা বললো, "আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে এক ভয়ংকর শত্রুর শত্রুতার মুখে অসহায় অবস্থায় রেখে এসেছি। আমরা আশা করি আল্লাহ আমাদের গোটা সম্প্রদায়কেই আপনার সমর্থক করে দেবেন। আমরা তাদের কাছে ফিরে গিয়ে আপনার দাওয়াত তাদের কাছেও পৌছাবো। আজ যে জীবন ব্যবস্থাকে আমরা গ্রহণ করলাম সেটা তাদের কাছেও তুলে ধরবো। আল্লাহ যদি তাদেরকে আপনার সমর্থক বানিয়ে দেন তা হলে আপনার চেয়ে সম্মানিত ও পরাক্রান্ত আর কেউ থাকবে না।"

এভাবে তারা ঈমান আনা ও ইসলামকে সত্য বলে মেনে নেয়ার পর নিজ এলাকায় ফিরে গেলেন। যতদূর জানা যায়, খাজরাজ গোত্রীয় এই দলটির সদস্য ছিল ছয়জন। মদীনায় পৌঁছে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য গোত্রের কাছে পেশ করলেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। এভাবে ক্রমে মদীনার প্রতিটি ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌছে গেল। এমন একটি বাড়ীও অবশিষ্ট রইলো না, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা আলোচিত হতো না।

১.মক্কা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। এটি মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী একি জায়গা। এখান থেকে পাথর নিক্ষেপ হজ্জের অন্যতম বিধি। চকু স

২. এ ঘটনা ঘটে নবুওয়াতের একাদশ বছরে।

আকাবার তিনটি বাইয়াত

প্রথম শপথ:
পরবর্তী বছর আরো বারো জন মদীনাবাসী হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আসলো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আকাবায় সাক্ষাত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণ পূর্বক অনৈসলামিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করার অঙ্গীকার করলেন। এই অঙ্গীকার গ্রহণ অনুষ্ঠানকে আকাবার প্রথম বাইয়াত বলা হয়। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো মুসলিম নারীদের বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতিতে যা মক্কা বিজয়ের পরের দিন পুরুষদের বাইয়াত গ্রহণের অব্যবহিত পর সাফা পর্বতের ওপর অনুষ্ঠিত হয়। আকাবার প্রথম বাইয়াত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ আসার পূর্বে। এ বাইয়াতে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন আসআদ ইবনে যুরারা, রাফে ইবনে মালিক, 'উবাদা ইবনুস ছামিত এবং আবুল হাইসাম ইবনে তাইহান।

'উবাদা ইবনুস ছামিত বলেন, "আমি আকাবার প্রথম বাইয়াতে উপস্থিত ছিলাম। আমরা ছিলাম বারো জন পুরুষ। নারীদের বাইয়াতের পদ্ধতিতেই আমাদের বাইয়াত সম্পন্ন হয় এবং তা ছিল যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বেকার ঘটনা। আমরা রাসূলুল্লাহ সা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না, চুরি-ডাকাতি করবো না, ব্যভিচার করবো না, সন্তান হত্যা করবো না, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাবো না এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা করবো না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এসব অঙ্গীকার পূরণ করলে তোমাদের জন্য জান্নাতও রয়েছে। আর এর কোন একটি ভঙ্গ করলে তোমাদের পরিণতি আল্লাহর হাতে ন্যস্ত থাকবে। ইচ্ছে করলে তিনি শাস্তি দেবেন, ইচ্ছে করলে মাফ করে দেবেন।"

ইবনে ইসহাক বলেন: মদীনার এই দলটি যখন নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে মুস'য়াব ইবনে উমাইরকে পাঠিয়ে দিলেন তাদেরকে কুরআন পড়ানো, ইসলাম শিক্ষা দেয়া ও ইসলামী বিধানের তত্ত্ব বুঝিয়ে দেয়ার জন্য। তিনি মদীনার শিক্ষাগুরুরূপে অভিহিত হতেন। তিনি মদীনার মুসলমানদেরকে নামাযও পড়াতেন। কেননা এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রের লোকের ইমামতি করুক এটা আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় পছন্দ করতো না।

দ্বিতীয় শপথ:

ইসলামের প্রথম বায়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিল আল-আক্কাবায়, এই ঘটনা বায়াত আল উলা নামে পরিচিত। মদীনায় ইসলাম প্রচারে মুসআব ইবন উমায়ের অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে মানুষ সেখানে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে এবং পরবর্তী হাজ্জ মৌসুম চলে আসার আগে এমন অবস্থা হয় যে মদীনার প্রতিটি বাড়িতে একজন হলেও ইসলাম গ্রহণ করে। হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহর সাথে মদীনার নও-মুসলিমদের সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসলো। সত্তরের অধিক মুসলিম নিজ গোত্রের লোকেদের সাথে হাজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। মদীনা থেকে আসা প্রতিনিধি দলটির সাথে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই ছিল। যদিও গোপন বৈঠকটি ছিল শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ও মুসলিমদের মধ্যে, কিন্তু তাঁরা মদীনা থেকে যাত্রা করার সময় তাঁরা তাদের গোত্রের অমুসলিম সদস্যদের সাথে একসাথে এসেছেন। রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে আসে সত্তরের অধিক মুসলিম পুরুষ ও দুইজন মুসলিম নারী।

শেষ বাইয়াতে ও শর্তাবলী:

আকাবার শেষ বাইয়াতটি সম্পন্ন হয় আল্লাহর তরফ থেকে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি লাভের পর। তাই যুদ্ধের অঙ্গীকার ছাড়া এই বাইয়াতের শর্তাবলী ছিলো প্রথম বাইয়াতের শর্তাবলীর অনুরূপ। প্রথম বাইয়াত ছিল মক্কা বিজয়ের মহিলাদের বাইয়াতের অনুরূপ। কারণ প্রথম

বাইয়াতের সুময় আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুদ্ধের অনুমতি দেননি। তাই অনুমতি লাভের পর আকাবার শেষ বাইয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিনদের নিকট থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তারা দুনিয়ার সকল কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। তিনি তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অঙ্গীকারের শর্তাবলী আরোপ করেন এবং সেই শর্তাবলী সহ অঙ্গীকার পালন করলে তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে বলে ঘোষণা করেন।

'উবাদা ইবনে ছামিত (রা) বর্ণনা করেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলাম। সেই অঙ্গীকারের শর্তাবলী ছিলো এই: অবস্থা কঠিন কিংবা স্বাভাবিক যা হোক না কেন এবং স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, নেতার আনুগত্য করবো ও নির্দেশ মেনে চলবো, আমরা আমাদের মুহাজির মুসলিম ভাইকে সব বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করবো, দায়িত্বশীল নেতার সাথে তাঁর কর্তৃত্বাধীন বিষয়ে কলহ করবো না, যেখানেই থাকি না কেন আমরা সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলবো এবং আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবো না।"

সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ লাভ

আকাবার বাইয়াতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুদ্ধের বা প্রয়োজনে রক্তপাত ঘটানোর অনুমতি দেয়া হয়নি। তখন পর্যন্ত তাঁকে শুধু আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেয়া, যুলুম নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করা এবং অজ্ঞ লোকদের ক্ষমা করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণকারী যেসব লোককে ঘরবাড়ী ত্যাগ করতে হয়েছিলো, তাদের উপরে কুরাইশরা চরম ও নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছিলো। অসহ্য নির্যাতনের শিকার হয়ে কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করতেও বাধ্য হয়েছিলো। কুরাইশরা বেশ কিছু সংখ্যক ঈমানদারকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলো। এভাবে মুসলমানদের কেউবা অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলো, কেউবা ইসলাম পরিত্যাগ করেছিল, কেউবা দেশত্যাগ করেছিলো। তাদের মধ্যে অনেকে হাবশায় এবং অনেকে মদীনায় হিজরাত করেছিলো। এভাবে সবদিক দিয়েই মুসলমানরা যখন লাঞ্ছিত ও সর্বস্বান্ত, কুরাইশরা খোদাদ্রোহিতার শেষ সীমায় উপনীত এবং তাঁর নবী প্রত্যাখ্যাত, তখনই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা এবং যালিম খোদাদ্রোহীদেরকে পর্যুদস্ত করার অনুমতি দিলেন। উরওয়া ইবনে যুবাইর ও অন্যান্য বর্ণনাকারীদের নিকট থেকে আমি যা জানতে পেরেছি, তদনুসারে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা ও ঈমানদারদের প্রতিরক্ষার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ ও রক্তপাত বৈধ ঘোষণা করে সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়, তা হলো-

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَق إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُه إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَوةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وللهِ عَاقِبَةُ الأمور.

খাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া গেল। কারণ তারা মাযলুম। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করার মত ক্ষমতাশালী। তারা সেই সব লোক, যাদেরকে শুধু 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' এই কথাটুকু বলার কারণে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ঘরবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ যদি একদল মানুষকে আরেক দল দিয়ে দমন করার ব্যবস্থা না রাখতেন তাহলে মন্দির, গীর্জা, সব ইবাদাতখানা ও মসজিদসমূহ, যেখানে বেশী করে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়ে থাকে ধ্বংস করে দেয়া হতো। আল্লাহকে যে সাহায্য করবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ শক্তিশালী মহা প্রতাপান্বিত। তারা সেই সব লোক যাদের আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা ও সুযোগ দিলেই নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবে এবং অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিরোধ করবে। আল্লাহর হাতেই সব কিছুর চূড়ান্ত পরিণতি।" (সূরা হজ্জ ৩৯-৪১)

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের ওপর যুলুম নির্যাতন হওয়ার কারণেই আমি তাদের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ বৈধ করেছি। তারা মানুষের প্রতি কোন অপরাধ বা পাপ করেনি। তারা যখনই বিজয়ী হবে তখনই নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ প্রতিহত করবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা আবার নাযিল করেন- কারো পাচত এসানাল

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّينُ لِلَّهِ .

"তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যাতে কোন মু'মিনকে আর তার দীন পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা না হয় এবং একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য অবশিষ্ট থাকে।" (সূরা বাকারাহ্) অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করা হয়, অন্য কারো নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরাত

সাহাবীগণ হিজরাত করে মদীনায় চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরাতের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় মক্কায় থেকে গেলেন। এ সময় আলী ইবনে আবু তালিব, আবু বাক্ত সিদ্দীক ও মুষ্টিমেয় ক'জন সাহাবা ছাড়া আর কেউ মক্কায় ছিলেন না। অন্য যারা ছিলো তারা হয় কাফিরদের হাতে বন্দী ছিল নতুবা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো। আবু বাক্ (রা) প্রায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরাত করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলতেন, "তুমি তাড়াহুড়ো করো না। হয়তো আল্লাহ তোমাকে একজন সাথী জুটিয়ে দেবেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তাঁর হিজরাতের সঙ্গী হন। হযরত আবু বাক্ত সিদ্দীক (রা) এরপর থেকে তাই কামনা করতেন। কুরাইশরা যখন দেখলো যে, অন্যত্র তাদের গোত্রের বাইরের বহু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়েছে এবং তাঁর সঙ্গীরা তাদের কাছে হিজরাত করে চলে যাচ্ছে, তখন তারা বুঝতে পারলো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সহচরগণ একটা নিরাপদ আবাসভূমি পেয়ে গেছেন। তাই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেশত্যাগের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গেলো। তারা ভাবলো যে, তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছেন।

এ ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য তারা তাদের পরমার্শগৃহ 'দারুন নাদওয়ায়' সমবেত হলো। এই গৃহটি ছিলো কুসাই ইবনে কিলাবের বাড়ী। কুরাইশরা যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে এখানেই সমবেত হতো। এবার তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর ব্যাপারে কি করা যায়, তাই নিয়ে আলোচনা করতে বসলো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য

তারা নির্ধারিত দিনে সেখানে সমবেত হলো। এই দিনকে 'গণসমাবেশ দিবস' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাদের পরামর্শ গৃহে ঢুকবার পথে ইবলিস কম্বল আচ্ছাদিত এক বৃদ্ধের বেশে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। সে ঠিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখে সবাই বললো, "বৃদ্ধ এই লোকটি কে?" সে বললো, "আমি নাজদের অধিবাসী। (১) তোমরা যে উপলক্ষে আজ সমবেত হচ্ছো, তা আমি শুনেছি। তাই তোমাদের কথাবার্তা শোনার জন্য এসেছি। আশা করি আমার উপদেশ ও পরামর্শ থেকেও তোমরা বঞ্চিত হবে না।" একথা শুনে সবাই তাকে পরম সমাদরে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিলো। সে সবার সাথে প্রবেশ করলো। ততক্ষণে কুরাইশদের বড় বড় নেতা ও সরদার ভেতরে আসন গ্রহণ করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, "এই লোকটির তৎপরতা বর্তমানে কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তোমরা সবাই তা জান। সে তার বাইরের অনুসারীদের নিয়ে কখন যে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার কোন ঠিক নেই। তার আক্রমণ থেকে আমরা এখন নিরাপদ নই। অতএব, সবাই মিলে তার ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।"

সলাপরামর্শ চলতে থাকলো। এক সময় একজন বললো, "তাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে কোন অর্গলবদ্ধ কুঠরীতে বন্দী করে রাখ। তারপর ইতিপূর্বে তার মত কবিদের যে পরিণতি হয়েছে তারও সেই পরিণতি অর্থাৎ শোচনীয় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাক। যুহাইব, নাবেগা ও তাদের মত অন্যান্য কবির এই পরিণতি হয়েছিল।" তখন নাজদী বুড়ো বললো, "না, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। তোমরা যদি তাকে বন্দী কর, তা হলে বদ্ধ কুঠরীতে তার বন্দী হওয়ার খবর তার বাইরের অনুসারীদের কানে চলে যাবে। সে অবস্থায় তারা তোমাদের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে তোমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। অতঃপর তাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং একদিন তারা তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে। কাজেই তোমাদের এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। অন্য কোন সিদ্ধান্ত নিতে পার কিনা, ভেবে দেখ।" তাগত দিত

এরপর আবার আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো। একজন বললো, "আমরা তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবো। এরপর তাকে নিয়ে আমাদের আর কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না। সে একবার আমাদের কাছ থেকে চলে গেলে কোথায় গেলো বা কোথায় থাকলো আমরা তার কোন পরোয়া করবো না। সে চলে গেলে আমরা তার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। এরপর আমাদের পারস্পরিক মৈত্রী ও বন্ধুত্ব এবং অন্যান্য ব্যাপারে আমরা নিজেরাই শুধরে স্বাভাবিক করে নিতে পারবো।" পদচার

নাজদের বৃদ্ধ বললো, "না, এটাও সঠিক সিদ্ধান্ত হলো না। তোমরা কি তার অনুপম বাচনভঙ্গি, মিষ্ট ভাষা, যুক্তিগ্রাহ্য কথা এবং তথাকথিত ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত মন মগজ আচ্ছন্নকারী

ব্যাপারগুলো দেখনি? তোমরা যদি এই পদক্ষেপ নাও, তাহলে এমনও হতে পারে যে, সে অন্য কোন আরব গোত্রে গিয়ে হাজির হবে, আর তার মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী কথা দিয়ে তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং তারা তার অনুসারী হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের নিয়ে তোমাদের ওপর হামলা চালিয়ে তোমাদের দেশ দখল করে তোমাদের হাত থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেবে। তারপর তোমাদের সাথে সে যেমন খুশী আচরণ করবে। তোমরা এটা বাদ দিয়ে অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।"

এবার আবু জাহল বললো, "আমার একটা মত আছে যা এতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কারো মাথায় আসেনি।" সবাই বললো, "বলো দেখি, আবুল হাকাম তোমার মত কি।" সে বললো, "আমাদেরকে প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন শক্তিশালী সম্ভ্রান্ত যুবক বাছাই করতে হবে। তারপর তাদের প্রত্যেককে আমরা একটা করে ধরালো তরবারী দেবো। ওই যুবকেরা এক যোগে হামলা চালিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করবে। এভাবে আমরা তার থেকে নিস্তার পেতে পারি। আর তারা সবাই মিলে যখন এ কাজটা করবে,তখন মুহাম্মাদের খুনের দায় দায়িত্ব সকল গোত্রের ঘাড়েই কিছু না কিছু পড়বে। ফলে আবদ মানাফ গোষ্ঠী সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করে খুনের প্রতিশোধ নিতে পারবে না। রক্তপণ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে বাধ্য হবে। আমরা সকল গোত্র মিলে তাদেরকে রক্তপণ দিয়ে দেবো।"

নাজদের বৃদ্ধ বললো, "এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। আমি মনে করি এর চেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত আর হতে পারে না।"

এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পরামর্শ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো এবং সবাই যার যার বাড়ীতে চলে গেলো।

তৎক্ষণাৎ জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে বললেন, "আপনি প্রতিদিন যে বিছানায় ঘুমান আজ রাতে সে বিছানায় ঘুমাবেন না।" রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে নির্ধারিত ঘাতকের দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের দরজায় এসে সমবেত হয়ে ওত পেতে থাকলো। তিনি কখন ঘুমান তারা তার প্রতীক্ষা করতে লাগলো। ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর ওপর হামলা চালাবে এই তাদের বাসনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপস্থিতি বুঝতে পেরে আলী ইবনে আবু তালিবকে (রা) বললেন, "তুমি আমার বিছানায় ঘুমাও এবং আমার এই সবুজ হাদরামাউতী চাদর দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত করে রাখ। তোমার ওপর তাদের দিক থেকে কোন আঘাত আসবে না, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাক।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাবার সময় ঐ চাদরটি গায়ে জড়িয়ে নিতেন। ১মাতাল লি

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কারযী বলেন, ঘাতক দলে আবু জাহলও ছিলো। ঘাতকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ীর দরজায় জমায়েত হলে আবু জাহল তাদেরকে বললো, "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে যে, তোমরা যদি তার অনুসরণ কর তাহলে তোমরা আরব ও অনারব সবার রাজা হয়ে যাবে। আর মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং তোমাদের জন্য জর্ডানের বাগ বাগিচার মত অসংখ্য বাগ বাগিচা তৈরী করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি তার অনুসরণ না কর তা হলে তোমরা ধ্বংস ও নির্মূল হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করে তোমাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে তাদের সামনে আসলেন। তিনি এক মুষ্টি ধূলি হাতে নিলেন। অতঃপর আবু জাহলকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, আমি এ কথা বলি এবং যাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে তুমিও তাদেরই একজন।" এই সময় আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিলেন। ফলে তারা তাঁকে দেখতে পেলো না। তিনি ঐ ধূলি তাদের মাথার ওপর ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। তিনি তখন সূরা ইয়াসীনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পড়ছিলেন-

يس - وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزَ الرَّحِيمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَنْذِرَابَانُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اكْثَرَهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُوْنَ، وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ.

"ইয়াসীন। জ্ঞানের ভাণ্ডার কুরআনের কসম, নিশ্চয়ই তুমি রাসূল। তুমি সঠিক পথের ওপর আছ। এ কুরআন মহাপরাক্রান্ত করুণাময়ের নাযিল করা, যাতে তুমি এমন একটি জাতিকে সাবধান করে দিতে পার যাদের পূর্বপুরুষদের সাবধান করা হয়নি। ফলে তারা অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। তাদের অধিকাংশ লোকই আল্লাহর আযাবের যোগ্য। তাই তারা ঈমান আনছে না। আমি তাদের গলায় বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছি। সেই বেড়িতে তাদের থুতনি পর্যন্ত শৃংখলিত হয়ে গেছে। এ জন্য তারা মাথা উঁচু করে রয়েছে। আমি তাদের সামনে একটি প্রাচীর এবং পেছনে আরেকটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি। তাই তারা দেখতে পায় না।" এই আয়াত কয়টি পড়তে পড়তে তিনি তাদের প্রত্যেকের মাথায় ধূলি নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর নিজের ইচ্ছামত একদিকে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর বাইরের এক ব্যক্তি তাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা এখানে কি জন্য অপেক্ষা করছো?" তারা বললো, "আমরা মুহাম্মাদের অপেক্ষায় আছি।" সে বললো, "আল্লাহ তোমাদেরকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। মুহাম্মাদ তো তোমাদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেলো। আর সে তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় ধূলি নিক্ষেপ করেছে! তারপর নিজের কাজে

বেরিয়ে গেছে। তোমাদের মাথায় কি রয়েছে, তা কি দেখতে পাচ্ছো না?" তখন প্রত্যেকে মাথায় হাত দিয়ে দেখলো, ধূলিতে মাথা আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

অতঃপর তারা গৃহতল্লাশী শুরু করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদর গায়ে দিয়ে আলীকে (রা) বিছানায় শায়িত দেখে বললো, "এই তো মুহাম্মাদ, চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে।" তাই তারা ভোর পর্যন্ত অপেক্ষায় রইলো। সকালে আলী (রা) বিছানা থেকে উঠলে তাকে দেখে সবাই বলে উঠলো, "লোকটা তাহলে তো ঠিকই বলেছে যে, মুহাম্মাদ চলে গেছে।"

ইবনে ইসহাক বলেন, আবু বাক্স ছিলেন খুব ধনবান ব্যক্তি। তিনি রাসূলুল্লাহর কাছে হিজরাতের অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলতেন, "তুমি তাড়াহুড়া করোনা। আল্লাহ হয়তো তোমাকে একজন সহযাত্রী জুটিয়ে দেবেন।" আবু বকর একথা শুনে ভাবতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো নিজের কথাই বলেছেন। তাই তিনি তখন থেকেই দুটো উট কিনে নিজের বাড়ীতে রেখেছিলেন। হিজরাতের প্রস্তুতিস্বরূপ তিনি এই কাজ করেছিলেন।

আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্সের বাড়ীতে সকালে হোক বা বিকেলে দিনে অন্ততঃ একবার যেতে ভুলতেন না। সেই দিনটা এসে উপনীত হলো যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার স্বগোত্রীয়দেরকে ছেড়ে হিজরাত করে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। সেদিন তিনি দুপুরে আমাদের বাড়ীতে আসলেন। ঐ সময় কখনো তিনি আসতেন না। তাঁকে দেখে আবু বাক্স বললেন, "নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে তা না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় আসতেন না।" তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করলে আবু বাক্স তাঁর খাটের এক ধারে সরে বসলেন। আবু বাক্সের বাড়ীতে তখন আমি আর আমার বোন আসমা বিনতে আবু বকর ছাড়া আর কেউ ছিলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার এখানে অন্য যারা রয়েছে, তাদেরকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দাও।" আবু বাক্স (রা) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমার দুই মেয়ে ছাড়া আর কেউ এখানে নেই। আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনার কি হয়েছে? আমাকে বলুন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহ আমাকে মক্কা থেকে চলে যাওয়ার ও হিজরাত করার অনুমতি দিয়েছেন।" আবু বাক্স বললেন, "আমিও কি সঙ্গে যেতে পারবো?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, তুমিও সঙ্গে যেতে পারবে।" আয়িশা (রা) বলেন, সেদিনের আগে আমি জানতাম না যে, মানুষ আনন্দের আতিশয্যেও কাঁদতে পারে। আমি আবু বাক্স (রা)-কে সেদিন কাঁদতে দেখেছি। অতঃপর আবু বাক্স (রা) বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, এই দেখুন, আমি এই উট দুটো এই কাজের জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছি।" অতঃপর তারা আবদুল্লাহ ইবনে আরকাতকে পথ দেখিয়ে নেয়ার জন্য

ভাড়া করে সাথে নিলেন। সে ছিলো মুশরিক। উট দুটো তার কাছেই রেখে গেলেন। সে নির্ধারিত সময়ের জন্য উট দুটির দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করতে থাকলো।

ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা ত্যাগের সময় তাঁর মক্কা ত্যাগের কথা শুধুমাত্র আলী ইবনে আবু তালিব (রা), আবু বাক্স সিদ্দীক (রা) এবং আবু বাক্রের পরিবার পরিজন ছাড়া আর কেউ জানতো না। আলীকে ব্যাপারটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে মক্কায় কিছুদিন থাকতে বলেছিলেন। মক্কার লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নানা রকমের জিনিস গচ্ছিত রাখতো। যারা কোন জিনিস নিজের কাছে রাখা নিরাপদ মনে করতো না, তারা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমানত রাখতো। কারণ তাঁর সততা ও আমানতদারীর কথা সবার জানা ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরাতের পর ঐ আমানত ফেরত দেয়ার জন্যই তিনি আলীকে (রা) দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তাকে মক্কায় আরো কিছুদিন থাকার নির্দেশ দেন।

এবার আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ী থেকে বের হবার পালা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আবু বাকরের (রা) কাছে আসলেন। তারপর আবু বাকরের ঘরের পেছনের জানালা দিয়ে উভয়ে বের হলেন।

অতঃপর তাঁরা মক্কার নিম্নভূমিতে অবস্থিত 'সাওর' পর্বতের একটি গুহার পাশে গিয়ে তার ভেতরে প্রবেশ করলেন। আবু বাক্ক তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহকে বলে গেলেন, দিনের বেলায় লোকেরা তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলাবলি করে কিনা, তা যেন সে মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং সন্ধ্যার সময় তাঁদের কাছে গিয়ে সব কথা জানায়। (মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম ও পরে স্বেচ্ছায় মজুরীর ভিত্তিতে কর্মরত) ভৃত্য আমের ইবনে ফুহাইরাকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন, সে যেন দিনের বেলায় তাঁর মেষপাল চরায়, অতঃপর সেগুলোকে সাওরের ঐ পর্বত গুহার কাছে ছেড়ে দেয় এবং সন্ধ্যার সময় পর্বত গুহায় তাঁদের সাথে দেখা করে। আসমা বিনতে আবু বাক্স প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তাঁদের জন্য খাবার নিয়ে যেতেন। (১)

আবু বাক্সকে (রা) সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওর পর্বত গুহায় তিনদিন অবস্থান করেন। এদিকে কুরাইশরা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য একশো উট পুরস্কার ঘোষণা করলো। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্স সারা দিন কুরাইশদের সাথেই মিলেমিশে থাকতেন এবং তাদের সলাপরামর্শ শুনতেন। তারা তাঁদের উভয়ের সম্পর্কে যা যা মন্তব্য করতো তাও শুনতেন। অতঃপর সন্ধ্যার সময় তাঁদের কাছে গিয়ে সারা দিনের যাবতীয় খবর জানাতেন। আর ভৃত্য আমের ইবনে ফুহাইরা মক্কাবাসীদের পশুপালের সাথেই আবু বাক্সের (রা) মেষপাল চরিয়ে বেড়াতো। কিন্তু

সন্ধ্যা হলেই সেগুলোকে 'সাওর' পর্বতগুহার কাছে নিয়ে ছেড়ে দিতো, তখন তাঁরা উভয়ে মেষের দুধ দোহন করতেন অথবা জবাই করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্স সকালে 'সাওর' পর্বত গুহা থেকে বেরিয়ে মক্কায় যেতেন তখন আমের ইবনে ফুহাইরা তার মেষপাল নিয়ে পিছু পিছু যেতেন যাতে তার পদচিহ্ন মুছে যায়। এভাবে তিনদিন অতিবাহিত হলে তাদের সম্পর্কে মক্কাবাসীদের হৈ চৈ ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসলো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আরাকাত নিজে একটি উটে চড়ে রাসূলুল্লাহ ও আবু বাক্সের (রা) উট দুটিকে সাথে নিয়ে সাওর পর্বত গুহায় হাজির হলো। আসমা বিনতে আবু বাক্ পথের খাবার নিয়ে তাদের কাছে আসলো। কিন্তু খাবার ঝুলিয়ে বেঁধে দেয়ার মত কোন রশি আনতে সে ভুলে গিয়েছিলো। উভয়ে রওনা হলেন। আসমা খাবার ঝুলানো চেষ্টা করলো, কিন্তু দেখলো কোন রশি নেই। অগত্যা সে নিজের কোমর বন্ধনী খুলে তা ফেড়ে রশি বানিয়ে খাবার বেঁধে ঝুলিয়ে দিলো। এই জন্য আসমা বিনতে আবু বাকরকে 'যাতননিত্যকাইন' দুটি কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী বলে অভিহিত করা হতো

আবু বাকর উট দুটোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এনে সবচেয়ে ভালো উটটি তাঁকে দিয়ে বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। এতে আরোহণ করুন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে উট আমার নয় তাতে আমি আরোহণ করবো না।” তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, এটি আপনার। আপনার উপর আমার পিতামাতা কুরবান হোক।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “না, তবে কত দাম দিয়ে এটি কিনেছো বল।" আবু বাক্স উটের দাম বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি এই দামের বিনিময়ে উটটি নিলাম।" আবু বাক্স বললেন, "উট ও তার দাম উভয়ই আপনাকে দিয়ে দিলাম।"

অতঃপর উভয়ে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যাত্রা শুরু করলেন। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ভৃত্য আমের ইবনে ফুহাইরাকে পথিমধ্যে প্রয়োজনীয় সেবার জন্য পেছনে চড়িয়ে নিলেন।

আসমা বিনতে আবু বকর বলেন, আবু বাক্স (রা) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওনা হয়ে যাওয়ার পর আমাদের বাড়ীতে আবু জাহল সহ কুরাইশদের একটি দল আসলো। তারা আবু বাক্সের (রা) দরজার সামনে দাঁড়ালো। আমি তাদের কাছে গেলাম। তারা বললো, "তোমার আব্বা কোথায়?" আমি বললাম, "আব্বা কোথায় জানি না।" সঙ্গে সঙ্গে পাষণ্ড নরাধম আবু জাহল আমার মুখে এমন জোরে-থাপ্পড় মারলো যে, আমার কানবালাটি ছিটকে পড়ে গেলো।

১. সুহাইলীর মতে, শয়তান নিজেকে নাজদবাসী বলে পরিচয় দেয়ার কারণ হলো, কুরাইশরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলো যে, তিহামা অঞ্চলের কোন লোককে এই পরামর্শ সভায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। কেননা তারা মনে করতো, তিহামাবাসী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থক। এজন্য ইবলিস নাজদবাসী বৃদ্ধের রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করেছিলো।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবাতে বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রে সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার এই চার দিন অবস্থান করেন। এই সময় তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

মদীনায় উপস্থিতি:

অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি শুক্রবার কুবা ত্যাগ করেন। বনু সালেম ইবনে আওফের বস্তিতে গিয়ে তিনি জুমার নামায পড়েন। বাতনুল ওয়াদীর মসজিদে তিনি জুমার নামায আদায় করেন। বাতনুল ওয়াদীর আর এক নাম ওয়াদীয়ে রানুনা। এখানেই তিনি মদীনায় প্রথম জুমার নামায আদায় করলেন।

ইতবান ইবনে মালিক ও আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নাদলা সহ বনু সালেম ইবনে আওফের একদল লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের যা কিছু জনবল, সহায় সম্বল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে, তাতে খুশী হয়ে আমাদের এখানেই আপনি স্থায়ীভাবে বসবাস করুন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উষ্ট্রীকে দেখিয়ে বললেন, "একে তোমরা পথ ছেড়ে দাও। আল্লাহর তরফ থেকে এটির ওপর নির্দেশ রয়েছে আমাকে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়ার।" সবাই তাই করলো। উষ্ট্রী নিজের ইচ্ছামত চলতে লাগলো।

বনু বায়াদা গোত্রের বস্তির নিকট যখন হাজির হলো, তখন যিয়াদ ইবনে লাবীদ ও ফারওয়া ইবনে আমরের নেতৃত্বে বনু বায়াদা গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে বললো, “হে আল্লাহর রাসূল,

আমাদের এখনে আসুন, আমাদের যা জনবল, সহায় সম্বল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে তাঁর মধ্যে এসে বসবাস করুন।" তিনি বললেন, "এই উষ্ট্রীকে তার ইচ্ছামত যেতে দাও। কেননা ওকে যথাস্থানে আমাকে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" উষ্ট্রীটি চলতে লাগলো। বনু সায়েদার

বস্তিতে পৌঁছলে সা'দ ইবনে উবাদা ও মুনযির ইবনে আমরের নেতৃত্বে বনু সায়েদার একদল লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ আগলে দাঁড়ালো। তারাও বনু বায়াদা ও বনু সালেমের মত একই অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু বায়াদা ও বনু সালেমকে যেকথা বলেছিলেন, বনু সায়েদাকেও তাই বললেন। উষ্ট্রী অগ্রসর হতে লাগলো। যখন সেটি খাযরাজ গোত্রের বনু হারেস পরিবারের বাড়ীর পাশ দিয়ে চলতে লাগলো, তখন সা'দ ইবনে রাবী, খাবেজা ইবনে যায়িদ ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা

বনু হারেস পরিবারের আরো কিছু লোককে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ আগলে দাঁড়ালো। তারা তাদের পরিবারে অবস্থান করা ও তাদের জনবলু, সহায় সম্বল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখার আমন্ত্রণ জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা উষ্ট্রীকে যেতে দাও।

কেননা একটি আমাকে উপযুক্ত স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট।" সকলে পথ ছেড়ে দিলো এবং উষ্ট্রীটা সামনের দিকে এগিয়ে চললো। চলতে চলতে উষ্ট্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামাদের পরিবার বনী আদী ইবনে নাজ্জারের বাড়ী অতিক্রম করলো। তখন বনী আদী ইবনে নাজ্জারের কতিপয় লোককে সাথে নিয়ে সালীত ইবনে কায়েস ও আবু সালীত উসাইরা ইবনে আবি খাবিজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে দাঁড়ালো। তারা বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনারা আমাদের কাছে আসুন এবং আমাদের যা কিছু জনবল, সহায় সম্বল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে, তার ওপর আস্থা রাখুন।" তিনি বললেন, "উস্ট্রীকে তার খেয়াল খুশীমত যেতে দাও। কারণ ওকে উপযুক্ত স্থানে আমাকে পৌছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" এখানে উল্লেখ থাকে যে, বনী আদী ইবনে নাজ্জারেরই মেয়ে ছিলেন অবদুল মুত্তালিবের মা সালামা বিনতে আমর।

বনু মালিক ইবনে নাজ্জারের বাসস্থানের কাছে এসে উষ্টা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। সে যেখানে বসলো সেখানেই পরবর্তীকালে মসজিদে নববীর প্রবেশদ্বার তৈরী হয়।

তৎকালে ঐ জায়গাটা ছিলো বনু নাজ্জারের দুটো ইয়াতীম শিশুর খেজুর শুকাবার জায়গা। শিশু দুটো হলো আমরের ছেলে সাহল ও সুহাইল। তাদের লালন পালন করতো মায়ায ইবনে আকরা। উষ্ট্রী হাঁটু গেড়ে বসলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিঠ থেকে নামলেন না। স্থির হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর উষ্ট্রীটি সামান্য কিছুদূর এগিয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও তার লাগাম শক্ত করে ধরে রাখলেন। অতঃপর উষ্ট্রী পিছনের দিকে ফিরে তাকালো এবং পুনরায় তাঁর প্রথম বিরতি স্থানে ফিরে

এলো। সেখানে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো। এবারে সে নড়াচড়া ও শব্দ করলো। তার বুক ও গলার নিম্নাংশ মাটিতে ঠেকিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রীর পিঠ থেকে নামলেন। আবু আইয়ুব খালিদ ইবনে যায়িদ তাঁর আসবাবপত্র নামিয়ে নিলো এবং নিজের ঘরে নিয়ে রাখলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইয়ুবের মেহমান হলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "খেজুর শুকানোর জায়গাটা কার?" মায়ায ইবনে আকরা বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওটা আমরের ছেলে সাহল ও সুহাইলের। ওরা আমার পালিত ইয়াতীম। আমি তাদেরকে সম্মত করিয়ে নেবো। আপনি এখানে মসজিদ তৈরী করুন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ স্থানে মসজিদ নির্মাণে আদিষ্ট হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মসজিদ ও ঘরবাড়ী তৈরী হওয়া পর্যন্ত আবু আইয়ুবের বাড়ী অবস্থান করলেন। এই মসজিদ নির্মাণের কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যোগদান করেন, যাতে মুসলমানরাও অংশগ্রহণ করার প্রেরণা পায়। ফলে মুহাজির ও আনসারগণ সকলেই ঐ কাজে পূর্ণ আগ্রহের সাথে অংশ নেন। এ সম্পর্কে জনৈক মুসলমান স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন, সা

"আমরা যদি বসে থাকি আর নবী কাজ করেন, তা হবে আমাদের চরম ভ্রষ্টতার পরিচায়ক।" মসজিদ নির্মাণের সময় মাঝে মাঝেই মুসলমানরা উদ্দীপনার সাথে কবিতা বলতেন। যেমন: "আখিরাতের জীবন ছাড়া আর কোন জীবনের গুরুত্ব নেই। হে আল্লাহ, আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।" আর তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "আখিরাতের জীবন ছাড়া আর কোন জীবনের গুরুত্ব নেই। হে আল্লাহ, আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।"

মসজিদ ও থাকার ঘর নির্মিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইয়ুবের বাড়ী থেকে নিজের ঘরে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

আবু আইয়ুব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার বাড়ীতে মেহমান হলেন, তখন তিনি নীচের তলায় থাকতে লাগলেন আর আমি ও আমার স্ত্রী উপরে। আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি উপরের তলায় থাকি আর আপনি নীচের তলায় থাকেন তা আমার কাছে নিতান্ত অপছন্দীয় ও গর্হিত কাজ। অতএব আপনি ওপরে থাকুন। আর আমরা নেমে এসে নীচে থাকি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, "আমাদের নীচে থাকাটা আমাদের জন্য এবং যারা আমাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে আসে তাদের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক।"

এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীচের তলায় এবং আমরা ওপরের তলায় বাস করতে লাগলাম। একবার আমাদের একটা পানি ভর্তি কলসী ভেঙ্গে গেলো। আমাদের একটি মাত্র কম্বল ছিলো আর কোন লেপ বা শীতবস্ত্র ছিলোনা। অগত্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে তা থেকে পানি পড়বে এবং তাতে তিনি কষ্ট পাবেন এই আশংকায় আমি ও আমার স্ত্রী ঐ কম্বলটা দিয়েই পানি মুছে ফেললাম।

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের জন্য খাবার তৈরী করে পাঠাতাম। তিনি ঐ খাবারের উদ্বৃত্তটুকু ফেরত পাঠালে আমি ও আমার স্ত্রী বরকতের আশায় তাঁর হাত লাগানো জায়গা থেকেই খেয়ে নিতাম। একদিন রাত্রে এইভাবে তাঁর জন্য খাবার পাঠালাম। সেই খাবারে আমরা কিছু পিঁয়াজ বা রসুনও দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ফেরত পাঠালেন। আমরা ঐ খাবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত স্পর্শ করার কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। ফলে আমি ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনার জন্য আমার মা বাপ কুরআন হোক। আপনি খাবার ফেরত পাঠালেন অথচ তাতে আপনার হাতের স্পর্শের কোন চিহ্নই দেখলাম না। আপনি যখনই খাবার ফেরত দিতেন, আমি ও আমার স্ত্রী বরকত লাভের জন্য সেই খাবার আপনার হাত লাগানো জায়গা থেকেই খেতাম।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি খাবারের মধ্যে অমুক গাছের গন্ধ পেয়েছি। যেহেতু আমাকে অনেকের মুখের কাছে মুখ নিয়ে আলাপ করতে হয়, তাই আমি খাইনি। অবশ্য তোমরা ওটা খেতে পার।" এরপর আমরা ঐ খাবার খেয়ে নিলাম। অতঃপর আর কখনো আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পিঁয়াজ বা রসুন পাঠাইনি।ইবনে ইসহাক বলেন, "এরপর মুহাজিররা হিজরাত করে একের পর এক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে আসতে লাগলেন। একমাত্র যারা বন্দী ছিলেন অথবা কঠোর নির্যাতনে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরাই মক্কায় থেকে গেলেন। মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার ছাড়া আর সব কয়টি পরিবারেরই অবস্থা এরূপ ছিলো যে, তারা তাদের পরিবারের সব লোেক এবং ধন সম্পদ মদীনায় নিয়ে আসতে পারেনি। যে কয়টি পরিবার তাদের সকল সদস্যসহ হিজরাত করতে সক্ষম হয়েছিলো তারা হলো, বনু জুমাহ গোত্রের বনু মাযউন পরিবার, বনু উমাইয়ার মিত্র বনু জাহাশ ইবনে রিয়াব এবং বনু সা'দ ইবনে লাইসের বনু বুকাইর পরিবার যারা বনু কা'বের মিত্র ছিলো। হিজরাতের পর এদের ঘরবাড়ী একেবারেই জনশূন্য ছিল।

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

মদীনায় পৌঁছে রাসুল চারটি প্রজেক্ট হাতে নেন এগুলো হলো:

১) মসজিদ নির্মাণ।

২) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

৩) মদীনার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে সে ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট দলিল বা সনদ প্রণয়ন।

৪) মুসলিম সেনাবাহিনী গড়ে তোলা।

প্রথম প্রজেক্ট: মসজিদ নির্মাণ

রাসূলুল্লাহ মদীনায় পৌঁছেই প্রথমে মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। রাসূলুল্লাহ কুবাতে অবস্থানকালেও একই কাজ করেছিলেন। মসজিদ হলো মুসলিমদের শিক্ষাকেন্দ্র। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সবকিছুর আগে মসজিদ নির্মাণের দিকে দৃষ্টি দেন। মক্কায় তিনি দার-উল-আরকামে মুসলিমদের প্রশিক্ষণের কাজ চালাতেন।

পরবর্তীতে মদীনায় মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে দার-উল-আরকামের কার্যক্রম ব্যাপকতা লাভ করে। তবে মক্কার দার-উল-আরকাম ছিল একটি গোপন জায়গা। সেখানে মুসলিমরা সালাত আদায় করতে আসত এবং কুরআন শিক্ষা করতো। কিন্তু মদীনাতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ায় আর গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিল না। তাই নির্মিত হয় 'মসজিদ-ই-নববী।'

মসজিদের জন্য জায়গা নির্বাচন

রাসূলুল্লাহ তাঁর উটে চড়ছিলেন আর লোকজন যার যার দিকে উটটিকে টানছিল। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, 'এটিকে ছেড়ে দাও, কারণ এটি আল্লাহর নির্দেশে চলছে।' উটটি মদীনার রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো। এটি থামলো একটি শুকনো খেজুরের মাঠে। সেই মাঠের মালিক ছিল দুই এতিম ছেলে। উটটি থামলে রাসূলুল্লাহ সা বললেন, 'এটিই হলো আমাদের মসজিদের জায়গা।' অতঃপর সেই জায়গাটি মসজিদের জন্য এবং রাসূলুল্লাহর থাকার জায়গা হিসেবে নির্বাচন করা হলো।
রাসূলুল্লাহ জায়গাটি এতিম বালকদের কাছ থেকে কিনে নিতে চাইলেন। কিন্তু তারা বিক্রি করতে রাজি হলো না বরং তারা সেই জায়গাটি কোনো টাকা ছাড়াই রাসূলুল্লাহকে দিতে চাইল। অবশেষে মসজিদ-ই-নববীর নির্মাণ কাজ শুরু হলো।

মসজিদের দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল কাদামাটির ইট দিয়ে আর ছাদ নির্মাণ করা হয়েছিল তালপাতা দিয়ে। বৃষ্টি হলে পাতা চুইয়ে বৃষ্টির পানি তাদের মাথায় পড়তো, আর মেঝেতে ছিল শুধু বালি। মসজিদটি ছিল খুবই সাদামাটা কিন্তু এটি হলো ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বরকতময় মসজিদ। এখানেই মুসলিমদের প্রথম ও সেরা প্রজন্মটি দ্বীনের শিক্ষা লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ নিজেও সাহাবাদের সাথে মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ কাঁধে ইট বহন করেছিলেন।

আযানের সূচনা:

মসজিদ-ই-নববীর নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হওয়ার পর আলোচনা শুরু হয় কীভাবে সবাইকে সালাতের দিকে আহ্বান করা যায়। কেউ পরামর্শ দিল, খ্রিস্টানদের মতো ঘণ্টা ব্যবহার করা অথবা মদীনায় ইহুদিরা যেভাবে হর্ন ব্যবহার করতো সেরূপ কিছু করা। কোনো প্রস্তাবই রাসূলুল্লাহর মনঃপুত হলো না। এমন সময়ে রাসূলুল্লাহর একজন সাহাবী, আবদুল্লাহ ইবন যাইদ একটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন, একটি লোক একটি ঘণ্টা বহন করছে। তা দেখে তিনি ওই লোকের কাছে ঘণ্টাটির দাম জানতে চান। লোকটি আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কেন ঘন্টাটি চাও?' আবদুল্লাহ স্বপ্নের মধ্যে উত্তর দিলেন যে, তিনি এটা দিয়ে মানুষকে সালাতের দিকে আহ্বান করবেন। লোকটি উত্তরে বললো যে, তার কাছে দেওয়ার মতো এর চেয়েও ভালো কিছু আছে। আবদুল্লাহ জানতে চাইলেন সেটি কী। লোকটি তাঁকে বলতে বললো,

আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!
আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!
আশ-হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশ-হাদু আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ
আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ
হাইয়্যা 'আলাস-সালাহ
হাইয়্যা 'আলাস-সালাহ
হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ
হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ
আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!

আবদুল্লাহ ইবন যাইদ রাসূলুল্লাহকে এই স্বপ্নের কথা জানান। স্বপ্নের বর্ণনা শুনে রাসূলুল্লাহ বুঝতে পারলেন যে এই স্বপ্ন সত্য স্বপ্ন। এরপর তিনি আবদুল্লাহকে বললেন বিলালকে এই আযান দেওয়া শিখিয়ে দিতে। বিলালের কণ্ঠস্বর ছিল খুব জোরালো আর সুন্দর। আযানের শব্দ শুনতে পেয়ে উমার দ্রুত মসজিদে আসেন। তিনি বললেন যে, তিনিও স্বপ্নে এই কথাগুলো শুনেছেন। একাধিক ব্যক্তি একই স্বপ্ন দেখার অর্থ হলো স্বপ্নটি সত্য। (১)

সেই থেকে আযান ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকসমূহের একটি। যে সব জায়গায় প্রকাশ্যে আযান দেওয়া হয়, সেসব জায়গায় ইসলাম ও মুসলিমদের উপস্থিতি আছে এমনটা ধরে নেওয়া হয়।

টীকা১.সিরাতে ইবনে হিশাম বই।

দ্বিতীয় প্রজেক্ট: মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা

ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। তিনি যা বলেননি, তা তার ওপর আরোপ করা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি প্রতি দুইজনের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। এরপর তিনি আলী ইবনে আবু তালিবের হাত ধরে বললেন, "এ হলো আমার ভাই।" এভাবে নবীদের সরদার, মুত্তাকীদের নেতা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের রাসূল, বিশ্বজাহানে যাঁর কোন জুড়ি নেই- তিনি আর আবু তালিব তনয় আলী (রা) নতুন করে ভ্রাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। আর আল্লাহ ও রাসূলের সিংহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচ হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও যায়িদ ইবনে হারেসার ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপিত হলো। উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে হামযা অছিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর মৃত্যু হলে যায়িদ ইবনে হারেসা তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন। আবু তালিবের পুত্র জাফর তাইয়ার ও বনু সালামা বংশোদ্ভূত মুয়ায ইবনে জাবাল পরস্পর ভ্রাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আবু বাক্স সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ও খাবেজা ইবনে যুহায়ের পরস্পর ভ্রাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উমার ইবনুল খাত্তাব ও 'ইতবান ইবনে মালিক পরস্পর ভাই হন। আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ও সা'দ ইবনে মুয়ায, আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও সা'দ ইবনে রাবী, যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও সালামা ইবনে সুলামা, উসমান ইবনে আফফান ও আওস ইবনে সাবিত, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ও কা'ব ইবনে মালিক, সাঈদ ইবনে যায়িদ ও উবাই ইবনে কা'ব, মুসআব ইবনে উমাইর ও আবু আইয়ূব খালিদ, আবু হুযাইফা ইবনে উতবা ও 'উব্বাদ ইবনে বিশর, আম্মার ইবনে ইয়াসার ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং আবু যার গিফারী ও মুনযির ইবনে আমর পরস্পর ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করেন। এছাড়াও হাতিব ইবনে আবু বালতাআ ও উয়াইম ইবনে সায়েদা, সালমান ফারসী ও আবুদ্ দারদা এবং আবু বাক্সের (রা) আযাদকৃত দাস বিলাল ও আবু রুয়াইহার মধ্যে ভ্রাতৃ বন্ধন স্থাপিত হয় সত' চান মতে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যে সব সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন তাদের মধ্যে উল্লিখিত সাহাবীদের নামই আমি জানতে পেরেছি।

তৃতীয় প্রজেক্ট: মদীনার সনদ

মদীনায় ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস। এ ধরনের বহুত্ববাদী একটি সমাজে ক্ষমতার দ্বন্দু, আনুগত্য পারস্পরিক বিবাদ ইত্যাদি সাধারণ সমস্যা। এ ধরনের জটিলত নিরসনে রাসূলুল্লাহ একটি সনদ প্রণয়ন করলেন যাতে এসব বিষয়ে কোনে জটিলতার অবকাশ না থাকে এবং মদীনা একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত হতে পারে। তিনি এ সনদে বিভিন্ন গোত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক কীরূপ হবে, কেনে বিবাদ হলে কীভাবে তার মীমাংসা হবে, যুদ্ধে কে কার পক্ষ নেবে বা সাহায্য করবে কারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হবে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করলেন।

চুক্তিপত্রের কয়েকটি ধারা এখানে উল্লেখ করা হলো।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

১. এটি নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্পাদিত। কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মু'মিন ও মুসলিমদের মাঝে লিখিত। এটি তাদের জন্যও প্রযোজ্য যারা তাদের অনুসারী, মিত্র এবং সহযোগী।
২. এরা সকলে এক উম্মাত, অন্যদের থেকে আলাদা।
৩. কুরাইশের মুহাজিরগণ তাদের আগের অবস্থায় থাকবে। নিজেদের মাঝে পূর্বের রীতিতে রক্তপণ আদায় করবে এবং নিজেদের বন্দীর মুক্তিপণ বহন করবে। আর তা করবে মু'মিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে।
৪. বনু আউফ তাদের আগের অবস্থায় থাকবে। নিজেদের মাঝে আগের রীতিতে রক্তপণ লেনদেন করবে এবং নিজেদের বন্দীর মুক্তিপণ বহন করবে। আর তা করবে মু'মিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে।
[একই ধারা অন্য কিছু গোত্রের জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়।]
৫. যারা বাড়াবাড়ি করবে, সকল সত্যনিষ্ঠ মুসলিম তাদের বিরোধিতা করবে, যদিওবা তাদের সন্তান হয়।
৬. এক মু'মিন অন্য মু'মিনকে কোনো কাফিরের বদলে হত্যা করবে না এবং কোনো কাফিরকে কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না।
৭. কোনো মুসলিম কাফির কুরাইশদের জানমালের নিরাপত্তা বা আশ্রয় দেবে না।
৮. কোনো মু'মিন, যে এই লিপির ধারাগুলো স্বীকার করেছে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছে তার জন্য বৈধ নয়, কোনো দুষ্কৃতিকারীকে সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দেওয়া।

৯. আর যে বিষয়েই তোমাদের মাঝে মতভেদ হবে তা আল্লাহর সমীপে ও মুহাম্মাদের সমীপে উপস্থাপিত হবে।

১০. বনু আউফের ইহুদিরা মু'মিনদের সাথে এক দলভুক্ত- ইহুদিদের জন্য ইহুদিদের ধর্ম, মুসলিমদের জন্য মুসলিমদের ধর্ম।

[একই ধারা ইহুদিদের অন্যান্য গোত্রগুলো জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়।]

১১. ইহুদিরা মুহাম্মাদের অনুমতি ছাড়া (যুদ্ধার্থে) বের হবে না।

১২. ইহুদিরা বহন করবে তাদের নিজেদের ব্যয়ভার ও মুসলিমরা তাদের নিজেদের। তাদের কেউ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

১৩. মদীনাকে পবিত্র স্থান বলে গণ্য করা হবে।

১৪. এই সনদভুক্ত পক্ষগুলোর মাঝে যদি কোনো সমস্যা বা বিবাদ সৃষ্টি হয়, যা থেকে হানাহানি বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে তার নিষ্পত্তিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১৫. নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না কুরাইশকে, আর না তাকে যে কুরাইশের সাহায্য করে।

১৬. চুক্তির সকল পক্ষ মদীনায় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য করবে।

চতুর্থ প্রজেক্ট: মুজাহিদ বাহিনী গঠন:

রাসুলুল্লাহ যে বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন তাকে ঠিক প্রচলিত অর্থে সেনাবাহিনী বলা যায় না। কারণ তাঁরা পেশাদার সৈনিক ছিলেন না। বরং তাদেরকে বলা চলে মিলিশিয়া বা বেসামরিক যোদ্ধা- তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল কিন্তু তাঁরা নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হতো। শর্তগুলো হলো:

১) ইসলাম

২) বয়ঃপ্রাপ্ত হতে হবে

৩) মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে

৪) এমন কোনো শারীরিক ত্রুটি না থাকা যা থাকলে যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব হবে না।

৫) আর্থিক সামর্থ্য থাকা, এই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ প্রত্যেক যোদ্ধার খরচ বহন করার মতো সামর্থ্য রাসূলুল্লাহর ছিল না। প্রত্যেককে নিজের খরচ নিজেকেই

বহন করতে হতো।

একই সাথে রাসূলুল্লাহ তাঁর বাহিনীকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করছিলেন। কুরআনে জিহাদ বিষয়ক অসংখ্য আয়াত আছে যা একজন মুসলিমকে জিহাদের ময়দানের জন্য আত্মিকভাবে প্রস্তুত হতে সাহায্য করে।

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং যে সওদা তোমরা (আল্লাহর সাথে) করেছো, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।" (সূরা আত-তওবা, ৯: ১১১)

সাফওয়ান অভিযান : প্রথম বদর অভিযান

উশাইরা অভিযান থেকে ফেরার দশ দিনের কম সময়ের মধ্যে একদিন কুরয ইবনে জাবের ফেহরী মদীনার আশপাশে ছেড়ে দেয়া উট ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে হামলা চালিয়ে বসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ তার পিছু ধাওয়া করলেন।৫৪ তিনি বদর প্রান্তরের একপাশে সাফওয়ান নামক একটি উপত্যকায় পৌঁছলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরয ইবনে জাবেরের নাগাল পেলেন না। এ ঘটনাকেই প্রথম বদর অভিযান বলা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরে এলেন এবং জামাদিউস সানী মাসের বাকী দিনগুলো এবং রযব ও শা'বান মাস মদীনাতেই কাটালেন।

ক্বিবলার পরিবর্তন

রাসূলুল্লাহর ও মদীনায় হিজরতের ১৪ মাস পরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে। তা হলো কিবলার পরিবর্তন। মক্কাতে থাকাকালীন সময়ে কিবলা ছিল জেরুসালেম বরাবর; কিন্তু তখন কিবলা নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি, কারণ মক্কায় থাকাকালীন তিনি জেরুসালেম ও কাবা উভয়কে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। এভাবে তিনি জেরুসালেম ও কাবা – উভয়ের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে পারতেন। কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর দেখা গেল যে, সেখান থেকে মক্কা ও জেরুসালেমের অবস্থান পরস্পরের বিপরীত। রাসূলুল্লাহ কাবা বরাবর সালাত আদায় করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করার সাহস পাননি। এরপর আল্লাহ আযযা ওয়াজাল ইবরাহীমের কিবলা অর্থাৎ কাবাকে মুসলিমদের কিবলা বানানোর নির্দেশ দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন। এ আয়াতটি মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ নতুন কিবলা বরাবর সালাত আদায় করলেন। এরই মধ্যে একজন সাহাবী মদীনার কয়েক মাইল দূরে তাঁর গোত্রকে কিবলা পরিবর্তনের খবরটি জানানোর জন্য বের হয়ে পড়েন। তিনি গিয়ে দেখলেন যে তাঁরা পুরনো কিবলা অর্থাৎ জেরুসালেম বরাবর আসরের সালাত পড়ছে। ওই অবস্থাতেই সেই সাহাবী তাদেরকে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি মাত্রই রাসূলুল্লাহর সাথে মক্কা বরাবর সালাত আদায় করেছি।' এ কথা শুনে তাঁরা তৎক্ষণাৎ সালাতের মধ্যেই নিজেদের ক্বিবলা মক্কার দিকে পরিবর্তন করে ফেললো। এ ঘটনা থেকে রাসূলুল্লাহর প্রতি সাহাবিদের প্রবল আনুগত্য যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় সেই সমাজে একজন মুসলিমের কথার উপর সবাই কতটা আস্থা রাখত।

হযরত আইশা (রা) সাথে সংসার

রাসুলুল্লাহ ও আ'ইশার সাথে সংসার শুরু করেন হিজরতের পর, সেটা হিজরতের প্রথম বা দ্বিতীয় বছরের ঘটনা, যদিও তাদের বিয়ে হয়েছিল মাক্কী জীবনের শেষের দিকে যখন আ'ইশার বয়স ছিল ছয় বছর। মদীনায় আসার পরে তাঁকে রাসূলুল্লাহর ঘরে তুলে আনা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর।

রাসূলুল্লাহ যখন আ'ইশাকে । বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৪ বছর, কিন্তু তখনও তিনি আসলে যেন যুবক। আমরা হাদীস থেকে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ আ'ইশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। বয়স রাসূলুল্লাহকে বেঁধে রাখতে পারেনি, তিনি তাঁর স্ত্রী আ'ইশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। যেমন, একদিন তাঁরা দু'জন সফরে বের হয়েছিলেন, আ'ইশা সেদিনের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে,

'আমি তাঁর সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দিলাম এবং জিতে গেলাম! কিন্তু পরে যখন আমি কিছুটা মোটা হয়ে গেলাম, তখন আবার তাঁর সাথে দৌড়ে অংশ নিলাম কিন্তু এবার তিনি আমাকে দৌড়ে হারিয়ে দেন। আর তখন তিনি বললেন, এটা হলো পূর্বের হারের বদলা!'৪4 অর্থাৎ আগেরবার আ'ইশা জিতেছিলেন, আর পরেরবার জিতলেন রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ বেশ স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ ছিলেন আর আল্লাহ তাআলার রাসূল হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর এরকম শারীরিক দক্ষতার দরকার ছিল।

রাসূলুল্লাহ যখন রাবিআ গোত্রের প্রতিনিধিদলের সাথে দেখা করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৫০ বছর। কিন্তু রাবিআ গোত্রের নেতা তার গোত্রের লোকদের কাছে রাসূলুল্লাহকে 'যুবক' হিসেবে উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ ছিলেন খুবই প্রাণবন্ত এবং উদ্যমী একজন মানুষ। তাই তাঁকে দেখে তরুণ মনে হতো। এছাড়াও আনাস ইবন মালিকের বর্ণিত হিজরতের কাহিনিতেও রাসূলুল্লাহ কেমন ছিলেন তা বোঝা যায়। তিনি উল্লেখ করেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ ও আবু বকর মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন লোকজন আবু বকরকে চিনতে পারলেও রাসূলুল্লাহকে চিনতে পারেনি কারণ রাসূলুল্লাহকে দেখতে যুবকদের মতো লাগতো আর সেটা তারা ধারণা করেনি।' আনাস তাঁর সেই বর্ণনায় আবু বকরকে 'বয়স্ক ব্যক্তি' আর রাসূলুল্লাহকে উল্লেখ করেছেন 'যুবক' হিসেবে। এ সম্পর্কে ইবন হাজার আল-আসকালানি মন্তব্য করেছেন যে, আবু বকরের বয়স যেমন তেমনই লাগতো, বড় বা ছোট মনে হতো না। অন্যদিকে, রাসূলুল্লাহ আবু বকরের চেয়ে দুই বছরের বড় ছিলেন কিন্তু তারপরও তাঁকে দেখতে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক মনে হতো।

বদরের যুদ্ধ

পটভূমি:

হিজরী দ্বিতীয় বর্ষ। কুরাইশদের সবচেয়ে বড় কাফেলাকে আশ-শামের উদ্দেশে। পাঠানো হলো। কুরাইশদের অন্যতম নেতা আবু সুফিয়ান ছিল সেই কাফেলার নেতৃত্বে। রাসুলুল্লাহর শক্তিশালী ইন্টেলিজেন্স টিম ছিল। তাদের মাধ্যমে তিনি নিয়মিত শত্রুপক্ষের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতেন। এই খবর পাওয়া মাত্র রাসুলুল্লাহ সেই কাফেলার খোঁজ নেওয়ার জন্য গুপ্তচর পাঠান। বুসাইসাহ ইবন উমরু তথ্য যোগাড় করে সরাসরি রাসুলুল্লাহর বাসায় এলেন, সেই সময় রাসূলুল্লাহর ঘরে ছিলেন শুধুমাত্র আনাস ও বুসাইসাহ। বুসাইসাহ রাসূলুল্লাহকে সে কাফেলার অবস্থান জানালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ দ্রুত বের হয়ে এসে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমরা একটা অভিযানে বের হবো, আমাদের লোক দরকার। যাদের সাথে এই মুহূর্তে চড়ার মতো বাহন প্রস্তুত আছে, শুধু তারাই এসো।' অনেকেই তাদের চড়ার উপযোগী জন্তু মদীনার নিকটস্থ পাহাড়ে ঘাস খাওয়ানোর জন্য রেখে এসেছিলেন। তাঁরা সেগুলো আনার জন্য রাসূলুল্লাহর কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, 'না, শুধু তারাই যোগ দেবে যাদের বাহন প্রস্তুত আছে।' রাসূলুল্লাহ একদমই দেরি করতে চাচ্ছিলেন না। প্রস্তুতির জন্য তিনি আলাদাভাবে সময় নষ্ট করতে চাননি। এ কারণেই এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা খুব কম ছিল। মুসলিমদের মধ্যে সেই সময় যুদ্ধ করার মতো অন্তত ১৫০০ লোক গণনা করা হয়েছিল, কিন্তু এই অভিযানে অংশ নিতে পেরেছিল মাত্র ৩১৭ জন, মতান্তরে ৩১৩ জন।

আবু সুফিয়ানের অধীনস্থ কাফেলাটি দখল করাই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই কাফেলাটি কুরাইশদের। এতে প্রচুর সম্পদ থাকবে। এটিকে আক্রমণ করো যাতে আল্লাহ তাদের সম্পদ তোমাদেরকে গনীমত হিসেবে প্রদান করেন।' এদিকে আবু সুফিয়ান বেশ সতর্ক ছিল। কারণ এর আগে ঘনঘন বেশ কিছু কাফেলা আক্রমণ হওয়ায় আবু জাহেল তার লোকদের মুহাম্মাদের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল। এ কারণে আবু সুফিয়ানও রাসূলুল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য গোয়েন্দা পাঠায়। আবু সুফিয়ান বদরে পৌঁছে যায়, বদর আর মদীনার দুরত্ব প্রায় দেড়শো কিলোমিটার। বদরে পৌঁছে সে উটের বিষ্ঠা হাতে নিয়ে গুঁড়ো করে পরীক্ষা করলো। সে এই বিষ্ঠা দেখে বুঝে গেল যে, এই বিষ্ঠা মদীনার খেজুর খাওয়া উটের বিষ্ঠা। সে বুঝে ফেললো মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীরা কাফেলা আক্রমণ করার জন্য আসছে। আবু সুফিয়ান কুরাইশদের কাছে সম্ভাব্য আক্রমণের ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে যোগাযোগ করলো এবং কাফেলা রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে খবর পাঠালো। এ সংবাদ দামদাম ইবন আমর আল-ঘিফারীকে দিয়ে

পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সে মক্কায় পৌঁছবার আগেই মক্কায় এ বিষয়টি নিয়ে হৈ-চৈ লেগে যায়।

মদীনার ঘটনাবলী:

রাসূলুল্লাহ অভিযানের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। আবু বকর ও উমার তাদের মতামত দিলেন কিন্তু তাদের বক্তব্য শোনার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ তেমন আগ্রহী ছিলেন না। সাদ ইবন উবাদা বললেন, 'হে রাসুলুল্লাহ আপনি কি আমাদের মতামত জানতে চান?' রাসূলুল্লাহ বললেন, 'হ্যাঁ, জানতে চাই।' এরপর সাদ ইবন উবাদা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল এ, যদি আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাহলে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব, আর আপনি যদি বারক উল-ঘামাদ পর্যন্ত যান তাহলে আমরাও সেদিকে যাব।”

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ও খুব খুশি হলেন। আনসাররা বাইয়াতের সময় রাসূলুল্লাহকে মদীনার অভ্যন্তরে নিরাপত্তা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তখন রাসুলুল্লাহ মদীনার বাইরে অভিযানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন তাই তিনি এ ব্যাপারে আনসারদের মতামত জানতে চাচ্ছিলেন। এ কারণেই তিনি আবু বকর ও উমারের কথা শোনার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। আনসাররা চাইলে বলতে পারতেন যে রাসূলুল্লাহর সাথে তাদের চুক্তি হয়েছিল শুধুমাত্র মদীনার অভ্যন্তরে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু তারা সেটা বলেননি, বরং তাঁরা উদগ্রীব ছিলেন রাসূলুল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে, হোক সেটা মদীনার ভিতরে বা বাইরে। রাসূলুল্লাহ সেটাই মনে মনে চাচ্ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ কাফেলার অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে তিনি কিছুসংখ্যক সাহাবাকে যুদ্ধ করার মতো বয়স না হওয়ার কারণে ফিরিয়ে দেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমার ইবন খাত্তাব ও আল-বারাকে পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ শুধু তাদেরকেই সাথে নেন যারা জিহাদে যেতে প্রবলভাবে উৎসাহী ছিল। ইসলামের প্রথম যুগের এই যোদ্ধাদের একটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তা হলো, তাঁরা আদর্শিকভাবে এতটাই অনুপ্রাণিত ছিলেন যে তাঁরা নিজ প্রেরণায় যুদ্ধে অংশ নিতে মুখিয়ে থাকতেন। অন্যদিকে, বর্তমান যুগের অধিকাংশ সেনাবাহিনীতে সৈন্যরা যুদ্ধ করে মূলত বিভিন্ন সেবা ও অর্থের আশায়। তারা যুদ্ধকে নিছক 'চাকরি' হিসেবে দেখে। সুযোগ পেলেই বা পরিস্থিতি একটু কঠিন হলেই তারা যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যায়।

আ'ইশা বর্ণনা করেন, 'আল্লাহর রাসূল বদরের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি যখন (মদীনা থেকে চার মাইল দূরে) হাররাত-উল-ওয়াবারাতে পৌঁছলেন, তখন এক লোক তাঁর কাছে আসলো। লোকটি বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য বেশ সুপরিচিত ছিল। রাসূলুল্লাহর সঙ্গীরা লোকটিকে দেখে বেশ খুশি হলেন। লোকটি বললো, আমি এসেছি তোমার সাথে যেতে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করতে। রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করো? সে বললো, না। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, তাহলে তুমি ফিরে যাও, আমি কোনো মুশরিকের কাছ থেকে সাহায্য নেব না। এরপর সে চলে গেল, আমরা যখন শাজারায় পৌঁছলাম, তখন আবার লোকটির দেখা মিললো। সে আবার একই প্রস্তাব দিল এবং রাসূলুল্লাহ তাকে একই কথা বললেন, তুমি ফিরে যাও, আমি কোনো মুশরিকের কাছ থেকে সাহায্য নেব না। এরপর লোকটি আবার বাইদায় এসে রাসূলুল্লাহকে নাগালে পেল, রাসূলুল্লাহ তাকে একই প্রশ্ন আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করো? এবারে সে বললো, হ্যাঁ, করি, তখন আল্লাহর রাসূল তাকে বললেন, ঠিক আছে, তুমি আমাদের সাথে চলো।'

তখন মুসলিমদের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। তাই তিনজন সাহাবীর জন্য একটি করে উট বরাদ্দ ছিল। তাঁরা পালাক্রমে উটের পিঠে চড়তেন। অন্যান্যদের মতো রাসূলুল্লাহও দুইজন সাহাবীর সাথে একটি উট ভাগাভাগি করে চড়তেন। যখন তাদের পালা আসত তখন তাঁরা নিজেরা না চড়ে রাসূলুল্লাহকে চড়ার জন্য অনুরোধ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ তাদেরকে বলতেন, 'তোমরা আমার চেয়ে শক্তিশালী নও আর আমিও তোমাদের মতো আল্লাহর কাছে পুরস্কারের প্রত্যাশী।'

মুসলিমদের শুরা:

কুরাইশদের যুদ্ধে বের হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাদের কাফেলা ইতোমধ্যেই নিরাপদ অবস্থানে পৌঁছে যায়, কিন্তু তবু তারা নিজেদের ঔদ্ধত্য আর অহংকার প্রকাশের জন্য বের হয়েছিল। তারা তাদের শক্তি সামর্থ্য নিয়ে দম্ভ করছিল। রাসূল বুঝতে পারলেন যে, কাফেলাটি অন্যদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু কুরাইশরা ব্যাপক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি ভেবেছিলেন তাদেরকে কাফেলার ৪০ জনের সাথে মোকাবেলা করতে হবে কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, ১০০০ জনের বিশাল বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ শূরা ডাকলেন আর সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা এ ব্যাপারে কে কী ভাবছেন। আবু বকর দাঁড়িয়ে কিছু কথা বললেন, উমারও একই কথা বললেন। এরপর দাঁড়ালেন মিকদাদ ইবন আসওয়াদ, তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ , আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আপনাকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন আপনি তার জন্য অগ্রসর হোন। বনী ইসরাঈল তাদের নবী মূসাকে বলেছিল, মূসা, তুমি তোমার রবকে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখান থেকে নড়ছি না। কিন্তু আমরা আপনাকে কখনোই এমন কথা বলব না। আমরা যুদ্ধ করবো আপনার সামনে থেকে, আপনার পেছন থেকে, আপনার ডানে দাঁড়িয়ে এবং আপনার বামে দাঁড়িয়ে। আপনি আপনার রবকে নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হোন, আমরাও আপনার সাথে আছি।

একথা শুনে আল্লাহর রাসূলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। তিনি উৎসাহের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। মিকদাদের এই কথাগুলো ছিল সাহাবাদের জন্য প্রেরণা। কিন্তু সবাই এ যুদ্ধে অংশ নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ তাঁরা মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন কাফেলা আক্রমণ করতে, বিশাল বাহিনীর সাথে লড়বার জন্য নয়। তাদের এই মনের কথা তাঁরা গোপন রাখলেও, আল্লাহ তা কুরআনে প্রকাশ করে দেন। কুরআনে এই যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয় ইতিহাসগ্রন্থেও। কিন্তু পার্থক্য হলো এই যে, একজন ইতিহাসবেত্তা শুধু তা-ই লেখেন যা তিনি উপলব্ধি করছেন, বাইরে থেকে দেখছেন। কিন্তু কার মনে কী আছে তা তিনি জানেন না। কিন্তু আল্লাহ তা জানেন, তাই বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

"যেমন করে আপনাকে আপনার রব ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না।" (সূরা আনফাল, ৮: ৫)

কিছু কিছু সাহাবী এই যুদ্ধে অংশ নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা ছিলেন মু'মিন। তাঁরাই ছিলেন সে সময়ের সেরা মুসলিমদের একেকজন। যুদ্ধ স্বাভাবিকভাবেই একটি অপছন্দনীয় বিষয়। আর মুসলিম বাহিনী হিসাবে এটিই ছিল প্রথম।

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা বাক্বারাহ, ২: ২১৬)

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল এরপর বলেন,

"তারা আপনার সাথে বিতর্ক করছে সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হওয়ার পর। যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হচ্ছে, আর তারা তা দেখছে। স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে দু'টি দলের মধ্য হতে একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ওটা তোমাদের করতলগত হবে। তোমরা এই আশা করেছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে। অথচ আল্লাহ চাচ্ছিলেন তাঁর 'কথা' দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফেরদের মূল কেটে দেবেন যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬-৮)

আল্লাহ মুসলিমদের মনের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন, 'আর তোমরা চাইছিলে যে কণ্টকহীন, বাধা বিপত্তিহীন কাফেলাটি যেন তোমাদের ভাগে আসে'। অর্থাৎ, লোকেরা কাফেলা চেয়েছিল। সেটা আক্রমণ করা ছিল তুলনামূলক সহজ, সেটিতে মুহাজিরদের অর্থ ছিল। এটাই ছিল তাদের পরিকল্পনা।

কিন্তু আল্লাহরও পরিকল্পনা ছিল, আর আল্লাহর পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হয়। মুসলিমরা চেয়েছিল নিছক কাফেলা আক্রমণ করে সম্পদ নিয়ে যেতে, তারা বড় কোনো যুদ্ধে জড়াতে চায়নি। কিন্তু আল্লাহ চাননি এই যুদ্ধ হোক নিছক মুহাজিরদের সম্পদ ফিরে পাওয়ার যুদ্ধ, তিনি চেয়েছেন আরো বড় কিছু। তিনি চেয়েছেন এই যুদ্ধে হক ও বাতিলের আদর্শ মুখোমুখি হোক আর তিনি হক্বকে জয়ী করেন এবং মিথ্যাকে পরাজিত করেন। তিনি পরিস্থিতিকে এমনভাবে বদলে দেন যে, মুসলিমদের এই যুদ্ধে অংশ নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। আর একারণে এই দিনকে বলা হয় ফুরক্বানের দিন বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী দিন।

দুই বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা:

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের সঠিক সংখ্যা ছিল ৯৫০ জন। রাসূলুল্লাহর হিসাব প্রায় ঠিক ছিল। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৩০০ জনের একটু বেশি, অর্থাৎ মুসলিমরা ছিল কুরাইশদের ৩ ভাগের ১ ভাগ। তাদের মধ্যে ৮৬ জন ছিলেন মুহাজির, ৬১ জন ছিলেন আল আওস গোত্রের

আর ১৭০ জন ছিলেন আল খাযরাজের। আল আউস গোত্রের বাসস্থান ছিল মদীনার উপরিভাগে। আর রাসূলুল্লাহ সেনা সংগ্রহ করার সময় বলেছিলেন, যাদের বাহন প্রস্তুত আছে শুধু তাঁরা সেনাদলে যোগদান করতে পারবে। তাই আল আউস গোত্রের লোকেরা একটু দূরে বসবাস করায় তাদের অল্পসংখ্যক লোক এই যুদ্ধে যোগদান করতে পেরেছে।
বুখারি থেকে বর্ণিত, আল বারা ইবন আযিব বর্ণনা করেন, 'আমরা, রাসূলুল্লাহর সাহাবারা যখন বদরের কথা আলোচনা করতাম, তখন আমরা বলতাম বদরে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সংখ্যা আর তালুতের যুদ্ধে অংশ নেওয়া মুজাহিদ, যারা নদীর পানিপান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে পেরেছিল তাদের সংখ্যা সমান। আর যারা এতে সফল হয়েছিল তাঁরা ছিল মু'মিন, তাঁরা ৩১০ জনের একটু বেশি ছিল।'

বদরের মুসলিম আর বনী ইসরাইলদের যারা তালুতের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে একটা মিল ছিল। আল বারা এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তা হলো, বনী ইসরাঈলের যেসব মু'মিন তালুতের সাথে যুদ্ধে যোগদান করেছিল তারাই ছিল তাদের যুগে সেরা। আর বদরে যেসব মু'মিন যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন তাদের যুগের সেরা। তাঁরা দুনিয়াবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তাই তাঁরাই ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ।

এই যুদ্ধে মুসলিমদের ছিল নিজস্ব ব্যানার, পতাকা, স্লোগান আর রণধ্বনি। যুদ্ধে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ধরে রাখাই ছিল এসবের উদ্দেশ্য। বদরের যুদ্ধের ব্যানার ছিল সাদা। এটি ছিল মুসআব ইবনে উমাইরের হাতে। রাসূলুল্লাহ দুটি কালো পতাকা বহন করিয়েছিলেন; একটির নাম ছিল আল উকবা, এটি ছিল আলী ইবনে আবি তালিবের হাতে এবং অপর কালো পতাকাটি আনসারদের একজনের হাতে দেওয়া হয়েছিল।

পুরো বাহিনীর মাত্র ২টি ঘোড়া ছিল। একটি ছিল যুবাইরের আর অন্যটি আল মিকদাদ ইবন আসওয়াদের হাতে। মুসলিমদের উট ছিল ৭০টি; প্রতিটি উট ৩ জনকে পালাক্রমে ভাগাভাগি করে চড়তে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ নিজের উটটি আলী ইবনে আবি তালিব এবং মারসাদ ইবনে মারসাদ আল ঘানাওয়ীর সাথে ভাগাভাগি করেছিলেন।

আল্লাহর সাহায্য:

যুদ্ধের আগের রাতে রাসূলুল্লাহ একটি স্বপ্ন দেখলেন। যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে আল্লাহ তাদের মনে স্বপ্নের মাধ্যমে শক্তি যোগান। স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ দেখলেন যে বাস্তব সংখ্যার চেয়ে কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যের সংখ্যা খুবই কম। কেন আল্লাহ আযযা ওয়াজাল, রাসূলুল্লাহ কে কুরাইশ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বাস্তব সংখ্যার চেয়ে কম দেখালেন? আল্লাহ আযযা ওয়াজাল

চেয়েছিলেন মু'মিনদের অন্তর দৃঢ় রাখতে। কুরাইশ বাহিনী ছিল মুসলিম বাহিনীর তিনগুণ। এটা মুসলিমদের মনোবল দুর্বল হওয়ার কারণ হতে পারে। যদি কোনো সৈন্য এটা ভেবে যুদ্ধের ময়দানে যায় যে, তাদের জেতার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাহলে সে যুদ্ধের ময়দানে ভেঙে পড়বে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে দেখান যেন মুসলিমরা হতোদ্যম হয়ে না পড়ে।

"আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ স্বপ্নে আপনাকে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন বেশি করে দেখালে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং এ বিষয় নিয়ে তোমরা একে অপরের সাথে বিতর্ক শুরু করে দিতে-কিন্তু আল্লাহ (এটা হতে না দিয়ে) তোমাদের রক্ষা করেছেন। মানুষের অন্তরে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে, তা তিনি জানেন।" (সূরা আনফাল, ৮:৪৩)

আরবে তখন বৃষ্টির মৌসুম ছিল না, কিন্তু তবু পরদিন সকালে বৃষ্টি হয়েছিল। ইবনে ইসহাক বলেছেন যে, উপত্যকাটি ছিল নরম আর বাদামী; আকাশ থেকে পানি মাটিকে এমনভাবে আর্দ্র করে দিয়েছিল যে রাসূলুল্লাহ এবং তাঁর বাহিনীর অগ্রসর হতে কোনো কষ্ট হয়নি। অপরদিকে কুরাইশদের উপর এতই বৃষ্টি হয়েছিল যে, তাঁরা ঠিক মতো সামনে এগুতেই পারছিল না।

এই বৃষ্টি দুপক্ষের উপরেই বর্ষিত হয়েছিল; মুসলিম আর কাফিরদের উপর, কিন্তু মুসলিমদের জন্য মাটি হয়েছিল আর্দ্র আর নমনীয়। অথচ একই বৃষ্টি কুরাইশদের জন্য মাটিকে করে দিয়েছিল কর্দমাক্ত আর দুঃসাধ্য। এটা তাদের সেনাবাহিনীকে বিপাকে ফেলে দেয়। একই বৃষ্টি কিন্তু দুপক্ষের উপর দু'রকম প্রভাব, এটি ছিল আল্লাহ আযযা ওয়া জালের পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য। সেই সকালে কিছু মুসলিম স্বপ্নদোষের কারণে অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে উঠেছিলেন। শয়তান মুসলিমদের মনে ওয়াসওয়াসা দিচ্ছিল, 'কীভাবে তোমরা অপবিত্র অবস্থায় যুদ্ধ করবে?" তাই আল্লাহ আযযাওাজাল ওই মুসলিমদের অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পানি বর্ষণ করে তাদের পবিত্র করে দিয়েছিলেন।

"আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের নিরাপত্তা আর স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি নাযিল করেছেন- উদ্দেশ্য ছিল এ পানি দ্বারা তিনি তোমাদের পবিত্র করবেন, তোমাদের মন থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করবেন, তোমাদের মনে বৃদ্ধি করবেন সাহস এবং (সর্বোপরি যুদ্ধের ময়দানে) তিনি এর মাধ্যমে তোমাদের পদক্ষেপ মজবুত করবেন।" (সূরা আনফাল, ৮: ১১)।

অবশ্যম্ভাবী সংঘাত এড়ানোর চেষ্টা:

ইবনে ইসহাক্ব বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা দেখলেন কুরাইশরা নিজেদের জায়গা ছেড়ে আকানকাল পাহাড়ের পেছনে বালুময় উপত্যকার কাছে জড়ো হচ্ছে। তাদের দেখে তিনি বলে উঠলেন,

'হে আল্লাহ! কুরাইশরা আজ নেমে এসেছে অহংকার আর দম্ভভরে – তোমার বিরোধিতায় আর তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে। হে আল্লাহ! আজ তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের বড় বেশি প্রয়োজন। হে আল্লাহ! তুমি আজ ওদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দাও।'

কুরাইশ কাফির বাহিনীর মাঝে লাল উটে আরোহিত এক কাফিরকে দেখে আল্লাহর রাসূল বললেন, 'কুরাইশদের কারো মাঝে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে, তবে এ লাল উটের আরোহীর মাঝেই রয়েছে। অন্যেরা যদি তাঁর কথা মেনে নিত, তাহলে সঠিক পথ পেত। (১) লাল উটের এই আরোহী ছিল কুরাইশদের অন্যতম নেতা উতবাহ ইবন রাবিয়াহ। কুরাইশরা মুসলিম বাহিনীর সামরিক শক্তি আর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য উমার ইবনে ওয়াহাবকে পাঠিয়েছিল। উমার ফিরে গিয়ে বলে, 'কুরাইশরা, তোমরা শোনো। আমি তাদের উটের পিঠে সাক্ষাৎ মৃত্যু দেখেছি। তাদের মধ্যে কারো অস্ত্র আর সম্বল শুধু তাদের তরবারি। আল্লাহর শপথা তোমাদেরকে না মেরে তারা মরবে না। তাদের প্রত্যেকে যদি আমাদের একজনকেও হত্যা করে, তাহলে আমাদের বেঁচে থেকে কী লাভ? কাজেই কুরাইশরা, তোমরা যা কিছু করবে, ভেবে চিন্তে কোরো।'

উমার ইবনে ওয়াহাব দেখেছিল যে, মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় বেশ কম। কিন্তু তাদের দেখে তার মনে হয়েছে তাঁরা মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছে। তাঁরা এসেছে মারতে এবং মরতে। হাকিম ইবনে হিযাম লাল উটের আরোহী সে কুরাইশ নেতার কাছে গিয়ে বললো,

- আমি কি আপনাকে এমন পরামর্শ দিব যা গ্রহণ করলে সারাজীবন লোকেদের মুখে আপনার প্রশংসা থাকবে।

- হ্যাঁ, বলো সেটা কী? উতবা জানতে চাইলো।

- আপনি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে মক্কায় ফেরত যান। হাদরামির রক্তপণ আপনিই পরিশোধ করে দিন, এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সবাইকে এর মধ্যে জড়াবেন না।

- ঠিক আছে, হাদরামির রক্তমূল্য আমি নিজে থেকে পুষিয়ে দিতে রাজি আছি। তুমি এক কাজ করো। তুমি আবু জাহেলের কাছে যাও, তাকে বোঝাও। সে-ই সবাইকে যুদ্ধের ব্যাপারে উসকানি দিয়ে উত্তেজিত করছে।

উতবা হাকিমের প্রস্তাবে রাজি হলো, সে যুদ্ধ না করে ফিরে যেতে চাইলো। এই যুদ্ধের একটা অন্যতম কারণ ছিল হাদরামি হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া। হাদরামি নিহত হয়েছিল আবদুল্লাহ ইবন জাহশের নেতৃত্বে পরিচালিত সারিয়ায়ে নাখলার অভিযানে। উতবা ছিল হাদরামির মিত্র, তাই হাকিম তাকে এই যুদ্ধকে এড়ানোর জন্য বিকল্প পন্থা হিসাবে হাদরামির রক্তপণ দিয়ে দিতে অনুরোধ করে। এই প্রস্তাবটি উতবার পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু তাদের নেতা ছিল আবু জাহেল, তাই তার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন ছিল। উতবা দাঁড়িয়ে কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে বললো,

শোনো, মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে লড়াইয়ে আমাদের তেমন কোনো অর্জন নেই। যদি তোমরা তাঁকে মেরে ফেলো তাহলে এমন সব মানুষ মারা পড়বে যাদের নিহত চেহারা দেখতে তোমাদের কারোই ভালো লাগবে না। তোমরা তো তোমাদের চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই অথবা গোত্রের কাউকেই হত্যা করবে। তোমরা ফিরে চলো এবং মুহাম্মাদকে আরবের অন্য গোত্রগুলোর হাতে ছেড়ে দাও। যদি তারা মুহাম্যাদ ও তাঁর সঙ্গীদের মেরে ফেলে তবে তোমাদের ইচ্ছাই পূরণ হবে। আর যদি মুহামম্মাদ বিজয়ী হয়, তাহলে সে আমাদের উপর প্রতিশোধ নেবে না।'

উতবা কুরাইশদেরকে এসব কথা বলছিল। অন্যদিকে হাকিম ইবনে হিযাম, আবু জাহেলকে এসব ব্যাপার বুঝানোর চেষ্টা করছিল। আবু জাহেল তার স্বভাবসুলভভঙ্গিতে তাকে খোঁচা দিয়ে বললো, 'উতবা কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পাঠানোর মতো পেল না।' হাকিম বললো, 'হ্যাঁ, হয়তো সে অন্য কাউকে পাঠাতে পারতো, কিন্তু মানুষটা উতবা বলেই আমি তার বার্তাবাহক হয়েছি, অন্য কারো হয়ে আমি কথা বলতে আসতাম না।'

এরপর আবু জাহেল বললো, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের দেখে ভয়ে উতবার বুক শুকিয়ে গেছে। আমরা কক্ষনো মক্কায় ফিরে যাবো না, যতক্ষণ আল্লাহ, মুহাম্মাদ আর আমাদের মধ্যে একটি ফয়সালা না করেন। সে ভয় পাচ্ছে আমরা মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের কচুকাটা করবো। তার ছেলে তো তাদের সাথেই আছে। ছেলেকে বাঁচাতেই সে মুসলিমদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে।'

কুরাইশদেরকে উত্তেজিত করার জন্য এরপর আবু জাহেল আমর ইবন হাদরামির ভাইয়ের কাছে গিয়ে বললো, 'ভাবতে পারো! তোমারই বন্ধু, তোমারই আশ্রয়দাতা উতবা চায় মক্কায় ফিরে যেতে! তুমি যাও, গিয়ে সবাইকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ প্রদান করো।' আমর ইবন হাদরামির ভাই তার মৃত ভাইয়ের স্মৃতিকে তরতাজা করতে কুরাইশ বাহিনীর সামনে গিয়ে বলতে থাকে, 'হায় আমর, হায় আমর'! এভাবে সে নানাভাবে তাদেরকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে।

আবু জাহেল শুধু তার বাহিনীকে মুসলিমদের উপর উত্তেজিত করেনি, সে উতবাকেও ক্ষেপিয়ে দিতে সফল হয়। উতবা যখন শুনলো আবু জাহেল তাকে ছোট করার জন্য বলেছে, 'উতবার বুক শুকিয়ে গেছে', তখন সে নিজের পৌরুষ দেখানোর জন্য বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, দেখা যাবে, কার বুক শুকিয়ে গেছে, আমার না তারা' আবু জাহেলের কথাকে ভুল প্রমাণ করতে গিয়ে বদরের দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে সবার আগে এগিয়ে যায়। আবু জাহেলের ব্যক্তিত্বই ছিল এমন। সে উসকানি দিয়ে মানুষকে ক্ষেপিয়ে দিতে পারত। সে একাই পুরো কুরাইশ বাহিনীকে যুদ্ধের দিকে ধাবিত করতে সক্ষম হয়।

টীকা১.আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৭২।সীরাহ মুহাম্মদ সা বই।

মুজাহিদদের প্রতি নবীজীর (সা) উৎসাহ প্রদান:

বদরের ময়দান। ইসলামের প্রথম মুজাহিদ বাহিনী প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ তাঁর বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,

"যে কেউ তাদের সাথে বীরত্বের সাথে লড়াই করবে এবং পিছু না হটে সামনের দিকে অগ্রসর হবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ তাঁর বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'ছুটে যাও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আকাশ এবং পৃথিবীর সমান!' উমাইর ইবন আল হামাম জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি! সত্যিই এত বড় জান্নাত আছে?', রাসূলুল্লাহ বললেন, 'হ্যাঁ! অবশ্যই আছে!' একথা শুনে উমাইর বলে উঠলেন, 'বাহ! বাহ!' রাসূলুল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাহ কেন বললে?' উমাইর উত্তর দিলেন, 'আমি ভাবছি, ইশ। আমি যদি জান্নাতে যেতে পারতাম!' রাসূলুল্লাহ বললেন, 'অবশ্যই। তুমি জান্নাতীদেরই একজন!' এরপর উমাইর ইবন হামাম উঠে দাঁড়ালেন এবং কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে শুরু করলেন। হঠাৎ উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলে বললেন, 'আরে! খেজুরগুলো খেতে তো অনেক সময় লেগে যাবে!'

উমাইর রাসূলুল্লাহর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহর পথে মারা যেতে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শহীদ হওয়ার জন্য এতটা আকুল ছিলেন যে, তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল খেজুর খাওয়া শেষ করে যুদ্ধে যোগ দিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই তিনি খেজুরগুলো ফেলে সাথে সাথে ময়দানে ছুটে যান।

রাসূল তাঁর বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, কারণ তা ছিল আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর প্রতি নির্দেশ।

"হে নবী, তুমি মু'মিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করো, যদি তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু'শ জনকে পরাস্ত করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যে একশো জন থাকে, তারা কাফিরদের এক হাজার জনকে পরাস্ত করবে। এর কারণ হচ্ছে, তারা এমন এক জাতি যারা (আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না। (সূরা আনফাল, ৮: ৬৫)

বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে:

রাসূলুল্লাহ তীক্ষ্ণ চোখে সৈনিকদের সারির দিকে লক্ষ্য রাখছেন। তাঁর হাতে একটি তীর। তিনি যুদ্ধে সেনাদের সারি এমনভাবে সোজা করে সাজাতেন যেন তিনি সালাতের কাতার সোজা করছেন। সারিতে দাঁড়ানো এক সৈন্যের নাম ছিল সাওয়াদ ইবন গাযিয়াহ। তিনি তাঁর সারি থেকে একটু সামনে এগিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ তাঁর পেটে আস্তে করে তীর দিয়ে একটি খোঁচা দিয়ে তাকে সারির ভেতর ঠেলে দিলেন। সাওয়াদ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে আঘাত করেছেন, আমি এর বদলা নিতে চাই।' এটা ছিল যুদ্ধের কিছুক্ষণ আগের ঘটনা। এক যোদ্ধা রাসূলুল্লাহকে বলছে সে বদলা নিতে চায়। রাসূলুল্লাহ তাঁর পেট উন্মুক্ত করে দিয়ে বললেন, 'বদলা নেবে! নাও!'

রাসূল রাগ করলেন না, সাওয়াদকে জেলে বন্দী করতেও বললেন না। কারণ এখানে একজন সৈনিক তার কমান্ডারের সাথে এমন আচরণ করছে। সাওয়াদ 'বদলা' নিলেন – তিনি রাসূলুল্লাহকে জড়িয়ে ধরে পেটে চুমু খেলেন – এই ছিল তাঁর বদলা। রাসুলুল্লাহ তাঁর এমন আচরণের কারণ জানতে চাইলেন। সাওয়ান জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন কী হতে চলেছে। আমার জীবনের শেষ স্পর্শ আমি আপনার সাথে চেয়েছি আল্লাহর রাসূল সা।

সাওয়াদ আশঙ্কা করছিলেন তিনি এই যুদ্ধে নিহত হবেন। সাহাবীদের জন্য বন্দরের আগে সেই মুহূর্তগুলো ছিল শঙ্কা দিয়ে ঘেরা। তাঁরা জানতেন না বাঁচবেন তি মরবেন, তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন মৃত্যুর সামনে। রাসূলুল্লাহর জন্য তাদের ভালোবাসা ছিল প্রচণ্ড। তাই শেষবারের মতো সাওয়াদ রাসূলুল্লাহর শরীরের স্পর্শ পেতে চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ তাঁর সাহাবী সাওয়াদকে ইচ্ছা করে আঘাত দেননি, সাওয়াদ তা ভালো করেই জানতেন। কিন্তু তিনি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন যেন রাসূলুল্লাহকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পারেন। মুসলিমরা এভাবে ভাবতেন না যে, রাসূলুল্লাহর কারণে আজকে তাদের বিপদ, তাঁরা মৃত্যুর সম্মুখীন। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য তাঁরা স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা সাওয়াদের জন্য দুআ করলেন।

সাওয়াদ যেভাবে রাসূলুল্লাহকে ভালোবেসেছেন, সেটাই সত্যিকারের ভালোবাসা। কবিতা কিংবা নাশিদ নয়, রাসূলুল্লাহর জন্য সত্যিকারের ভালোবাসা হলো তাঁর জন্য, তাঁর সম্মানের জন্য, তাঁর আনীত দ্বীনের জন্য নিজের জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা না করা। নিজের জান, মাল, পরিবার, টাকা-পয়সা, সন্তান-সন্ততি, মেধা-সবকিছুকে কুরবানি করে দেওয়া। রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসা মানে তাঁর দ্বীনকে ভালোবাসা, তাঁর শরীয়াহ ও সুন্নাহকে ভালোবাসা,

তাঁর সবকিছুকে ভালোবাসা। একজন মু'মিন কুফরে ফিরে যাওয়ার চাইতে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া পছন্দ করবে। এর আগে একজন মু'মিন কখনো ঈমানের মিষ্টতা উপলব্ধি করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা)তাঁর বাহিনী সাজালেন, লড়াইয়ের স্থান বাছাই করলেন, তাঁর সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করলেন একে একে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। জাগতিক সকল প্রস্তুতি নেওয়া শেষ করে এরপর তিনি আল্লাহ আযযা ওয়া জালের উপর ভরসা করে দুআ করলেন। এটিই হলো তাওয়াক্কুল। রাসূলুল্লাহ (সা)এক পাশে গিয়ে দুই হাত তুলে দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তিনি খুব গভীরভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। তিনি বললেন,

'হে আল্লাহ। তুমি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছো, তা পূরণ করো। আমি তোমার কাছে প্রতিশ্রুত সাহায্যের আবেদন করছি। তা না হলে দুনিয়ার বুকে তোমার ইবাদাত করার মতো আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।'

আজকের মতো কোটি কোটি মুসলিম সেই দিন ছিল না। মুসলিমদের সংখ্যা সেদিন ছিল এতই অল্প যে, যদি যুদ্ধে তারা নিহত হতো, তাহলে আল্লাহর ইবাদাত করার মতো আর কেউ থাকতো না। রাসূলুল্লাহ ও আল্লাহর কাছে দুআ করেই যাচ্ছিলেন। একসময় তাঁর শরীর থেকে চাদর খুলে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহর ও ব্যাকুলতা দেখে আবু বকরের খুব খারাপ লাগলো। তিনি বললেন, 'অনেক তো হলো, হে আল্লাহর রাসুল।'

আবু বকর বলতে চাচ্ছিলেন যে, কেন আল্লাহর রাসূল ও নিজেকে ক্লান্ত করে তুলছেন যখন আল্লাহ তাঁকে নরম মনের মানুষ। রাসূলুল্লাহর * বেশ উৎফুল্ল ভাব নিয়ে তিলাওয়াত করতে লাগলেন। সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। আবু বকর ছিলেন আবেগ তাঁকে খুব স্পর্শ করতো। এরপর রাসূলুল্লাহ বাইরে গেলেন ও সূরা আল কামারের দুটি আয়াত

"সংঘবদ্ধ দলটি শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে পালাবে। বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময়। আর কিয়ামত অতি ভয়ঙ্কর ও তিক্ততর।" (সূরা আল-কমার, ৫৪:৪৫-৪৬)

রাসূলুল্লাহর দীর্ঘ দুআর পর আল্লাহ তাঁকে বিজয়ের সুসংবাদ দেন।

"আর স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট (কাতর কণ্ঠে) ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করছি।" (সূরা আনফাল, ৮: ৯)

আল্লাহ রাসূলুল্লাহকে জানিয়ে দিলেন তিনি ১০০০ ফেরেশতা পাঠাবেন। কাফিরদের সাথে লড়তে একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট, জিবরীল তাঁর পাখার সরু প্রান্ত দিয়েই পুরো লূত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তারপরেও আল্লাহ তাআলা এক হাজার ফেরেশতা পাঠানোর ওয়াদা করেছেন। কারণ তিনি চেয়েছেন আল্লাহর রাসূলের মনে স্বস্তি এনে দিতে। এখানে সংখ্যা আসল কথা নয়, আসল কথা হলো রাসূলুল্লাহর মনের প্রশান্তি।

"সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি ইহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন।" (সূরা আনফাল, ৮: ১৭)

কুরাইশ বাহিনীতে ছিল এক প্রচণ্ড বদমেজাজি লোক। তার নাম আল আসওয়াদ আল মাখযুমি। সে জিদ করলো যে সে মুসলিমদের কজায় থাকা কুয়া থেকে পানি তুলে খাবে। আসওয়াদ কুয়ার দিকে এগোতে থাকলো। হামযা তার পায়ে আঘাত করলেন, তার পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু সে এতই একগুঁয়ে ছিল কাটা-পা নিয়ে সে কুয়ার দিকে যেতে থাকলো। শপথ পূরণ করতে সে বদ্ধপরিকর। হামযা আবার তাকে আঘাত করলেন, শেষ পর্যন্ত সে মারা যায়।

উতবা ইবন রাবিয়াহ, তাঁর ছেলে আল ওয়ালিদ ইবন উতবা ও তার ভাই শায়েবা-কুরাইশদের মধ্য থেকে এই তিনজন দাঁড়িয়ে গেল। তারা মুসলিমদের দ্বৈত যুদ্ধের আহ্বান জানালো। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আনসারদের মধ্য থেকে তিনজন এগিয়ে যান। আউফ, মুয়ায ইবনে আফরা এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। তাঁরা এগিয়ে গেলে উতবা তাদেরকে বললো,

- তোমরা কারা?

- আমরা আল আনসার।

- কিন্তু আমরা তোমাদের সাথে লড়তে চাই না। আমরা আমাদের নিজেদের লোকদের সাথে লড়বো, যারা আমাদের থেকে মুসলিম হয়ে গেছে।

উতবা মুহাজির কারো সাথে লড়তে চাইছিল। উতবা ছিল কুরাইশদের বিশিষ্ট নেতা। আবু জাহেল তাকে কাপুরুষ ডেকে এত ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল যে সে নিজের পৌরুষ প্রমাণে তার ভাই আর ছেলেকে নিয়ে দ্বৈত যুদ্ধে নেমে যায়। রাসূলুল্লাহও চাচ্ছিলেন দ্বৈত যুদ্ধে আনসাররা অংশ

না নিক। তিনি চাচ্ছিলেন তাঁর আত্মীয় এবং পরিবারের মধ্যে থেকে কেউ লড়তে এগিয়ে যাক। কেননা এটাই ছিল মুশরিক আর মুসলিমদের মধ্যকার প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ, এর আগে যদিও বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ হয়েছিল, কিন্তু এটি ছিল একটি যুদ্ধ, প্রথম যুদ্ধ। আর এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা।

রাসূলুল্লাহ আনসারদেরকে ফেরত পাঠিয়ে তিনজন মুহাজিরকে বাছাই করলেন, 'হামযা, উবাইদা এবং আলী, তোমরা ওঠো!' এরা তিনজনই রাসূলুল্লাহর আত্মীয়। হামযা ছিলেন রাসূলুল্লাহর চাচা, আর আলী এবং উবাইদা ইবন হারিস এ দু'জন ছিলেন রাসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই। তাঁরা তিনজন দ্বন্দ্বযুদ্ধে কুরাইশদের জবাব দিতে এগিয়ে যান। এই তিনজনের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন উবাইদা। তিনি তাই লড়লেন উতবার সাথে, সে ছিল মুশরিকদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। আলী লড়লেন ওয়ালিদের সাথে, তাঁরা দু'জনেই ছিলেন স্ব স্ব পক্ষের দ্বন্দ্বযোদ্ধাদের মাঝে কনিষ্ঠ। হামযা মুকাবিলা করলেন শাইবার।

হামযা আর আলী দুইজনই খুব দ্রুততার সাথে তাদের প্রতিপক্ষকে খতম করে দেন। কিন্তু উতবা আর উবাইদা একে অপরকে আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণ করতে থাকেন। দু'জন দু'জনকে আঘাত করেন এবং দু'জনই আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তখন আলী এবং হামযা এসে উতবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলেন।

আহত উবাইদাকে রাসূলুল্লাহর কাছে নিয়ে আসা হলো। রাসূলুল্লাহ তাঁর উরুতে উবাইদার মাথা রেখে তাকে সম্মান করলেন। রাসূলুল্লাহর চাচা আবু তালিব বলেছিলেন, 'আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের কথা ভুলে যাবো কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর খেদমত করে যাবো, কখনো ভুলবো না।' রাসূলুল্লাহর কোলে শুয়ে উবাইদা বলেন, 'হায়, যদি আবু তালিব দেখতে পেতন যে আমি তাঁর কথা রেখেছি!' উবাইদা ইবন হারিস, রাসূলুল্লাহর জন্য তাঁর জীবন দিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি একজন শহীদ।'

বদরের প্রান্তরের সেই দ্বৈত যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন 105,

"এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, যারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। যারা কুফর করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং তাদের চামড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। তারা যখনই যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, বলা হবেঃ দহন যন্ত্রণা আস্বাদন কর (এরা ছিল বিতর্কে প্রথম দল যারা ঈমানে আনে নি)।

(বিতর্কের দ্বিতীয় দল) যারা ঈমানে এনেছে এবং এবং ভালো কাজ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন আর মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে, তাদের পোশাক হবে রেশমের। তারা পথপ্রদর্শিত হয়েছিল সৎবাক্যের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহর পথে।" (সূরা হাজ্জ, ২২: ২০-২৪)

দ্বৈত যুদ্ধে হেরে গিয়ে কুরাইশরা রাগে অন্ধ হয়ে যায়। তারা মুসলিমদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন শত্রুরা কাছে না আসা পর্যন্ত যেন তারা আক্রমণ না করে। তিনি তাদের আদেশ করলেন, 'তোমরা তোমাদের তরবারি বের করো না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা তোমাদের নিকটে আসে।'

যুদ্ধ শুরুর পর মুশরিকরা মুসলিমদের তাদের সংখ্যার দ্বিগুণ দেখতে লাগলো। যুদ্ধ শুরুর আগে তারা সংখ্যায় মুসলিমদের কম দেখেছিল, কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন তারা মুসলিমদের দেখলো যেন তাঁরা সংখ্যায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ, মুশরিকরা ছিল ১০০০ আর তারা দেখল যে ২০০০ জন মুসলিম। সেটা দেখে তাদের মনোবল আরো ভেঙে পড়ে।

"নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল যুদ্ধ করছিল আল্লাহর পথে, আর অপর দলটি ছিল কাফের, তারা স্বচক্ষে মুসলিমদের সংখ্যায় তাদের দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষনীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১৩)

যুদ্ধে মুসলিমদের রণধ্বনি ছিল 'আহাদ। আহাদ!' মুসলিমদের প্রতিটি যুদ্ধে সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু স্লোগান ও রণধ্বনি থাকতো। পুরো যুদ্ধজুড়ে তারা সেগুলো আবৃত্তি করতো।

একজন আনসারী সাহাবি হারিসা ইবন শুরাকা আল-খাযরাজি এই যুদ্ধে ভুলক্রমে মুসলিমদের ছোঁড়া একটি তীরে নিহত হন। যুদ্ধের পর তাঁর মা রাসূলুল্লাহর সাথে দেখা করে জানতে চাইলেন, 'আমার ছেলে কি জান্নাতে যাবে? যদি সে জান্নাত পায় তাহলে আমি অনেক খুশি হবো। কিন্তু যদি না যায় তাহলে অনেক কষ্ট পাবো।' রাসূলুল্লাহ বললেন, 'কেন যাবে না? অবশ্যই যাবে! জান্নাতে অনেক বাগান আছে, আর তোমার ছেলে আছে জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু বাগানটায়!'

"বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। স্মরণ করুন আপনি যখন

বলতে লাগলেন মু'মিনদেরকে তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন। অবশ্য, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে স্মরণ করো এবং শত্রুপক্ষ তোমাদের উপর হঠাৎ চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের রব (প্রয়োজনে) পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আসলে এ সংখ্যাটা বলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য একটি সুসংবাদ দিয়েছেন, (বিজয়ের জন্য তো তিনিই যথেষ্ট) যাতে তোমাদের মন প্রশান্ত ও আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য ও বিজয়! সে তো পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।" (সূরা আল-ইমরান, ৩: ১২৩-১২৬)

মুসলিমদের বিজয়ের জন্য ফেরেশতা পাঠানোর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তবু আল্লাহ ফেরেশতাদের পাঠিয়েছেন মুসলিমদের স্বস্তি প্রদান করার জন্য, তাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দিতে। এই যুদ্ধে সেদিন নেমেছিলেন স্বয়ং জিবরীল।

ফেরেশতারা ছিলেন সাদা রঙের পাগড়ি পরিহিত। শুধু জিবরীল পরেছিলেন হলুদ পাগড়ি, যেন তাঁকে আলাদা করা সহজ হয়। তিনি ছিলেন সেদিন ফেরেশতা বাহিনীর নেতা। যুদ্ধে এক মুসলিম প্রবল বেগে এক কাফিরকে ধাওয়া করছিলেন। নাওয়া করতে করতে সে হঠাৎ তাঁর মাথার উপরে চাবুকের শপাং শপাং আওয়াজ শুনে পান। তাঁর কাছে মনে হলো, কেউ একজন ঘোড়ার উপর থেকে বলছে, 'চল হায়মুনা গুল।। এরপর সে মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন তাঁর সামনের সেই কাফির মাটিতে পড়ে আছে, তার নাক থেঁতলে গেছে এবং চাবুকের আঘাতে তার মুখ দু'ভাগ হয়ে গেছে। এটি ভিল আগুনের একটি আঘাত। সেই আনসারী সাহাবি রাসূলুল্লাহর কাছে বিষয়টি জানালেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, 'তুমি সত্য বলছো, এটি ছিল তৃতীয় আসমানের সাহায্য।' অর্থাৎ, এটি ছিলেন একজন ফেরেশতা। তিনি "হায়যুম" নামক ঘোড়ায় আরোহণ করছিলেন।

গিফারী গোত্রের এক লোক তার নিজ মুখে বর্ণনা করেছে সেদিনের আসমানী সাহায্যের কথা: 'আমি আর আমার চাচাতো ভাই বদরের সেইদিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম, আমরা তখনো মুশরিক ছিলাম। আমরা একটি পাহাড়ের চূড়ায় বসে যুদ্ধ শুরুর অপেক্ষা করছি। সেখানে বসে দেখছি কে এই যুদ্ধে জয়লাভ করে। এক পর্যায়ে এক টুকরো মেঘ এগিয়ে আসলো। মেঘটি পাহাড়ের কাছাকাছি আসার পর আমরা ঘোড়ার ছোটাছুটির আওয়াজ শুনতে পেলাম। সেইসাথে আরও একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'উকদিম হায়যুম!' আমার বন্ধু ঘটনাস্থলেই ভয় পেয়ে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা যায়। আমিও ভয়ে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। তবে পরে সুস্থ হয়ে উঠি।'

আবু দাউদ মায়ুনী বলেন, 'আমি আমার সামনের এক মুশরিককে ধাওয়া করছিলাম। হঠাৎ দেখি আমি তাকে মারার আগেই তার মাথা শরীর থেকে মাটিতে পড়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম তাকে অন্য কেউ হত্যা করেছে।' আনাস ইবন মালিক বলেন, 'লাশগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, কারা ফেরেশতাদের হাতে মরেছে আর কারা আমাদের তলোয়ারের আঘাতে মরেছে। যারা ফেরেশতাদের হাতে মরেছে তাদের ঘাড়ে আঙ্গুলের ছাপ দেখে মনে হচ্ছিল তাদেরকে তপ্ত লোহা দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।'

ফেরেশতারা সেদিনের সেই যুদ্ধে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা ধরে ধরে যুদ্ধবন্দিদেরও পাকড়াও করেছিলেন। আল-আব্বাসকে সেদিন নবীজির কাছে ধরে নিয়ে আসেন এক আনসারী সাহাবি। আল আব্বাস বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে তো এই লোক পাকড়াও করেনি। আমাকে পাকড়াও করেছে বর্মবিহীন এক সুদর্শন পুরুষ। সে সওয়ারী ছিল সাদা-কালো ছোপ-ছোপযুক্ত ঘোড়ার উপর। আমি তাকে আপনার সৈন্যদের মধ্যে দেখতে পাইনি।' একজন আনসারী বললেন, 'না। আমিই তাকে পাকড়াও করেছি আল্লাহর রাসূল', রাসূলুল্লাহ বললেন, 'চুপ থাকো, আল্লাহ তোমাকে একজন সমম্মানিত ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন"।

ইবনে আব্বাস বলেন, 'একমাত্র বদরের যুদ্ধেই ফেরেশতাগণ যুদ্ধ করেছেন। অন্য যুদ্ধে তাঁরা অতিরিক্ত সৈন্য বাহিনী এবং সহায়তা প্রস্তুত রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা যুদ্ধ করেননি। এই যুদ্ধে ৭০ জন মুশরিক নিহত হয় এবং ৭০ জন যুদ্ধবন্দী হয়। মুসলিমদের কেউ যুদ্ধবন্দী হয়নি, শাহাদাত বরণ করেন ১৪ জন। ৬ জন ছিলেন মুহাজির, আল খাযরাজ থেকে ৬ জন এবং আল আউস থেকে ২ জন।

টীকা ১. সহীহ বুখারি, অধ্যায় মাঘাযী, হাদীস ২২।সীরাহ মুহাম্মদ সা বই।

বনু কাইনুকার যুদ্ধ

বন্ধু কাইনুকার মূল ঘটনা ছিল এই যে, জনৈক আরব মহিলা কিছু পণ্যদ্রব্য নিয়ে বনু কাইনুকা গোত্রের বাজারে বিক্রি করে। সেখানে সে এক স্বর্ণকারের দোকানের কাছে বসে। দোকানের লোকেরা মহিলার মুখ খুলতে বলে। কিন্তু মহিলা তা করতে অস্বীকার করে। অতঃপর স্বর্ণকার এই মহিলার পরিধানের কাপড়ের একটা কোণা ধরে তার পিঠের সাথে বেঁধে দেয়। মহিলা এটা টের পায়নি। ফলে সে উঠে দাঁড়ালে অমনি উলঙ্গ হয়ে যায়। বাজারের লোকেরা তা দেখে হো হো করে হেসে ওঠে। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে। জনৈক মুসলমান স্বর্ণকারের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। স্বর্ণকার ছিল ইহুদী। তাই ইহুদীরাও সংঘবদ্ধ হয়ে ঐ মুসলমানকে হত্যা করে। তখন নিহত মুসলমানের পরিবার-পরিজন মুসলমানদের কাছে ফরিয়াদ জানায়। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে আক্রমণ চালালে বনু কাইনুকার সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ বেঁধে যায়।

মদীনার ইহুদীদের মধ্যে বনু কাইনুকাই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অবরোধ করে অনুকূল শর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। এভাবে আল্লাহর সাহায্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নতজানু করলে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল তাঁর কাছে এসে বললো, "হে মুহাম্মাদ, আমার মিত্রদের প্রতি সহৃদয় আচরণ করুন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। সে আবার বললো, "হে মুহাম্মাদ, আমার মিত্রদের সাথে সদয় আচরণ করুন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এবার সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্মের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলে তিনি বললেন, "আমাকে ছাড়।" এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত ক্রুদ্ধ হন যে, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে যায়। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, "আরে। আমাকে ছাড় তো!" সে বললো, "না, আমার মিত্রদের সাথে সদয় আচরণের নিশ্চয়তা আগে দিন, তারপর ছাড়বো। বিশ্বাস করুন, চারশো নাঙ্গামাথা যোদ্ধা এবং তিনশো বর্মধারী যোদ্ধা আমাকে সারা দুনিয়ার মানুষ থেকে নিরাপদ করে দিয়েছে। আর আপনি কিনা একদিনেই তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছেন। আমি তাদের ছাড়া এক মুহূর্তও নিরাপদ নই"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আচ্ছা, বেশ। ওদেরকে তোমার মর্জির ওপর ছেড়ে দিলাম।"

এরপর উবাদা ইবনে ছামিত (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন। বনু কাইনুকার সাথে তাঁরও মৈত্রী সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তাঁর কোন পরোয়া না করে তিনি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিলেন এবং তাদের

সাথে তার কৃত চুক্তির দায়দায়িত্ব থেকে তিনি আল্লাহ ও রাসূলের সামনে নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মিত্র ও বন্ধু শুধুমাত্র আল্লাহ, রাসূল ও মু'মিনগণ। এসব কাফিরের মৈত্রী থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।"

'উবাদা ইবনে ছামিত ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কেই সূরা মায়িদার নিম্নলিখিত আয়াতগুলো নাযিল হয়,

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খৃস্টানদের কখনো বন্ধু ও মিত্র হিসেবে গ্রহণ করো না। ওরা পরস্পরের মিত্র। তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তাদেরকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করবে সে তাদেরই দলভুক্ত গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমদেরকে সুপথ দেখান না। যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদেরকে তুমি দেখতে পাবে ইহুদী ও খৃস্টানদের ব্যাপার নিয়ে ছুটোছুটি করে আর বলে: আমাদের আশংকা হয়, আমাদের ওপর বিপদ-মুসিবত এসে পড়ে কিনা। আল্লাহ তো বিজয় দিতে পারেন কিংবা নিজের পক্ষ থেকে অন্য কোন ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারেন। তখন তারা মনের ভেতরে লুকানো ব্যাপার নিয়ে অনুতপ্ত হবে। মুমিনরা বলে: এই নাকি কসম খেয়ে লম্বা লম্বা বুলি আওড়ানো সেই লোকদের অবস্থা যারা বলে যে, তারা তোমাদের সাথেই রয়েছে। তাদের সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে গেছে। ফলে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। হে মু'মিনগণ, তোমাদের মধ্য হতে যদি কেউ তার দীন ত্যাগ করে, তাহলে সেদিন বেশী দূরে নয় যখন আল্লাহ এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটাবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসে, যারা মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কারো নিন্দা বা তিরস্কারের পরোয়া করবে না। এরূপ দৃঢ় হতে পারাটা আল্লাহ অনুগ্রহ বিশেষ। যাকে তিনি দিতে চান, এ অনুগ্রহ দিয়ে থাকেন। বস্তুতঃ আল্লাহর সর্বত্র বিরাজিত সর্বজ্ঞ। তোমাদের বন্ধু ও মিত্র তো একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেই সব মু'মিন যারা নামাযী, যাকাত দাতা ও আল্লাহর অনুগত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করবে সে আল্লাহর দলভুক্ত হবে এবং তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর দলই চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে থাকে।"

উহুদ যুদ্ধ

বদর যুদ্ধ থেকে পরাজয়ের কলংক মাথায় নিয়ে কুরাইশ কাফিররা যখন মক্কায় পৌঁছলো এবং আবু সুফিয়ানও তার কাফিলা নিয়ে মক্কায় ফিরে গেল তখন আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাবীআ, ইকরিমা ইবনে আবু জাহল ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াসহ কুরাইশদের একটি দল- যাদের পিতা, পুত্র কিংবা ভাই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, আবু সুফিয়ানের কাছে গেল। আবু সুফিয়ানের ঐ কাফিলায় সেবার যে মুনাফা অর্জিত হয় তা তখনো তার কাছেই ছিল। তারা বললো, “হে কুরাইশগণ, মুহাম্মাদ তোমাদের বিরাট ক্ষতি সাধন করেছে এবং তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের হত্যা করেছে। এবার এই কাফিলার যাবতীয় সম্পদ দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য কর, তাহলে আশা করি আমরা আমাদের হারানো লোকদের উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবো।" সবাই সম্মতি দিল।

অতঃপর আবু সুফিয়ান, তার কাফিলার অন্তর্ভুক্ত অকুরাইশীগণ, বিশেষতঃ কিনানা গোত্র ও তিহামাবাসীদের মধ্যে যারা কুরাইশদের প্রতি অনুগত ছিল, যুদ্ধে যেতে সম্মতি দিল, তখন কুরাইশগণও মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। প্রতিহিংসা বৃত্তিকে উস্কিয়ে দেয়ার জন্য এবং যোদ্ধাদের পালানো রোধ করার জন্য কুরাইশরা তাদের কিছু সংখ্যক মহিলাকেও সঙ্গে নিল। সেনাপতি আবু সুফিয়ান স্বীয় স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাকে, ইকরিমা বিন আবু জাহল উম্মে হাকিম বিনতে হারেসকে, হারেস বিন হিশাম ফাতিমা বিনতে ওয়ালীদকে, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বারযা বিনতে মাস'উদকে এবং আমর ইবনুল 'আস বারিতা বিনতে মুনাব্বিহকে সঙ্গে নিল। অতঃপর তারা মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হলো। মদীনার সম্মুখস্থ উপত্যকার মুখে অবস্থিত খাল থেকে নির্গত দুইটি ঝর্নার কিনারে বাতনুস্ সুবখার পাহাড়ের কাছে গিয়ে তাঁবু স্থাপন করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ তাদের ঐ স্থানে অবস্থান গ্রহণের কথা শুনতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "আমি একটি ভাল স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, আমার একটি গরু জবাই করা হয়েছে। আর আমার তরবারীর ধারালো প্রান্তে যেন ফাটল ধরেছে। আরো দেখলাম, আমি একটা সুরক্ষিত বর্মের ভেতরে হাত ঢুকিয়েছি। এই বর্ম দ্বারা আমি মদীনাকে বুঝেছি। তোমরা যদি মনে কর, মদীনায় অবস্থান করবে এবং কুরাইশরা যেখানে অবস্থান নিয়েছে, সেখানে থাকাকালেই তাদেরকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দেবে, তাহলে সেটা করতে পার। তারপরও যদিওরা ওখানেই অবস্থান করে তাহলে সেটা তাদের জন্য খুবই খারাপ অবস্থান বলে প্রমাণিত হবে। আর যদি তারা মদীনায় প্রবেশ করে তাহলে মদীনায় বসেই আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে মদীনার বাইরে যেতে চাচ্ছিলেন না। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুলেরও মত ছিল অনুরূপ মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার বিপক্ষে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি এবং যাদের জন্য আল্লাহ উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে যোগদানের সৌভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন তাঁরা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, শত্রুর মুকাবিলার জন্য আমাদেরকে মদীনার বাইরে নিয়ে চলুন। ওরা যেন মনে করতে না পারে যে, আমরা দুর্বল কিংবা কাপুরুষ হয়ে গেছি।”

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, মদীনাতেই অবস্থান নিন, বাইরে যাবেন না। আল্লাহর কসম, আমরা মদীনার বাইরে গেলেই শত্রুও আমাদের ক্ষতি বেশী করতে পারবে। আর শত্রুরা যদি মদীনায় প্রবেশ করে আক্রমণ চালায় তাহলে আমরা শত্রুদের অধিকতর বিপর্যয় ঘটাতে পারবো। অতএব হে আল্লাহর রাসূল, কাফিররা যেমন আছে ওদেরকে তেমনি থাকতে দিন। তারা যদি ওখানেই লেকে যায় তাহলে ঐ জায়গাটা তাদের জন্য জঘন্যতম অবরোধস্থল বলে সাব্যস্ত হবে। আর যদি তারা মদীনায় প্রবেশ করে তাহলে আমাদের পুরুষরা তাদের সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে এবং স্ত্রী ও শিশুরা ওপর থেকে তাদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করবে। আর যদি ফিরে যায় তাহলে যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে যাবে।" পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেসব মুসলমান মদীনার বাইরে কুরাইশদের সাথে লড়াই করতে আগ্রহী ছিলেন, তারা তাঁদের ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হলেন। সে দিনটি ছিল জুম'আর দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবেমাত্র নামায আদায় করেছেন। একই দিন মালিক ইবনে আমর নামক জনৈক আনসার ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযা পড়লেন। অতঃপর মুসলিম জনতার সামনে আসলেন। তিনি মদীনায় বসেই কুরাইশদের মুকাবিলা করতে চেয়েছিলেন ভেবে মুসলমানগণ অনুতপ্ত হলো। তারা বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার মত পছন্দ করিনি, এটা আমাদের উচিৎ হয়নি। আপনি যদি মদীনাতেই অবস্থান করতে চান তবে তাই করুন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "না, তা হয় না, যুদ্ধের পোশাক পরার পর যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা কোন নবীর পক্ষে শোভা পায় না।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাজার সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন। মদীনা ও উহুদের মধ্যবর্তী শাওত নামক স্থানে পৌঁছার পর প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল আলাদা হয়ে গেল। সে বললো, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের কথা শুনলেন, আমার কথা শুনলেন না। হে জনতা, আমি বুঝি না আমরা কিসের জন্য এতগুলো লোক এখানে প্রাণ দেবো?"

সে তার গোত্রের মুনাফিক ও সংশয়মান অনুসারীদের সাথে নিয়ে মুসলিম বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম তাদের পিছু পিছু গেলেন এবং বললেন,

"আমি তোমাদেরকে দোহাই দিচ্ছি। তোমাদের মুসলমান ভাইদেরকে এবং আল্লাহর নবীকে উপস্থিত শত্রুর হামলার মুখে ফেলে যেও না।" তারা বললো, "যুদ্ধ হবে মনে করলে তোমাদের রেখে যেতাম না। আমাদের মনে হচ্ছে যুদ্ধ হবে না।"

তারা যখন কিছুতেই রণাঙ্গনে ফিরে আসতে রাজী হলো না তখন আবদুল্লাহ বললেন, "হে আল্লাহর দুশমনরা, আল্লাহ তোমাদেরকে দূর করে দিন। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তোমাদের মুখাপেক্ষী রাখবেন না। আল্লাহই তাঁর জন্য যথেষ্ট।"
আনসারগণ বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের ইহুদী মিত্রদের কাছে সাহায্য চাইলে কেমন হয়?" তিনি বললেন, "ওদের দিয়ে কোন কাজ নেই।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের প্রস্তুতি অব্যাহত রাখলেন। উহুদ পাহাড়ের নিকটবর্তী উপত্যকায় তিনি অবস্থান গ্রহণ করলেন। সৈন্যদেরকে পাহাড়ের নিকটবর্তী প্রান্তে মোতায়েন করলেন এবং পাহাড়কে পেছনে রেখে দাঁড়ালেন। সৈন্যদেরকে বললেন, "আমি যুদ্ধের নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কেউ যুদ্ধ শুরু করবে না।" কুরাইশরা ইতোমধ্যে তাদের সমস্ত উট ও ঘোড়া উহুদের অদূরে মুসলমানদের খাল বিধৌত ছামগার ফসল সমৃদ্ধ ভূমিতে ছেড়ে দিয়েছে। এ জন্য যুদ্ধ শুরু করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধাজ্ঞা শুনে জনৈক আনসার বললেন, "আউস ও খাজরাযের ফসলী জমি থেকে আমরা এখনো আমাদের প্রাপ্য অংশ আদায় করিনি। এমতাবস্থায় সেখানে পশু চরানো কিভাবে বরদাশত করা যায়?"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাতশ' সৈন্যকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে ৫০ জন সৈন্যের তীরন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি করলেন। তিনি সাদা কাপড় দ্বারা চিহ্নিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, "ঘোড়সওয়ার শত্রুদেরকে তীর বর্ষণ করে তাড়িয়ে দিও। যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করি আর পরাজিত হই কোন অবস্থায়ই কাউকে পেছন দিক থেকে আসতে দেবে না। দৃঢ়ভাবে নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে থেকো, যেন তোমার দিক থেকে আমরা আক্রান্ত না হই।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটো বর্ম এক সাথে পরে নিলেন এবং পতাকা দিলেন মুস'আব ইবনে উমাইরের হাতে।

পনর বছর বয়স্ক সামুরা ইবনে জুনদুব ও রাফে ইবনে খাদীজকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন প্রথমে যোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করেননি। পরে অনেক সাহাবী বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, রাফে ভাল তীরন্দাজ।" তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। রাফেকে অনুমতি দিলে আবার অনেকে বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, সামুরা রাফেকে মল্লযুদ্ধে হারিয়ে দিতে পারে।" তখন তিনি সামুরাকেও অনুমতি দিলেন। কিন্তু উসামা ইবনে যায়িদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, যায়িদ ইবনে সাবিত, বারা ইবনে আযেব, আমর ইবনে

হাযম ও উসাইদ ইবনে যুহাইরকে অনুমতি দেননি। পরে খন্দক যুদ্ধে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। তখন তাদের বয়স ছিল পনর বছর।

কুরাইশরা তাদের তিন হাজার যোদ্ধাবিশিষ্ট সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করলো। তাদের সাথে দুশো ঘোড়া ছিল। এই ঘোড়সওয়ার বাহিনীর ডান পাশে খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে এবং বাম পাশে ইকরিমা ইবনে আবু জাহলকে রাখা হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ তরবারী দেখিয়ে বললেন, "এই তরবারীর হক আদায় করতে কে প্রস্তুত আছো?" অনেকেই এগিয়ে গেল। তিনি কাউকেই তরবারী ছিলেন না।

আবু দুজানা এগিয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ তরবারীর হক কি?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ তরবারী দিয়ে শত্রুকে এত বেশী আঘাত হানতে হবে যেন তা বাঁকা হয়ে যায়।" আবু দুজানা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওটা আমি নেব এবং হক আদায় করবো।" তিনি আবু দুজানাকেই তরবারীখানা দিলেন।

বস্তুতঃ আবু দুজানা ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও বীর যোদ্ধা। যুদ্ধের সময় তিনি ভীষণ গর্বিত ভঙ্গীতে চলতেন। তাঁর একটা লাল বন্ধনী ছিল। তা দিয়ে যখন নিজের গায়ে আঘাত করতেন তখন লোকে বুঝতো যে, তিনি এক্ষুণি যুদ্ধে নামবেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে তরবারীটা নেয়ার পর সেই বন্ধনীটা বের করলেন এবং নিজের মাথায় তা দিয়ে আঘাত করলেন। অতঃপর সৈন্যদের ব্যুহের মাঝে হেলে দুলে গর্বিত ভঙ্গীতে চলতে লাগলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "রণাঙ্গন ছাড়া হাঁটা চলার এই ভঙ্গীটা আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয়।"

ওদিকে আবু সুফিয়ান তার বাহিনীর পতাকাবাহী বনু আবদুদ দারের লোকদেরকে যুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বললো, "হে বনু আবদুদ দার, তোমরা বদরের যুদ্ধে আমাদের পতাকা বহন করেছিলে। কিন্তু সে যুদ্ধে আমাদের কি পরিণতি হয়েছিলো তা দেখেছো। মনে রেখ, সৈন্যদের ওপর পতাকার দিক থেকেই হামলা এসে থাকে। পতাকা যদি নেমে যায় তাহলে সৈন্যরা পর্যুদস্ত হয়। সুতরাং তোমরা হয় পতাকা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে নয়তো সরে যাবে। ওটা আমরাই ধরে রাখতে পারবো।" এ কথা শুনে পতাকাবাহীরা পতাকার প্রতি মনোযোগী হলো এবং আবু সুফিয়ানের কাছে প্রতিজ্ঞা করে বললো, "আমরা আমাদের অধিনায়কত্ব তোমার কাছে অর্পণ করছি। আগামীকাল যখন আমরা লড়াইয়ে নামবো, তখন দেখে নিও আমরা কেমন লড়াই করি।" আবু সুফিয়ান এই সংকল্পই তাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো।

পরের দিন লড়াই শুরু হলে উতবার কন্যা হিন্দ তার সহযোগী মহিলাদের সাথে নিয়ে ঢোল বাজিয়ে পুরুষদের পিছু পিছু চলতে লাগলো এবং এই বলে তাদের উত্তেজিত করতে লাগলোঃ

"চমৎকার, হে বনু আবদুদ্ দার,
চমৎকার (তোমাদের তৎপরতা) হে পশ্চাদ্দিকের রক্ষকগণ!
তারা আরও বলছিলো, যদি ধাবমান থাক, আলিঙ্গন করব এবং
প্রতিটি ধারালো তরবারী দ্বারা আঘাত হানো"
নরম গদি বিছিয়ে দেবো
আর যদি পিছিয়ে যাও
আলাদা হয়ে যাবো,
আমাদের ভালোবাসা পাবে না তোমরা।"

উহুদের যুদ্ধে সাহাবীগণ যাতে পরস্পরকে চিনতে পারে সেজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে একটা প্রতীক ধ্বনি শিখিয়ে দিলেন, তা হলো, "আমিত, আমিত।" অর্থাৎ মরণ আঘাত হানো। মরণ আঘাত হানো।

ক্রমে যুদ্ধ তুমুল আকার ধারণ করলো। আবু দুজানা এমন অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন যে, যাকেই সামনে পান হত্যা করতে করতে এগিয়ে যান। যুবাইর ইবনুল আওয়াম বলেন, "মুশরিকদের একটা লোক আমাদের কোন সৈনিককে দেখলেই তাকে হত্যা করতে লাগলো। আবু দুজানা ও এই লোকটি পরস্পরের কাছাকাছি এগিয়ে যেতে লাগলো। আমি দোয়া করছিলাম আল্লাহ যেন দু'জনকে একত্রিত করেন। অচিরেই দু'জন মুখোমুখি হলো এবং উভয়ে উভয়কে আঘাত হানতে শুরু করলো। মুশরিক লোকটা আবু দুজানাকে আঘাত করলো। আবু দুজানা তার চামড়ার তৈরী ঢাল দিয়ে আঘাত ফেরালেন। তরবারী ঢালের মধ্যে ঢুকে আটকে রইল। আর আবু দুজানা তাকে পাল্টা আঘাত করে হত্যা করলেন। অতঃপর দেখলাম তিনি হিন্দ বিনতে উতবার মাথার ওপর তরবারী উত্তোলন করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তরবারী নামিয়ে নিলেন।হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) যুদ্ধ করতে করতে আরতাহ ইবনে আবদ শুরাহবীলকে হত্যা করলেন। সে ছিলো পতাকা বহনকারী দলের অন্যতম সদস্য। পরক্ষণেই তিনি দেখতে পেলেন সিবা ইবনে আবদুল উয্যা তার পাশ দিয়েই চলে যাচ্ছে। তিনি তাকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিলেন। বললেন, "ওহে হাজামনীর বেটা, আমার সামনে আয়।" সিবার মা মক্কায় খাতনা করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

যুবাইর ইবনে মুতয়িমের গোলাম ওয়াহশী বলেন, আমি হামযার দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখলাম, তিনি স্বীয় তরবারী শত্রুদের দিকে তুলছেন আর চোখের নিমিষেই তাদেরকে সাবাড় করে দিচ্ছেন। সামনের কাউকেই জীবিত ছাড়ছেন না। যুদ্ধ করতে করতে তাঁর সারা দেহ ধুলায়

আচ্ছন্ন হয়ে ধূসর বর্ণের উটের মত হয়ে গেছে। এই সময় সিবা ইবনে আবদুল উযযা আমার সম্মুখ দিয়ে গিয়ে হামযার কাছাকাছি হলো। হামযা তাকে দেখে ইংকার ছাড়লেন, "এই হাজামনীর বেটা, আয় আমার কাছে, মজা দেখাই।" এই বলেই তাকে আঘাত হানলেন। কিন্তু তার মাথায় আঘাত লাগলোনা বলে মনে হলো। আমি হামযার প্রতি আমার বর্শা তাক করলাম। লক্ষ্য ঠিক হয়েছে বলে যখন নিশ্চিত হলাম, তখন ছুঁড়ে মারলাম তাঁর প্রতি। বর্শা তাঁর তলপেটে গিয়ে বিদ্ধ হলো এবং দুই উরুর মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। তিনি এ অবস্থায়ও আমার দিকে এগুলেন। কিন্তু পরক্ষণেই শক্তিহীন হয়ে পড়ে গেলেন। আমি তাকে খানিকটা সময় দিলাম। তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তখন আমি গিয়ে আমার বর্শা টেনে বের করলাম। অতঃপর কুরাইশ বাহিনীর মধ্যে ফিরে গেলাম। রণাঙ্গনে আমার হামযাকে হত্যা করা ছাড়া আর কোন কিছুর প্রয়োজন ছিল না। আমি তাকে হত্যা করতে পারলে স্বাধীন হতে পারবো জেনেই তাকে হত্যা করলাম। মক্কা ফিরে যাওয়া মাত্রই আমাকে স্বাধীন করে দেয়া হলো। অতঃপর মক্কাতেই বাস করতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা জয় করলে আমি পালিয়ে তায়েফে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলাম। কিন্তু তায়েফ থেকে একদল প্রতিনিধি ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলে আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম। বুঝে উঠতে পারলাম না যে, কোথায় যাবো। ভাবলাম, সিরিয়া কিংবা ইয়ামানে চলে যাবো। কেননা সেখানে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে বললো, "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম গ্রহণ করলে এবং কালেমায়ে শাহাদাত পড়লে কাউকেই হত্যা করেন না।" এ কথা শুনে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে গেলাম। তিনি আমার হঠাৎ উপস্থিতিতে এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে সত্য দীনের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করতে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। চোখ তুলে একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বসো। তুমি কিভাবে হামযাকে হত্যা করেছিলে আমাকে বলো।" আমি তাকে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলাম। সব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তুমি কখনো আমার সামনে আসবে না। আমি যেন তোমাকে না দেখি।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন জীবিত ছিলেন আমি তাঁর কাজে গেলেই এক পাশে সরে যেতাম যেন আমার মুখ তিনি দেখতে না পান।

মুস'য়াব ইবনে উমাইর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করা জন্য বীরোচিতভাবে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। তাঁকে হত্যা করেছিলো ইবনে কিমা লাইসী। সে মনে করেছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই হত করেছে। তাই সে কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, "মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি মুসয়াব নিহত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে অ তালিবের (রা) হাতে পতাকা অর্পণ করলেন। অতঃপর আলী (রা) ও অন্যান্য মুসলি বীর শার্দুলেরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

উহুদের যুদ্ধ ভয়ংকর রূপ ধারণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ল আনসারদের পতাকাতলে বসলেন। তিনি আলী (রা)কে দূত মারফত নির্দেশ দিলে যে, "পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাও।" আলী এগিয়ে গিয়ে হুংকার দিয়ে বললেন, আমি বিভীষিকার বাবা" আবু সা'দ এগিয়ে এসে তাকে বললো, "হে বিভীষিকার বাবা তোমার লড়াই করার শখ আছে নাকি?" আলী বললেন, "হ্যাঁ, আছে।" অতঃ উভয়ের মধ্যে লড়াই শুরু হলে গেল। আঘাত ও পাল্টা আঘাত চললো। অবশেষে আলী (রা) একটা আঘাত করেই তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। ধরাশায়ী করেই আলী (রা) সেখান থেকে সরে গেলেন এবং তাকে মরণ আঘাত হানলেন না। আলীকে তাঁর সঙ্গীরা বললেন, "ওকে চূড়ান্ত আঘাত না করে সরে গেলেন কেন?" তিনি জবাব দিলেন, আবু সা'দ আমাকে তার যৌনাঙ্গ দেখিয়েছে। কিন্তু আমার মনে তার প্রতি দয়া ও করুণার সঞ্চার হলো এবং সেই করুণাবশেই আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম। তবে আমি বুঝতে পেরেছি যে, স্বয়ং আল্লাহই তাকে হত্যা করেছেন।"

আসিম ইবনে সাবিত ইবনে আবুল আকলাহ্ (রা) যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মুসাফে ইবনে তালহা ও তাঁর ভাই জুলাস ইবনে তালহাকে হত্যা করেন। উভয়কেই তিনি এক এক করে বর্শা দিয়ে আঘাত করেন এবং প্রত্যেকে আহত অবস্থায় তার মা সুলাফার কাছে যায় এবং তার কোলে মাথা রাখে। সুলাফা পুত্রকে জিজ্ঞেস করে, "হে প্রিয় বৎস, তোমাকে কে আহত করলো?" সে জবাব দেয়, "ইবনে আবুল আকলাহ।" তখন সুলাফা মান্নত করে যে, আসিম ইবনে সাবিত ইবনে আবুল আকলাহকে হত্যা করা সম্ভব হলে সে তার মাথার খুলিতে মদ পান করবে।

হানযালা ইবনে আবু আমের গাসীল আবু সুফিয়ানের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এক পর্যায়ে হানযালা আবু সুফিয়ানের ওপর পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। তা দেখে শাদ্দাদ ইবনে আসওয়াদ নামক কুরাইশ যোদ্ধা হানযালাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বললেন, "তোমাদের বন্ধু হানযালাকে ফেরেশতারা গোসল করাচ্ছেন।" পরে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে জানা যায় যে, তাঁর ওপর গোসল ফরয ছিল। জিহাদের ডাক শোনার পর আর গোসল করার অবকাশ পাননি। তৎক্ষণাৎ রণাঙ্গনে চলে যান।

এরপর আল্লাহ মুসলমানদের ওপর সাহায্য নাযিল করেন এবং তাদের সাথে কৃত স্বীয় ওয়াদা পূরণ করেন। ফলে তারা কুরাইশ বাহিনীকে ব্যাপকভাবে হত্যা ও নির্মূল করতে সক্ষম হন। মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের মুখে তিষ্ঠাতে না পেরে কাফিররা পালিয়ে যেতে বাধ্য হন এবং মারাত্মকভাবে পরাজয় বরণ করে।

যুবাইর (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি উতবা তনয়া হিন্দ ও তার সহচরদেরকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে দেখেছি। তাদেরকে পাকড়াও থেকে বাঁচানোর জন্য মুশরিকদের কোন বড় বা ছোট

দলকে এগুতে দেখলাম না। এভাবে বিজয় যখন ষোলকলায় পূর্ণ হতে চলেছে, তখন সহসা তীরন্দাজ বাহিনী তাদের অবস্থান ত্যাগ করে পলায়নরত কুরাইশ বাহিনীর পিছু ধাওয়া করলো এবং আমাদের পেছনের গিরিপথটাকে খোলা রেখে গেল। আমরা পেছন দিক থেকে আক্রান্ত হলাম। ঠিক এই সময় কে যেন চিৎকার করে বললো, "মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে।" অনন্যোপায় হয়ে আমরা রণাঙ্গনে ফিরে এলাম, আর কুরাইশ বাহিনীও আমাদের ওপর নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অথচ আমরা তাদের পতাকাবাহীদেরকে পর্যন্ত পর্যদন্ত করেছিলাম এবং এতখানি অচল করে দিয়েছিলাম যে, তাদের ভুলুণ্ঠিত পতাকার কাছেও কেউ যেতে পারেনি। অবশেষে আমরাহ্ বিনতে হারেসিয়া নামী এক মহিলা তা তুলে নিয়ে কুরাইশদের কাছে পৌঁছে দেয়। অতঃপর সেই পতাকাকে কেন্দ্র করে ও সম্বল করে তারা পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়। মুসলমানগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। সেই সুযোগে শত্রুরা তাদের ভেতরে ঢুকে ব্যাপক আক্রমণ চালালো। ফলে সে দিনটা হয়ে দাঁড়ালো এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা ও পরিশুদ্ধির দিন। বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমানকে আল্লাহ শাহাদাতের সম্মানে ভূষিত করলেন। এমনকি শত্রুরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তিনি শরীরের এক পার্শ্বে একটি পাথরের আঘাত খেলেন। এতে তাঁর দাঁত ভেঙ্গে গেল এবং তাঁর মুখমণ্ডল ও ঠোঁট আহত হলো। উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস তাঁকে এ আঘাত করেছিলো। তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। তিনি হাত দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, "যে জাতি তার নবীর মুখমণ্ডল রক্তরঞ্জিত করে সে জাতি কি করে কল্যাণ লাভকরবে? অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার দিকে ডাকছেন।" আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ উক্তির জবাবে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন:

.. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

“(হে নবী!) কোন চূড়ান্ত ফায়সালার ইখতিয়ার তোমার নেই। ইখতিয়ার রয়েছে আল্লাহর হাতে। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন, আবার শাস্তিও দিতে পারেন। কেননা তারা যালিম।" (আলে ইমরান)

আবু সাঈদ খুদরীর (রা) বর্ণনা মতে উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাসের বর্শার আঘাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান দিকের নীচের দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর নীচের ঠোঁট আহত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব জুহরী তাঁর কপাল জখম করে দেয়। আর ইবনে কুময়া তাঁর চোয়ালের উপরিভাগে আঘাত হানে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিরস্ত্রাণের দুটো অংশ ভেঙ্গে তার চোয়ালের ভেতরে ঢুকে যায়। অতঃপর মুসলমানদেরকে তাদের অজান্তে ফেলে মারার জন্য আবু আমের যে গর্ত খুড়ে রেখেছিল তার একটিতে তিনি পড়ে যান। এই সময় আলী (রা) এসে তাঁর হাত ধরেন এবং তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) তাঁকে ওপরে তোলেন। তাঁদের সাহায্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়াতে

সক্ষম হন। আবু সাঈদ খুদরীর পিতা মালিক ইবনে সিনান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের রক্ত চুষে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বললেন, "আমার রক্ত যার রক্তের সাথে মিশ্রিত হয় দোযখের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।"

মুশরিক বাহিনী রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এমন কে আছ, যে আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য জীবন করবানী করতে প্রস্তুত? এ কথা শুনে যিয়াদ ইবনে সাকানসহ পাঁচজন আনসার সাহাবী উঠে দাঁড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিফাজতের জন্য এক একজন করে লড়াই করে শহীদ হতে লাগলেন। সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন যিয়াদ ইবনে সাকান কিংবা আম্মারা ইবনে ইয়াযীদ ইবনুস সাকান। তিনিও বীর বিক্রমে লড়াই করে গুরুতরভাবে আহত হলেন। ইতিমধ্যে মুসলমানদের একটি দল সেখানে ফিরে এলো এবং উক্ত আহত সাহাবীর পক্ষে লড়াই করে শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করে হটিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত সাহাবীকে দেখিয়ে বললেন, "ওকে আমার কাছে আনো।" মুসলমানগণ তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এলো। তিনি নিজের জানুর ওপর তার মাথা রেখে শোয়ালেন। এই অবস্থাতেই উক্ত সাহাবী ইনতিকাল করলেন।

আবু দুজানা (রা) নিজের দেহকে ঢাল বানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর পিঠে তীর বিদ্ধ হচ্ছিলো আর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আড়াল করে তাঁর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। এভাবে তাঁর গায়ে বিদ্ধ তীরের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রচুর। আর সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিরক্ষার চেষ্টায় তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সা'দ বললেন, "আবু দুজানাকে দেখলাম, আমাকে একটার পর একটা তীর দিয়েই চলছেন আর বলছেন, 'তোমার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক। তুমি তীর নিক্ষেপ করতে থাক।' এমনকি সময় সময় তিনি ফলকবিহীন তীরও দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'নিক্ষেপ কর।"

পরাজয় ঘটার এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদাত লাভের গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম চিনতে পারেন কা'ব ইবনে মালিক। কা'ব বলেন, "শিরস্ত্রাণের ভেতর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ দুটি জ্বলজ্বল্ করছিলো আর তা দেখেই আমি চিনতে পারলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললাম "হে মুসলমানগণ, সুসংবাদ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁচে আছেন। তিনি এখানে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইশারা করে বললেন, "তুমি চুপ থাক।"

মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চেনার পর তাঁকে নিয়ে সবাই পর্বতের ঘাঁটিতে চলে গেলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন আবু বাক্স সিদ্দীক, উমার ফারুক, আলী ইবনে আবু তালিব, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম সহ একদল মুসলমান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্বতের ঘাঁটিতে যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন উবাই ইবনে খালাফ সেখানে পৌঁছলো। সে বললো, “হে মুহাম্মাদ, এ যাত্রা তুমি প্রাণে বেঁচে গেলেও তোমার নিস্তার নেই।" মুসলমানগণ বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ লোকটিকে সহানুভূতি দেখানো কি আমাদের কারো জন্য সঙ্গত?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ওকে আসতে দাও।" সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে, তিনি হারেস ইবনে সিম্মারের কাছ থেকে বর্শা নিলেন। কোন কোন বর্ণনা অনুসারে, বর্শা হাতে নেয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ভয়ংকর পাঁয়তারা করলেন যে, উট প্রবল জোরে নড়ে উঠলে তার পিঠের ওপর বসা বিষাক্ত ভিমরুলের ঝাঁক যেমন ছত্রভঙ্গ হয়ে উড়ে যায়, আমরাও ঠিক তেমনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে দূরে সটকে পড়লাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার ঘাড়ের ওপর বর্জ্যর আঘাত হানলেন। আঘাত খেয়ে উবাই ইবনে খালাফ তার ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো এবং বেশ কয়েকটা গড়াগড়ি খেলো।

ইতিপূর্বে উবাই ইবনে খালাফ মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করে বলতো, "হে মুহাম্মাদ, আমার একটা ঘোড়া আছে। তার নাম 'আওজ'। তাকে আমি প্রতিদিন এক ফারাক (প্রায় ৪০ কেজি) ভুট্টা খাওয়াই। এই ঘোড়ায় চড়েই আমি তোমাকে হত্যা করবো।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিতেন, "বরং আল্লাহ চাহেতো আমিই তোমাকে হত্যা করবো।"

উবাইয়ের কাঁধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জখমটি করে দিয়েছিলেন, সেটা তেমন গুরুতর জখম না হলেও তা দিয়ে রক্ত ঝরছিলো। ঐ অবস্থাতেই সে কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, "আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ আমাকে খুন করেছে।” কুরাইশরা বললো, "আসলে তোমার মন অতিমাত্রায় ঘাবড়ে গেছে। তোমার কোন ভয় নেই।" সে বললো, "মক্কায় থাকাকালেই মুহাম্মাদ আমাকে বলেছিলো: 'তোমাকে আমি হত্যা করবো।' এখন আমার আশংকা হয়, সে যদি আমার প্রতি শুধু থুথুও নিক্ষেপ করে তা হলেও আমি মরে যাবো।" কুরাইশরা তাকে নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে সারেফ নামক স্থানে আল্লাহর এই দুশমনের জীবনলীলা সাঙ্গ হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্বত ঘাঁটির মুখে উপনীত হলে আলী ইবনে আবু তালিব (রা) পানির সন্ধানে বেরুলেন, উহুদের পার্শ্ববর্তী জলাশয় বা প্রস্তর ঘেরা হ্রদ 'মেহরাস' থেকে মশক ভরে পানি আনলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পান করতে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানিতে একটা দুর্গন্ধ পেয়ে তা পান করলেন না। বরং ঐ পানি দিয়ে তিনি মুখের রক্ত ধুয়ে ফেললেন এবং কিছুটা মাথায় ঢালতে ঢালতে বললেন, "আল্লাহর নবীর মুখকে যে ব্যক্তি রক্তে রঞ্জিত করেছে সে আল্লাহর ভয়ংকর ক্রোধের শিকার হবে।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্বতের একটি টিলার ওপর আরোহণে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু তিনি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং শুধু দুটি বর্মের সাহায্য নিয়ে শক্তি প্রদর্শন করছিলেন। টিলায় আরোহণের চেষ্টায় ব্যর্থ হলে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) তাঁকে ঘাড়ে করে আরোহণ করালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তালহা রাসূলের প্রতি যে সদাচরণ করলো তাতে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল।"

উহুদ যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিল বনু সা'লাবা গোত্রের মুখাইরীক। উহুদ যুদ্ধের দিন সে তার স্বগোত্রীয় ইহুদীদেরকে বললো, “হে ইহুদীগণ, তোমরা নিশ্চিতভাবেই জান যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।" ইহুদীরা বললো, "আজ তো শনিবার।” সে বললো, "তোমাদের জন্য শনিবারের অজুহাত যুক্তিযুক্ত নয়।" অতঃপর সে তরবারী ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলো। সে বললো, "আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার সমস্ত সম্পত্তি মুহাম্মাদের। তিনি ঐ সম্পত্তি যেভাবে খুশী ব্যবহার করবেন।" অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে গেল এবং তাঁর পক্ষে লড়াই করে নিহত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "মুখাইরীক ইহুদীদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।"

আবু হুরাইরা (রা) বলতেন, "তোমরা আমাকে বলে দাও, কে সেই ব্যক্তি যে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ সে নামায পড়েনি?" লোকেরা জবাব দিতে না পেরে জিজ্ঞাসা করতো, "কে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি?” তিনি বলতেন, "বনু আবদুল আশহালের উসাইরিম আমর ইবনে সাবিত ইবনে ওয়াকাশ।" হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান বলেন, "আমি মাহমুদ ইবনে আসাদকে জিজ্ঞেস করলাম, "উসাইরিম কি রকম লোক ছিল?" তিনি বললেন "সে আগে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন উহুদ অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন সেদিন সে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে ও ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর নিজের তরবারী নিয়ে ছুটতে থাকে এবং রণাঙ্গনে পৌছে যায়। সে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করে এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে। পরে বনু আবদুল আশহালের লোকেরা

রণাঙ্গনে তাদের লোকদের লাশ খুঁজতে গিয়ে তাকে পায়। তারা তাকে চিনতে পেরে পরস্পর বলাবলি করতে থাকে, উসাইরিম এখানে এলো কিভাবে? সেতো ইসলামকে অস্বীকার করতো। তখন সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'হে আমর, তুমি কি কারণে এখানে লড়াই করতে এলে? স্বগোত্রের টানে, না ইসলামের আকর্ষণে?' সে বললো, 'ইসলামের আকর্ষণে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমি ঈমান এনেছি এবং মুসলমান হয়েছি। তারপর তরবারী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিলাম এবং যুদ্ধ করে আহত হয়েছি। এর কিছুক্ষণ পরই উসাইরিম তাদের চোখের সামনে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সব ঘটনা শুনে বললেন: সে জান্নাতবাসী।"
আমর ইবনে জামুহ ছিলেন একজন সাংঘাতিক খোঁড়া লোক। তাঁর সিংহের মত চারটি ছেলে ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিভিন্ন রণাঙ্গনে লড়াই করতে যেতো। উহুদ যুদ্ধের দিন তারা তাদের পিতা আমরকে আটকিয়ে রাখতে চাইলো। বললো, "আল্লাহ আপনাকে যুদ্ধে যাওয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।" আমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, "আমার ছেলেরা আমাকে এই যুদ্ধে আপনার সাথে যেতে দিতে চায় না। আল্লাহর কসম, এই খোঁড়া পা নিয়েই আমি জান্নাতে প্রবেশ করার আশা রাখি।"

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহ যে তোমাকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন সে কথা ঠিকই।" পক্ষান্তরে তাঁর ছেলেদেরকে তিনি বললেন, "তোমাদের পিতাকে যুদ্ধে যেতে বাধা না দিলেও পার। এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ তার ভাগ্যে শাহাদাত নির্ধারিত রেখেছেন।" অতঃপর আমর উহুদে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন।

ওদিকে উতবার কন্যা হিন্দ এবং তার সহচরীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিহত সাহাবীদের লাশ বিকৃত করতে শুরু করলো। তাঁদের নাক কান কেটে ফেললো। হিন্দ তা দিয়ে পায়ের খারু বা গুলফ বন্ধনী ও গলার মালা বানালো এবং যুবাইর ইবনে-মুতয়িমের গোলাম ওয়াহশীকে সেইসব গুলফবন্ধনী, মালা ও কানের দুল উপহার দিল। সে হামযার কলিজা বের করে চিবালো, কিন্তু গিলতে না পেরে ফেলে দিল।

হালিস ইবনে যাব্বান সেদিন কুরাইশ বাহিনীতে হাবশী সৈন্যদের অধিনায়ক ছিল। সে আবু সুফিয়ানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলো। দেখলো, আবু সুফিয়ান তার বর্শার ফলক দিয়ে হামযার চিবুকে আঘাত করছে আর বলছে, "অবাধ্য কোথাকার। এখন মজাটা আস্বাদন কর"। হালিস এ দৃশ্য দেখে আর চুপ থাকতে পারলো না। বনু কিনানার লোকেরা কাছেই ছিল। তাদেরকে ডেকে বললো, "হে বনু কিনানা, কুরাইশ নেতার কাণ্ড দেখো। নিজের মৃত চাচাতো ভাইয়ের

সাথে কি আচরণ করছে।" আবু সুফিয়ান অপ্রতিভ হয়ে বললো, "কি আপদ, এটা আমার পদস্খলন। কাউকে বলো না।"

অতঃপর আবু সুফিয়ান রণাঙ্গন থেকে ঘরে ফেরার সিদ্ধান্ত নিল। রওনা হবার পূর্ব মুহূর্তে সে পাহাড়ের ওপর আরোহণ করে উচ্চস্বরে ধ্বনি দিল, “কর্মতৎপর লোকেরা যথার্থ পুরস্কার পেয়েছে। যুদ্ধের জয়পরাজয় পালাক্রমে হয়ে থাকে। একদিন এ পক্ষে, আর একদিন অন্যপক্ষে। হে হুবাল, (মূর্তির নাম) তুমি পরাক্রান্ত হও। অর্থাৎ তোমার ধর্মকে জয়যুক্ত কর।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধ্বনির জবাব দেয়ার জন্য উমারকে (রা) নির্দেশ দিয়ে বললেন, "তুমি বল, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ। আমরা ও তোমরা সমান নই। আমাদের নিহতরা জান্নাতবাসী আর তোমাদের নিহতরা দোযখবাসী।” উমার যখন এই পাল্টা ধ্বনি দিয়ে আবু সুফিয়ানের জবাব দিলেন, তখন আবু সুফিয়ান বললো, "উমার, একটু এ দিকে এসো।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমারকে বললেন, "যাও, সে কি বলতে চায় শুনে এসো।" উমার এগিয়ে গেলেন। আবু সুফিয়ান বললো, "হে উমার, তোমাকে আল্লাহর দোহাই। সত্য করে বলো, আমরা কি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি?” উমার বললেন, "আল্লাহর কসম, না। তিনি এই মুহূর্তেও তোমার কথাবার্তা শুনছেন।" আবু সুফিয়ান বললো, "তোমাকে আমি ইবনে কুময়ার চেয়ে সৎ ও সত্যবাদী বলে মনে করি।" উল্লেখ্য যে, ইবনে কুময়া কুরাইশদের কাছে বলেছিলো, "আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি।"

অতঃপর আবু সুফিয়ান উমারকে সম্বোধন করে বললো, "তোমাদের নিহতদের কিছু লাশ বিকৃত করা হয়েছে। বিশ্বাস করো, আমি তা করতে নির্দেশও দেইনি, নিষেধও করিনি। আবার এ কাজে আমি খুশীও নই, অসন্তুষ্টও নই।"

আবু সুফিয়ান রণাঙ্গন ত্যাগ করে যাওয়ার সময় "তোমাদের সাথে আগামী বছর বদর প্রান্তরে আবার দেখা হবে" বলে যুদ্ধের আগাম চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে জনৈক সাহাবী আবু সুফিয়ানকে জানিয়ে দিলেন যে, আগামী বছর তার মুকাবিলা করতে তাঁরাও প্রস্তুত রয়েছেন।

কুরাইশ বাহিনী ময়দান ত্যাগ করে রওনা হয়ে যাবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে (রা) এই বলে পাঠিয়ে দিলেন যে, "ওদের পেছনে পেছনে গিয়ে লক্ষ্য কর, ওরা কোথায় যায় এবং কি করে। তারা যদি অশ্বপালকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যায় এবং উটে আরোহণ করে তাহলে বুঝতে হবে, তারা মক্কা অভিমুখে চলেছে। আর যদি ঘোড়ায় আরোহণ করে ও উট টেনে নিয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে তারা মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। আল্লাহর শপথ, তারা মদীনা আক্রমণ করতে চাইলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়ে হাজির হবো

এবং প্রতিরোধ করবো।" আলী (রা) বলেন, "আমি তাদের অনুসরণ করলাম। দেখলাম, তারা অশ্বপাল দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং উটে চড়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেছে।"

এবার মুসলমানগণ নিহতদের সন্ধানে বেরুলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সা'দ বিন রাবীর সন্ধান নিয়ে দেখ, সে মৃত, না জীবিত।" এক আনসারী সাহাবা তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁকে নিহতদের মাঝে মারাত্মকভাবে আহত ও মুমূর্ষু অবস্থায় পেলেন। তাঁকে বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হুকুম দিয়েছেন তুমি বেঁচে আছ না মারা পড়েছো তা দেখতে।" সা'দ বললেন, "আমাকে মৃতই মনে কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার সালাম জানিয়ে বলো: হে আল্লাহর রাসূল, সা'দ ইবনে রাবী আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছে যে, একজন নবীকে তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে যতটা উত্তম পুরস্কার দেয়া সঙ্গত তাই যেন আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে আর মুসলমানদের নিকট আমার সালাম পৌঁছে দিয়ে বলো: সা'দ ইবনে রাবী বলেছে আপনাকে দেন।

যে, তোমাদের একটি লোকও জীবিত থাকতে তোমাদের নবীর কাজে যদি দুশমন পৌছতে পারে তাহলে আল্লাহর কাছে তোমরা কোন সাফাই দিতে পারবে না।" এ কথা বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই সা'দ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে সা'দের খবর জানালেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের (রা) সন্ধানে বের হলেন। তাঁকে প্রান্তরের মধ্যস্থলে পেলেন। দেখলেন, তার পেট চিরে কলিজা বের করা হয়েছে এবং নাক কান কেটে তাঁর লাশ বিকৃত করা হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সাফিয়া যদি দুঃখ না পেতো এবং একটা চিরস্থায়ী রীতির জন্ম হওয়ার আশংকা না থাকতো, তাহলে আমি হামযাকে এখানেই রেখে চলে যেতাম এবং তার লাশ পশু পক্ষিকে যেতে দিতাম। আল্লাহ যদি আর কোন রণাঙ্গনেও আমাকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করে তাহলে আমি তাদের ত্রিশ জনের লাশকে এভাবে বিকৃত ও ক্ষতবিক্ষত করবো।" মুসলমানরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিদারুণ মর্মাহত ও চাচার প্রতি পাশবিক আচরণে চরমভাবে বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত দেখলো, তখন তাঁরাও প্রতিজ্ঞা করলো যে, কোন সময় কুরাইশদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে তারা তাদের লাশ এমনভাবে বিকৃত করবে, যার কোন নজীর আরবের ইতিহাসে নেই।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের ঐ প্রতিজ্ঞা প্রসঙ্গেই আল্লাই এই আয়াত নাযিল করেন-

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ.

"তোমরা যদি কাউকে শাস্তি দাও তাহলে তাদের পক্ষ থেকে যেমন শাস্তি তোমরা পেয়েছিলে তার সমপরিমাণ শাস্তি দাও। আর যদি সহিষ্ণুতার পরিচয় দাও তাহলে (জেনে রেখো) ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম। তুমি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। তোমার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হওয়া চাই। তাদের আচরণে মর্মাহত হয়ো না এবং তাদের দুরভিসন্ধিতে মনকে সংকীর্ণ করো না।"

এ আয়াত দুইটির প্রভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের ক্ষমা করলেন এবং লাশ বিকৃত করা থেকে সবাইকে বিরত থাকতে বললেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযার লাশ একটি চাদরে আবৃত করলেন। তারপর জানাজার নামায আদায় করলেন। তারপর অন্যান্য লাশের পাশে এনে রাখা হলো এবং প্রত্যেকের জন্য তিনি জানাজা পড়লেন। এভাবে হামযার জন্য বাহাত্তর বার, জানাজা পড়লেন।
ইবনে ইসহাক বলেন, হামযাকে দেখতে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা সাফিয়া এলেন। হামযা ছিলেন তাঁর সহোদর ভাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়ার পুত্র যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে বললেন, "তুমি তোমার মার সাথে দেখা করে তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দাও যেন সে ভাইয়ের এ মর্মান্তিক অবস্থা দেখতে না পায়।" যুবাইর গিয়ে বললেন, "মা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ফিরে যেতে বলছেন।" সাফিয়া বললেন, "কন?" আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করার কথা আমি শুনেছি। ওটা আল্লাহর পথেই হয়েছে এবং তা আমার জন্য খুশীর ব্যাপার। ইনশাআল্লাহ আমি সবর করবো এবং সন্তুষ্ট থাকবো।" যুবাইর এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসব কথা জানালে তিনি বললেন, "আচ্ছা, তাহলে তাকে আসতে দাও।" সাফিয়া এলেন, হামযাকে দেখলেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়লেন ও তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তাঁর লাশ দাফন করা হলো।

মুসলমানদের অনেকে শহীদদের লাশ মদীনায় নিয়ে দাফন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং যেখানে নিহত হয়েছে সেখানেই দাফন করতে বলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শহীদদের লাশ দেখলেন তখন বললেন, "আমি এঁদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর পথে যে-ই আহত হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ যখন তাকে পুনর্জীবিত করবেন, তখন তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। সে রক্তের রং থাকবে রক্তেরই মত আর ঘ্রাণ হবে মৃগনাভির মত। তোমরা দেখ, এদের মধ্যে কে বেশী কুরআন আয়ত্ত করেছিল। অতঃপর সেরূপ ব্যক্তিকে অন্যান্যদের মুখোমুখি রেখে দাফন কর।" অতঃপর এক এক কবরে দুই থেকে তিনজনকে একসাথে দাফন করা হলো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা অভিমুখে রওনা হলেন। এই সময় হামনা বিনতে জাহাশ নাম্নী এক মহিলা তাঁর সাথে দেখা করলেন। তাঁকে প্রথমে তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের শাহাদাতের খবর দেয়া হলে তিনি ইন্না লিল্লাহ পড়লেন ও ইস্তিগফার করলেন। এরপর তাঁকে তাঁর মামা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর খবর দেয়া হলে তিনি পুনরায় ইন্না লিল্লাহ পড়লেন ও ইস্তিগফার করলেন। এরপর তাঁকে জানানো হলো যে, তাঁর স্বামী মুসয়াব ইবন উমাইর শহীদ হয়েছেন, তিনি চিৎকার করে উঠলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করলেন, “একজন মেয়ের স্বামী তাঁর কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।" মামা ও ভাইয়ের মৃত্যুর খবরে তাঁকে অবিচলিত এবং স্বামীর মৃত্যুর খবরে চিৎকার করতে দেখেই তিনি এ কথা বলেন।
এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আবদুল আশহাল ও জাফর পরিবারের আনসারি সাহাবীদের বাড়ীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন যুদ্ধে নিহত আপনজনদের বিয়োগে ব্যথিত ও শোক সন্তপ্ত পরিবারগুলোর মর্মভেদী কান্নার আওয়াজ শুনে তাঁর চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। এই সময় হামযার কথা মনে করে তিনিও কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "হামযার জন্য কোন ক্রন্দসী নেই।" পরে সা'দ ইবন মুয়ায ও উসাইদ ইবনে হুদায়ের বাড়ীতে ফিরলে তারা তাদের পরিবারের নারীদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার জন্য কাঁদতে ও বিলাপ করতে নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযার জন্য ঐসব মহিলার কান্না শুনতে পেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, মসজিদে বসে তারা কাঁদছে। তিনি তাদেরকে বললেন, "আল্লাহ তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। এখন তোমরা চলে যেতে পার। কেননা তোমরা আমাকে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছ।" বনু দিনারের আরেক মহিলা। তার স্বামী, ভাই ও পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। তাকে তার ঐসব আপনজনের নিহত হওয়ার খবর শোনানো হলে সে নির্বিকারভাবে বললো, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি অবস্থা?” সবাই বললো, "তিনি ভাল। তুমি যেমন পছন্দ কর, তিনি সে রকমই আছেন।" মহিলা বললো, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটু দেখাও। আমি তাকে দেখে নিই।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

দেখানো হলো। মহিলা দেখেই বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি নিরাপদে আছেন, এটা দেখার পর আমার কাছে অন্য যে কোন মুসিবত নিতান্তই তুচ্ছ।”

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ীতে পৌঁছে তরবারীখানা তাঁর কন্যা ফাতিমাকে দিয়ে বললেন, "প্রিয় বেটি, এটা ধুয়ে পরিষ্কার কর। আজ এটি বড় কাজে এসেছে।" আলী ইবনে আবু তালিবও তাঁর তরবারী ফাতিমাকে দিয়ে বললেন, "এ তরবারীখানা থেকেও রক্ত ধুয়ে দাও। আল্লাহর শপথ, এটি বড় কাজে এসেছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি যদি আজ যুদ্ধে সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক, তবে জেনে রাখো, সাহল ইবনে হানিফ এবং আবু দুজানাও তোমার সাথে জিহাদে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে।"

উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৫ই শাওয়াল শনিবার। পরদিন ১৬ই শাওয়াল রোববার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ঘোষণা করে দিলেন যে, শত্রুদের পিছু ধাওয়া করতে হবে। তবে গতকালের যুদ্ধে উপস্থিত থাকেনি এমন কেউ আজ যেতে পারবে না। বরং কাল যারা ছিল তারাই শুধু যেতে পারবে। এ কথা শুনে যাবির ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতা আমার সাত বোনকে পাহারা দেয়ার জন্য আমাকে বাড়ীতে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'এই মেয়েদের কাছে কোন পুরুষ থাকবে না এমনভাবে তাদের রেখে যাওয়া আমার বা তোমার কারো পক্ষেই সমীচীন হবে না। আর আমি বাড়ী বসে থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তোমার জিহাদে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তুমি তোমার বোনদের কাছে থেকে যাও।' তাই আমি তাদের কাছে থেকে গিয়েছিলাম।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর পিছু ধাওয়ার অভিযানে তাঁকেও তাঁর সাথে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল শুধু শত্রুকে ভয় দেখানো। তাদের পশ্চাদ্ধাবন যে মুসলমানদের শক্তির পরিচায়ক এবং উহুদ যুদ্ধের বিপর্যয় যে তাদের কিছুমাত্র হতোদ্যম করে দেয়নি, শত্রুকে তা বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই এ অভিযান চালানো হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানে বেরিয়ে মদীনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত হামরাউল আসাদ নামক স্থানে উপনীত হলেন। সেখানে সোম, মঙ্গল ও বুধবার পর্যন্ত অবস্থান করার পর মদীনায় ফিরে এলেন। এ সময় মদীনার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে।

মা'বাদ ইবনে আবি মা'বাদ আল খুযায়ী ছিলেন তখনো মুশরিক। তাঁর গোত্র খুযআর মুসলমান ও মুশরিক নির্বিশেষে প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতো এবং তিহামা অঞ্চলে তাঁর গোপনীয়তা সংরক্ষণ করতো। আর তিহামায় যা-

ই ঘটুক তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করতো। তাঁর কাছে কিছুই গোপন করতো না। মা'বাদের সাথে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা হলো। উহুদের ঘটনা সম্পর্কে সে বললো, "মুহাম্মাদ, উহুদে আপনার যে বিপর্যয় ঘটেছে তাতে আমরা ব্যথিত ও দুঃখিত। আমরা সবাই কামনা করছিলাম যে, আপনাকে যেন আল্লাহ নিরাপদ' রাখেন।" অতঃপর মা'বাদ চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামরাউল আসাদেই রইলেন। রাওহাতে গিয়ে মা'বাদের দেখা হলো আবু সুফিয়ান ও তার অনুচরদের সাথে। তারা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের ওপর পুনরায় হামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারা পরস্পর বলাবলি করছিল, "মুহাম্মাদের সহচরদের প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকদের অনেককে তো খতম করেছি, কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন না করে মক্কায় ফিরে যাচ্ছি। অবশিষ্টদের ওপর বরং আবার হামলা করবো এবং তাদেরকে শেষ করেই তবে ক্ষান্ত হবো।" এই সময় মা'বাদকে দেখে আবু সুফিয়ান বললো, "মা'বাদ, ওদিককার খবর কি?" মা'বাদ বললো, "দেখলাম মুহাম্মাদ তার সহচরদের নিয়ে এক বিপুল জনতার সমাবেশ ঘটিয়েছে এবং তাদের নিয়ে তোমাদের পিছু ধাওয়া করতে ছুটে আসছে। আমি এরূপ জনসমাবেশ আর কখনো দেখিনি। উহুদের যুদ্ধের দিন যারা যুদ্ধে আসেনি এবার তারাও মুহাম্মাদের সাথে যোগ দিয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে।
ইবনে ইসহাক বলেন, “উহুদ যুদ্ধ ছিল চরম পরীক্ষা ও মুসিবতের দিন। এটা দিয়ে আল্লাহ মু'মিনদের পরীক্ষা ও মুনাফিকদের ছাটাই বাছাই করেন। যারা মুখে ঈমানের দাবী করতো কিন্তু মনে মনে গোপনে কুফরী ধ্যান-ধারণা পোষণ করতো এই দিন তারা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। আর আল্লাহ তাঁর যেসব প্রিয় বান্দাকে শাহাদাতের সম্মানে ভূষিত করতে চেয়েছিলেন এ দিন তাদেরকে শাহাদাত দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।”

১)ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন বলে তাঁকে মরণোত্তর গাসিল উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

বীরে মাউনার ঘটনা

শাওয়াল মাসের অবশিষ্ট অংশ, যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররাম মাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় অবস্থান করলেন। এই বছরের হজ্জ মুশরিকরা বর্জন করেছিল। সফর মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীরে মাউনার অভিযাত্রীদের পাঠিয়েছিলেন। এ ঘটনা ঘটে উহুদ যুদ্ধের মাত্র চার মাস পর।

ঘটনার পটভূমি হলো, 'মুলায়িবুল আসিন্নাহ' (বর্শা খেলায় পারদর্শী) নামে খ্যাত আবু বারা আমের ইবনে মালিক ইবনে জা'ফর রাসূলুল্লাহর সাথে দেখা করতে মদীনায় আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সামনে ইসলাম পেশ করেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। সে ইসলাম গ্রহণও করলো না, ইসলামের বিরুদ্ধেও কিছু বললো না। সে বললো, "হে মুহাম্মাদ, আপনি যদি কিছুসংখ্যক সাহাবীকে নাজদবাসীর কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তারা তাদেরকে আপনার দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেন, আমার মনে হয়, তাহলে তারা আপনার দ্বীন গ্রহণ করবে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "নাজদবাসী তাদের ক্ষতি করতে পারে বলে আমার আশংকা হয়।" আবু বারা বললো, "আমি তাদের নিরাপত্তার জিম্মাদার। আপনি তাদেরকে পাঠিয়ে দিন। তারা জনগণকে আপনার দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিক।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মধ্য থেকে বাছা বাছা চল্লিশজন সুযোগ্য সাহাবীকে বনু সায়েদা গোত্রের বিশিষ্ট সাহাবী মুনযির ইবনে আমরের নেতৃত্বে পাঠিয়ে দিলেন। মুনযির 'মুয়াল্লিক লিয়ামুত'" (দ্রুত মৃত্যুকে আলিঙ্গনকারী) নামে অভিহিত হতেন। তাঁর সুযোগ্য সঙ্গী ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী হারেস ইবনে ছিম্মা, হারাম ইবনে মিলহান, উরওয়া ইবনে আসমা, নাফে ইবনে বুদাইল ইবনে ওয়ারকা ও আবু বাক্ সিদ্দীকের (রা) মুক্ত গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরা। তাঁরা রওয়ানা দিয়ে বীরে মাউনাতে গিয়ে অবস্থান করলেন। এই জলাশয়টি বনু আমেরের আবাসভূমি ও বন্ধু সুলাইমের প্রস্তরময় এলাকার মাঝখানে অবস্থিত। উভয় এলাকাই জলাশয়টির নিকটবর্তী হলেও বনু সুলাইমের এলাকা ছিল অধিকতর নিকটবর্তী।

ইসলামের কট্টর দুশমন আমের ইবনে তুফাইলের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি নিয়ে গেলেন হারাম ইবনে মিলহান (রা)। তিনি যখন তার কাছে উপস্থিত হলেন, তখন সে চিঠির দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে হারাম ইবনে মিলহানকে হত্যা করলো। তারপর বাদবাকী সাহাবীদেরকেও খতম করার জন্য সে বনু আমেরের সাহায্য চাইলো। কিন্তু বনু আমের তার অনুরোধ এই বলে প্রত্যাখ্যান করলো যে, "আমরা বনু বারার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে চাই না। আবু বারা তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে।" আমের অগত্যা সুলাইমের কয়েকটি উপগোত্রের সাহায্য চাইল। তারা সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হলো এবং তাদেরকে

চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেললো। সাহাবাগণ তাদেরকে দেখে তরবারী হাতে নিলেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হলেন। শুধু কা'ব ইবনে যায়িদ রক্ষা পেলেন। কাফিররা তাঁকে মৃত মনে করে ফেলে রেখে যায়। অথচ তিনি বেঁচে ছিলেন। অনেক রক্তপাতের দরুন দুর্বল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নিহতদের স্তূপের মধ্য থেকে প্রাণ নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে যান এবং পরে খন্দকের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

আক্রান্ত হবার সময় দু'জন সাহাবী আমর ইবনে উমাইয়া দামরী ও জনৈক আনসারী** সাহাবী কোন কারণে দল থেকে কিছুদূরে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা তাঁদের সঙ্গীদের বিপদের কথা জানতেন না। কিন্তু তাঁদের মাথার ওপর কতকগুলো পাখী উড়তে দেখে তাঁদের মনে সন্দেহ জাগে। তাঁরা ভাবলেন, পাখীগুলোর ওড়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। তাঁরা তাঁদের অবস্থা দেখবার জন্য এগিয়ে গেলেন। দেখলেন সবাই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আর তাঁদের ওপর আক্রমণকারী দলকেও উপস্থিত দেখলেন। আনসারী আমর ইবনে উমাইয়াকে বললেন, "এখন আমাদের কি করা উচিত বলে মনে করেন?" তিনি বললেন, "আমার ইচ্ছা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি এবং সমস্ত ব্যাপার তাঁকে জানাই।" আনসারী বললেন, "যে রণক্ষেত্রে মুনযির ইবনে আমর শহীদ হয়েছেন সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে আমি পালাতে চাই না। আমি নিজে কখনো লোকমুখে হত্যাকাণ্ডের খবর শোনার অপেক্ষায় বসে থাকতাম না।" অতঃপর তিনি লড়াই করে শহীদ হলেন।

আমর ইবনে উমাইয়াকে কাফিররা আটক ও বন্দী করলো। তিনি মুদার গোত্রের লোক একথা শুনে আমের ইবনে তুফাইল তাঁর কপালের চুল কেটে নিল এবং তাঁর মায়ের একটা দাস মুক্ত করার মানত ছিল মনে করে তাঁকে সেই বাবদে মুক্তি দিল। এরপর আমর ইবনে উমাইয়া মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। মদীনার অনতিদূরে অবস্থিত কারকারাতে পৌঁছলে বনু আমেরের দুই ব্যক্তি এসে তাঁর সাথে একই ছায়ায় বিশ্রাম নিতে লাগলো। বনু আমেরের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা নিরাপত্তা ও অনাক্রমণ চুক্তি যে ছিল, সেকথা আমর জানতেন না। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, তারা বনু আমের গোত্রের লোক। তিনি একটু অপেক্ষা করলেন। যেই তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হলো অমনি উভয়ের ওপর হামলা চালিয়ে হত্যা করলেন। তাঁর ধারণা ছিল, বনু আমের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে এবং সে কারণে বনু আমের থেকে প্রতিশোধ নেয়া উচিত।

রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট উপনীত হয়ে আমর ইবনে উমাইয়া সমস্ত ঘটনা জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি যে দু'জনকে হত্যা করেছো, তাদের জন্য আমাকে রক্তপণ (দিয়াত) দিতে হবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ ঘটনা আবু বারাই ঘটালো। আমি এটা অপছন্দ করেছিলাম এবং শংকিত ছিলাম।" আবু বারা ঘটনা জানতে পেরে খুবই দুঃখিত হলেন। আমের ইবনে তুফাইল তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়ে দেয়ায় এবং তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ওপর বিপদ নেমে আসায় আবু বারা ক্ষোভ প্রকাশ করে। নিহতদের মধ্যে আমের ইবনে ফুহাইরাও ছিলেন। হিশাম ইবনে উরওয়াহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমের ইবনে তুফাইল বলতো, "ঐ দলের ভেতরে একটি লোক ছিল যাকে হত্যা করার অব্যবহিত পর তাঁকে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে দেখলাম। অবশেষে দেখলাম সে যেন আকাশে উঠে উধাও হয়ে গেছে। কে সেই লোকটি?" লোকেরা বললো, "সে আমের ইবনে ফুহাইরা।"

দ্বিতীয় বদর অভিযান (৪র্থ হিজরী সন)

আবু সুফিয়ানের চ্যালেঞ্জের সময় ঘনিয়ে আসায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে আবার বদর অভিযানে বেরুলেন এবং সেখানে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে তিনি আবু সুফিয়ানের অপেক্ষায় আটটি রজনী অতিবাহিত করলেন। ওদিকে আবু সুফিয়ান মক্কাবাসীকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হয়ে মাজনা গিয়ে যাত্রাবিরতি করলো। সে যাহরান হয়ে এখানে উপনীত হয়। তারপর মক্কায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

সে বললো, "হে কুরাইশগণ, তোমাদের জন্য যুদ্ধ করা কবেল ভালো ফসল ফলার বছরেই শোভা পায়, যখন তোমরা তোমাদের গাছপালার তত্ত্বাবধান করতে পারবে এবং দুধ পান করতে পারবে। কিন্তু এটা তো অজন্মার বছর। আমি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরাও ফিরে চলো।" তার কথায় লোকেরা ফিরে গেল। মক্কাবাসী তাদেরকে 'ছাতুখোর বাহিনী' নামে অভিহিত করে। তারা বলতো, "তোমরা তো শুধু ছাতু খেতে খেতে লড়াইয়ে গিয়েছিল।"

ওদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষায় বদরের প্রান্তরে বসে প্রহর গুনতে লাগলেন। এই সময় মাখশা ইবনে আমর দামরী তাঁর কাছে এলো। ওয়াদ্দান অভিযানে এই ব্যক্তিই বনু দামরা গোত্রের পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সন্ধি করেছিলো। সে বললো, "হে মুহাম্মাদ, আপনি কুরাইশদের মুকাবিলা করতে এই জলাশয়ের পাশে এসেছেন?" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "সত্যিই তাই হে বনু দামরার ভাই! এ অবস্থা দেখেও তুমি যদি চাও তবে তোমাদের সাথে আমাদের যে সন্ধি রয়েছে তা প্রত্যাহার করে যুদ্ধ করতে আমরা প্রস্তুত। যুদ্ধের মাধ্যমেই আল্লাহ তোমাদের ও

আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত করে দিন তা চাইলে তাতে আমাদের অমত নেই।" সে বললো, "না, হে মুহাম্মদ, আল্লাহর শপথ, আমাদের তাতে কোন প্রয়োজন নেই। "শুনিরে চাপায়ীদের

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই সময় মা'বাদ ইবনে আবু মা'বাদ আল খুযায়ী তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপস্থিত দেখতে পেয়ে নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে দ্রুত উট হাঁকিয়ে চলে গেল।

"(আমার উট) মুহাম্মাদের ও মদীনার কালো কিসমিস সদৃশ খেজুরের সান্নিধ্যের প্রতি বিতৃষ্ণ। সে ছুটে চলেছে তার বাপের পুরানো রসম রেওয়াজের প্রতি অনুগত হয়ে। কুদাইদের জলাশয়ে আজকে এবং দাজনাদের জলাশয়ে কালকে বিকালের মধ্যে তাকে পৌছে যেতেই হবে।"*

আর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আবু সুফিয়ানের অনুপস্থিতিকে লক্ষ্য করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন,

"আবু সুফিয়ানের সাথে বদর প্রান্তরে মুখোমুখি হবার জন্য আমরা ওয়াদাবদ্ধ ছিলাম। কিন্তু তার ওয়াদার সত্যতা পেলাম না এবং সে ওয়াদা রক্ষাকারী নয়। কসম করে বলছি, তুমি যদি ওয়াদা রক্ষা করতে (হে আবু সুফিয়ান) ও আমাদের মুখোমুখি হতে তাহলে ধিকৃত ও তিরস্কৃত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হতে এবং মিত্রদেরকেও হাতছাড়া করে ফেলতে। এই বদর প্রান্তরেই আমরা উতবা ও তার ছেলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফেলে গিয়েছি। আবু জাহলের লাশও এখানে রেখে গিয়েছি। তোমরা আল্লাহর রাসূলকে অমান্য করলে! তোমাদের ধর্মমত এবং তোমাদের কুৎসিত ও বিভ্রান্তিকর কর্মকাণ্ডকে ধিক! তোমরা আমাকে যতই ভর্ৎসনা করো, তবুও বলবো, রাসূলুল্লাহর জন্য আমার ধন-জন সবই কুরবানকৃত। আমরা তাঁর অনুগত। তাঁকে ছাড়া কাউকে কোন অঙ্গীকার দিই না। তিনি আমাদের জন্য অন্ধকার রাতের দিশারী ধ্রুব নক্ষত্র।"

খন্দক যুদ্ধ (৫ম হিজরী শাওয়াল মাস)

পঞ্চম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের পটভূমি হলো বনু নাযীর ও বনু ওয়াইলের ইহুদীদের একটি সম্মিলিত প্রতিনিধি দল মক্কা গিয়ে কুরাইশদেরকে মদীনার ওপর হামলা চালিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার আহ্বান জানায় এবং এ কাজে তাদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। এই দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লোক ছিল বনু নাবীর গোত্রের সালাম ইবনে আবুল হুকাইক, হুয়াই ইবনে আখতাব, কিনানা ইবনে আবুল হুকাইক এবং ওয়াইল গোত্রের হাওযা ইবনে কায়েস ও আবু আম্মার। তারা আরবের বহু সংখ্যক গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে প্ররোচিত করে। কুরাইশরা তাদেরকে বললো, "ইহুদীগণ, তোমরা প্রথম কিতাবের অধিকারী। আমাদের সাথে মুহাম্মাদের যে বিষয় নিয়ে মতভেদ, তা তোমরা ভাল করেই জানো। তোমরাই বলো আমাদের ধর্ম ভাল না মুহাম্মাদের ধর্মী ভাল?" তারা বললো, "তোমাদের ধর্ম মুহাম্মাদের ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তোমরা সত্যের নিশানবাহী!"

তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসার এই আয়াতগুলো নাযিল করেন,

"তুমি কি সেই কিতাবধারীদের দেখোনি যারা মূর্তি ও খোদাদ্রোহী শক্তিকে মানে এবা কাফিরদেরকে মু'মিনদের চেয়ে বেশী সুপথপ্রাপ্ত বলে অভিহিত করে! তারাই আল্লাহ অভিশাপগ্রস্ত। আর যারা আল্লাহর অভিশপ্ত তাদের কোন সাহায্যকারী কখনো মিলে না। তাদের কি আল্লাহর রাজত্বে কোন অংশ আছে যে তারা মানুষকে তা থেে কণামাত্রও দেবে না। নাকি তারা মানুষকে আল্লাহ যে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন অর্থা নবুওয়াত তার ব্যাপারে হিংসা করে? আমি ইবরাহীমের বংশধরকে তো কিতাব তত্ত্বজ্ঞান দান করেছি এবং তাদেরকে বিরাট রাজত্ব দিয়েছি। তাদের কেউ কেউ ভা ওপর ঈমান এনেছে আবার কেউ কেউ তা গ্রহণ করতে মানুষকে বাধা দিয়েছে। তালে জ্বালানোর জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।"
ইহুদীরা যখন কুরাইশদের সম্পর্কে এরূপ কথা বললো তখন তাদের আনন্দ যেন আর ধরে না। অধিকন্তু তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর হামলা চালানোর আমন্ত্রণ জানালো তখন তারা তাতে একমত হলো এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো।

পরে ঐসব ইহুদী গাতফান গোত্রের কাছে গেল এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধ করার আমন্ত্রণ জানালো। তাদের সাথে নিজেদের অংশ নেয়ার আশ্বাস তারা দিল। তাদেরকে জানালো যে, কুরাইশরাও তাদের সাথে একমত হয়ে আক্রমণ চালাতে প্রস্তুত হয়েছে।

যথাসময়ে কুরাইশ বাহিনী ও তাদের দলপতি আবু সুফিয়ান যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়লো। গাতফানও বেরুলো বনু ফাজারা ও তার দলপতি উয়াইনা ইবনে হিসনকে সাথে নিয়ে। আর বনু মুররাকে সাথে নিয়ে হারেস ইবনে আওফ ইবনে আবু হারেসা ও আসজা গোত্রকে সাথে নিয়ে তার দলপতি মিসআর ইবনে রুযাইলা রওনা হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধপ্রস্তুতির কথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ মদীনার চারপাশে খন্দক বা পরিখা খনন করালেন। মুসলমানরা যাতে সওয়াবের আশায় এই কাজে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয় সে জন্য তিনি নিজ হাতে পরিখা খননের কাজ করেন। তাঁর সাথে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে খননের কাজে যোগ দেয়। তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ অবিশ্রান্তভাবে এই কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। কেবল কিছুসংখ্যক মুনাফিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের থেকে দূরে থাকে। তারা নানা রকমের ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে কাজে ফাঁকি দিতে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অজ্ঞাতসারে ও বিনা অনুমতিতে চুপিসারে বাড়ী চলে যেতে থাকে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে কারো যদি মারাত্মক অসুবিধাও দেখা দিত এবং অনিবার্য প্রয়োজনে নিজ পরিবার পরিজনের কাছে যাওয়ার দরকার পড়তো তা হলেও সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যথারীতি জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যেতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথেই তারা এসে অবশিষ্ট কাজে শরীক হতো। এভাবে তারা পুণ্যকর্মে আগ্রহ ও আন্তরিকতার প্রমাণ দিতো। আল্লাহ তায়ালা এসব মু'মিনের প্রসঙ্গে সূরা নূরের এ আয়াত ক'টি নাযিল করেন:

"মু'মিন তারাই- যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত থাকলেও তাঁর অনুমতি না নিয়ে কোথাও যায় না। যারা তোমার কাছে অনুমতি চায় তারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে। হে নবী, তারা (মু'মিনরা) তোমার কাছে তাদের কোন ব্যাপারে অনুমতি চাইলে তুমি তাদেরকে ইচ্ছা হলে অনুমতি দিও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল।"

মুসলমানদের মধ্যে যারা নিষ্ঠাবান, সৎকর্মের প্রতি আগ্রহী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত, তাদেরকে লক্ষ্য করেই এই আয়াত কয়টি নাযিল হয়।

যেসব মুনাফিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি না নিয়েই চুপে চুপে চলে যেতো তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরো বলেন-

"তোমাদের প্রতি রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরকে আহ্বান করার মত মনে করো না। আল্লাহ তোমাদের এইসব লোককে ভালভাবেই জানেন যারা আড়ালে আবডালে চুপে চুপে সরে পড়ে। রাসূলের হুকুম অমান্যকারীদের এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত যে, তাদের ওপর যে কোন মুহূর্তে মুসিবত কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হতে পারে। মনে রেখো, আসমান ও যমীনের সবকিছুই আল্লাহর। তোমরা কে সত্যের অনুসারী আর কে মিথ্যার অনুসারী তা তিনি ভালভাবেই অবহিত। আর যেদিন তাঁর কাছে তারা ফিরে যাবে সেদিন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।" (সূরা নূর আয়াত-৬৪)

এই আয়াত ক'টিতে রাসূলের অনুমতি না নিয়ে তাঁর নির্দেশিত কাজ থেকে গোপনে সরে পড়া মুনাফিকদের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিখা খনন সম্পন্ন করতেই কুরাইশরা কিনানা গোত্র, তিহামার অধিবাসী ও তাদের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন মিলিয়ে সর্বমোট দশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে এসে পৌছলো। তারা রুমা নামক স্থানে জুরুফ ও জুগাবার মধ্যবর্তী মুজতামাউল আসইয়ালে শিবির স্থাপন করলো। গাতফান গোত্রের লোকেরাও তাদের নাজদবাসী মিত্রদের নিয়ে হাজির হলো। তারা উহুদের পার্শ্ববর্তী 'জাম্ব নাকমা' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলো। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে 'সালা' নামক পাহাড়কে পেছনে রেখে মুসলিম বাহিনীকে মোতায়েন করলেন। তাঁর ও শত্রুদের মাঝে থাকলো পরিখা। শিশু ও নারীদেরকে তিনি আগে ভাগেই দুর্গের মধ্যে রেখে আসার ব্যবস্থা করেন।

আল্লাহর দুশমন বনু নাযীর গোত্রের হুয়াই ইবনে আখতাব বনু কুরাইযার কা'ব ইবনে আসাদের কাছে গেল। বনু কুরাইযার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপোষ ও অনাগ্রাসন চুক্তির সংগঠক ছিল এই কা'ব ইবনে আসাদ। সে বনু কুরাইযার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শান্তির অঙ্গীকার দেয় ও চুক্তি সম্পাদন করে। কা'ব ভেতরে বসেই হুয়াইয়ের আগন টের পেয়ে তার মুখের ওপর দুর্গের দরজা বন্ধ করে দেয়। হুয়াই দরজা খুলতে বললে সে দরজা খুলতে অস্বীকার করে। হুয়াই পুনরায় দরজা খুলতে অনুরোধ করলে কা'ব বললো, "ধিক্ তোমাকে হুয়াই, তুমি একটা অলক্ষুণে লোক। আমি মুহাম্মাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং সে চুক্তি আমি ভঙ্গ করবো না। আমি মুহাম্মাদের আচরণে প্রতিশ্রুতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিচয়ই পেয়েছি।"
হুয়াই বললো, "কি হলো! দরজাটা একটু খোল না। আমি তোমার সাথে কিছু আলাপ করবো।" কা'ব বললো, "আমি দরজা খুলতে পারবো না।" হুয়াই বললো, "তোমার খাদ্য গ্রহণ করবো মনে করেই তুমি দরজা বন্ধ করেছো।" এ কথায় কা'ব অপ্রস্তুত হয়ে গেল এবং দরজা খুলে দিল। অতঃপর সে বললো, "আমি তোমার জন্য এ যুগের শ্রেষ্ঠ গৌরব এবং উত্তাল তরঙ্গময়

সমুদ্র এনে হাজির করেছি। নেতা ও সরদারসহ সমস্ত কুরাইশ বাহিনীকে আমি জড়ো করেছি এবং তাদেরকে রুমা অঞ্চলের মুজতামাউল আসইয়ালে এনে হাজির করেছি। অপরদিকে গোটা গাতফান গোত্রকেও তাদের নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ উহুদের পার্শ্ববর্তী 'জাম্ব নাকক্কা'য় এনে দাঁড় করিয়েছি। তারা সবাই আমার সাথে এ মর্মে অঙ্গীকার ও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে নিশ্চিহ্ন না করে ক্ষান্ত হবে না।" কা'ব বললো, "তুমি বরং আমার মুখে চুনকালি মাখানোর আয়োজনই করেছো। তুমি এমন মেঘমালা সমবেত করছো যা বৃষ্টি বর্ষণ করে পানিশূন্য হয়েছে। এখন তার শুধু তর্জন গর্জন সার। তার দেয়ার মত কিছুই নেই। অতএব, হে হুয়াই, ধিক্ তোমাকে! আমাকে উত্যক্ত করো না। যেমন আছি থাকতে দাও। মুহাম্মাদ আমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করেনি। সে শুধু সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও প্রতিশ্রুতিপরায়ণতারই পরিচয় দিয়েছে।" তথাপি হুয়াই নাছোড়বান্দা হয়ে কা'বের সাথে লেগে রইলো। সে তার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে নাড়তে থাকলো এবং অবশেষে বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে রাজি করাতে সক্ষম হলো। সে তার নিকট থেকে অঙ্গীকার আদায় করতে সক্ষম হলো। সে বললো যে, কুরাইশ ও গাতফান যদি মুহাম্মাদকে হত্যা না করেই ফিরে যায় তাহলে সে কা'বের সাথে তার দুর্গে অবস্থান করবে এবং উভয়ে পরস্পরের সুখ দুঃখের সম অংশীদার হবে। এভাবে কা'ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি আওস গোত্রের তৎকালীন নেতা সা'দ ইবনে মুয়ায ইবনে নু'মান (রা), খাযরাজের নেতা সা'দ ইবনে উবাদা ইবনে দুলাইম (রা), আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ও খাওয়াত ইবনে যুবাইরকে (রা) পাঠালেন। তাদেরকে বলে দিলেন, "তোমরা গিয়ে দেখো, যে খবরটা পেয়েছি তা সত্য কিনা। যদি সত্য হয় তাহলে ফিরে এসে সংকেতমূলক ধ্বনি দিয়ে আমাকে জানাবে। প্রকাশ্যে বলে সাধারণ মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দিওনা। আর যদি তারা চুক্তির অনুগত থাকে তাহলে ফিরে এসে সে কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করবে।"

তারা গিয়ে দেখলেন কা'ব ও হুয়াই এবং তাদের সাঙ্গ পাঙ্গরা যে রকম জানা গিয়েছিলো তার চেয়েও জঘন্য মনোভাব পোষণ করছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে। তারা বললো, “রাসূলুল্লাহ আবার কে? মুহাম্মাদের সাথে কোন চুক্তি বা অঙ্গীকার নেই।” একথা শুনে সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) তাদের তিরস্কার করলেন।
জবাবে তারাও তাকে পাল্টা তিরস্কার করলো। বস্তুতঃ সা'দ ইবনে মু'য়াগ একটু চড়া মেজাজের লোক ছিলেন। সা'দ ইবনে উবাদা তাকে বললেন, "তিরস্কার বাদ দিন। আমাদের ও তাদের মধ্যে যে চুক্তি রয়েছে, তা তিরস্কারের চেয়ে অনেক বেশী।

এরপর উভয় নেতা ও তাদের সঙ্গীদ্বয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে তাঁকে সালাম জানিয়ে বললেন, "আজাল ও কারা।" অর্থাৎ আজাল ও কারার লোকেরা সাহাবী খুবাইব ও তাঁর সঙ্গীদের (রা) প্রতি রাজী'তে যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো, এরাও সেই পথ ধরেছে। তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহু আকবার। হে মুসলমানগণ! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো।"

এই সময় মুসলমানদের ওপর আপতিত দুর্যোগ ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো। তাদের মধ্যে ভীতি প্রবল হয়ে উঠলো। চারদিক থেকে চিন্তা-ভাবনা ঘুরপাক খেতে থাকলো। মুসলিম দলভুক্ত মুনাফিকদের মুনাফেকীও প্রকাশ পেতে আরম্ভ করলো। মুআত্তিব ইবনে কুশাইর তো বলেই ফেললো, "মুহাম্মাদ আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, আমরা পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের যাবতীয় ধন-দৌলতের মালিক হয়ে যাবো। অথচ আজ অবস্থা এই যে, আমরা নিরাপদে পায়খানায় যেতেও পারছিনা।" আওস ইবনে কায়যী বললো, "হে আল্লাহ রাসূল, আমাদের বাড়ী-ঘর তথা পরিবার-পরিজন অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। (অর্থাৎ তাদেরই গোত্রের কিছুসংখ্যক লোকের পক্ষ থেকে হুমকি এসছে।) অতএব আমাদেরকে বাড়ীতে ফিরে যেতে দিন। কেননা আমাদের বাড়ী-ঘর মদীনার বাইরে অবস্থিত।" এরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুশরিকরা বিশ দিনের বেশী এবং একমাসের কম সময় পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান করলেন। দুইপক্ষের মধ্যে তীর নিক্ষেপ ও অবরোধ ছাড়া আর কোন রকম যুদ্ধ হয়নি।

মুসলমানদের (অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ার দরুন) দুঃখ-কষ্ট অসহনীয় হয়ে উঠলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাতফান গোত্রের দুইজন নেতা উয়াইনা ইবনে হিসন ও হারেস ইবনে আওফের কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠালেন যে, তারা যদি তাদের লোকজন নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের (রা) বিরুদ্ধে এই অবরোধ ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে তিনি তাদেরকে মদীনার পুরা উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ দেবেন। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও গাতফানীদের মধ্যে সন্ধি হলো এবং সন্ধির দলিল লেখা হলো। কেবল স্বাক্ষর দান ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণের কাজ বাকী রইলো। তবে লেনদেনের ব্যাপারে উভয় পক্ষের দরকষাকষি ও সম্মতি দানের কাজটা চূড়ান্ত করা হলো। অবশিষ্ট কাজটুকু করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে মু'য়ায ও সা'দ ইবনে উবাদাকে (রা) ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি তাদেরকে বিষয়টা অবহিত করলেন এবং পরামর্শ চাইলেন। উভয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা কি আমাদের কল্যাণার্থে আপনার নিজের প্রস্তাব, না আল্লাহ আপনাকে এজন্য নির্দেশ দিয়েছেন যা আমাদের করতেই হবে?" তিনি বললেন, "এটা আমার নিজেরই উদ্যোগ। কারণ আমি দেখছি গোটা আরব

ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের ওপর সর্বাত্মক হামলা চালিয়েছে এবং সবদিক দিয়ে তোমাদের ওপর দুর্লংঘ্য অবরোধ আরোপ করেছে। তাই যতটা পারা যায় আমি তাদের শক্তি চূর্ণ করতে চাচ্ছি।"

সা'দ ইবনে মুয়ায বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইতিপূর্বে আমরা এবং এসব লোক শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলাম। তখন আমরা আল্লাহকে চিনতাম না এবং আল্লাহর ইবাদাতও করতাম না। সে সময় তারা মেহমানদারীর অথবা বিক্রয়ের সূত্রে ছাড়া আমাদের একটা খোরমাও খেতে পারেনি। আর আজ আল্লাহ যখন আমাদেরকে ইসলামের গৌরব ও সম্মানে ভূষিত করেছেন, সত্যের পথে চালিত করেছেন, তখন তাদেরকে আমাদের ধন-সম্পদ দিতে হবে? আল্লাহর কসম, আমাদের এ সবের কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম, তরবারীর আঘাত ছাড়া তাদেরকে আমরা আর কিছুই দেবো না। এভাবেই আল্লাহ তাদের ও আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত করে দেবেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বেশ, তাহলে এ ব্যাপারে তোমার মতই মেনে নিলাম।" এরপর সা'দ ইবনে মুয়ায চুক্তিপত্র খানা হাতে নিয়ে সমস্ত লেখা মুছে ফেললেন। এরপর তিনি বললেন, "ওরা যা পারে করুক!"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ শত্রুর অবরোধের ভেতরে অবস্থান করতে লাগলেন। কোন যুদ্ধই হলো না। অবশ্য আমর ইবনে আবদে উদ, ইকরিমা ইবনে আবু জাহল, হুবাইরা ইবনে আবু ওয়াহাব ও দিরার ইবনে খাত্তাব প্রমুখ কতিপয় কুরাইশ অশ্বরোহী যুদ্ধ শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছিলো। তারা ঘোড়ায় চড়ে বনু কিনানার কাছে এসে বললো, "হে বনু কিনানা, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আজ দেখবে যুদ্ধে কারা বেশী পারদর্শী।" অতঃপর তারা দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল এবং পরিখার কিনারে গিয়ে থামলো। পরিখা দেখে তারা হতবাক হয়ে বললো, "আল্লাহর কসম, এটা এমন একটা যুদ্ধ কৌশল আরবরা কখনো উদ্ভাবন করতে পারেনি। "

অতঃপর পরিখার সবচেয়ে কম প্রশস্ত জায়গা দেখে তারা পরিখা পার হলো। ঘোড়ায় চড়ে তারা সালা পর্যন্ত ও পরিখার মধ্যবর্তী মুসলমানদের অবস্থানে যেয়ে হাজির হয়। আলী (রা) কতিপয় মুসলমানকে সাথে নিয়ে মুকাবিলার জন্য এগিয়ে যান এবং যে উন্মুক্ত স্থানটি দিয়ে কাফিররা ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিল সেখানেই তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ান। অশ্বারোহীরা তাদের দিকে ছুটে আসতে থাকে।

'আমর ইবনে আবৃন্দে উদ বদর যুদ্ধে আহত হয়ে এতটা অচল হয়ে গিয়েছিল যে, উহুদ যুদ্ধে হাজির হতে পারেনি। সে নিজের মর্যাদা জাহির করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ প্রতীক দ্বারা নিজেকে চিহ্নিত করে এসেছিল। সে এসেই হুংকার দিল, “কে লড়াই করবে আমার সাথে?" আলী (রা) তার সামনে এগিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, "হে আমর, তুমি আল্লাহর কাছে

অঙ্গীকার করেছিলে যে, কুরাইশদের কোন লোক তোমাকে যে কোন দুইটি কাজের একটির দিকে দাওয়াত দেবে, তুমি তা গ্রহণ করবে। সত্য কিনা?" সে বললো, 'হ্যাঁ।' আলী (রা) বললেন, "তাহলে আমি তোমাকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি।"

সে বললো, 'এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।' আলী বললেন, "তাহলে আমি তোমাকে যুদ্ধের দাওয়াত দিচ্ছি।" সে বললো, "তা কেন ভাতিজা, আমি তো তোমাকে হত্যা করতে চাই না।" আলী (রা) বললেন, "কিন্তু আমি তো তোমাকে হত্যা করতে চাই।" একথা শুনে আমর উত্তেজিত হলো। সে ঘোড়ার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রথমে ঘোড়াকে হত্যা করলো এবং তার মুখে আঘাত করলো। অতঃপর আলীর (রা) দিকে এগিয়ে এলো। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হলো। অবশেষে আলী (রা) তাকে হত্যা করলেন।

এরপর তার ঘোড়সওয়ার দলটি পরাজিত হয়ে পরিখা পেরিয়ে পালিয়ে গেল। আমর নিহত হওয়ায় হতাশ হয়ে আবু জাহল তনয় ইকরিমা তার বর্শা ফেলে দিয়ে পালালো। তা দেখে মুসলিম কবি হাসান ইবনে সাবিত বললেন:

"সে পালিয়ে গেল এবং আমাদের জন্য তার বর্শা ফেলে রেখে গেল।

হে ইকরিমা, তুমি এমন ভান করেছো যেন (যুদ্ধ) করোনি।

তুমি নর উটপাখির মত ঊর্ধশ্বাসে পালিয়েছো।

ভাবখানা এই যে, তুমি যেন রাস্তা থেকেই আলাদা হয়েছো

তুমি আপোষের মনোভাব নিয়ে একটুও পেছনে ফেরনি।

(তোমার পালানো দেখে) তোমার পিঠ হায়েনার পিঠ বলে মনে হচ্ছিলো।"

খন্দক ও বনু কুরাইযার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের সংকেতধ্বনি ছিল "হুম, লা-ইউনছারুন।" অর্থাৎ শত্রুপক্ষের পরাজয় অবধারিত শত্রুদের শক্তি ও পরাক্রম এবং অতিমাত্রায় সংখ্যাধিক্যের চাপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণকে প্রচণ্ড ভয় ও ত্রাসের মধ্যে রণাঙ্গনে টিকে থাকতে হয়েছিলো।

অবশেষে নাঈম ইবনে মাস'উদ নামক গাতফান গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তবে আমার গোত্র এ কথা জানে না। এখন আপনি আমাকে প্রয়োজনীয় ে কোন নির্দেশ দিন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমাদের মধ্যে তুমিই একমা ব্যক্তি যে শত্রুপক্ষের বিশ্বাসভাজন। তুমি যদি পার, আমাদের পক্ষ হয়ে শত্রুদে পর্যুদস্ত করো। যুদ্ধ তো কৌশলেরই নামান্তর।"
নাঈম ইবনে মাস'উদ বনু কুরাইযা গোত্রের কাছে গেলেন। জাহিলী যুগে তিনি তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, "হে বনু কুরাইযা, আমি তোমাদের কত ভালবাসি তা নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে। বিশেষ করে তোমাদের সাথে আমার যে নিখাদ সম্পর্ক রয়েছে, তা তোমাদের অজানা নয়।" তারা বললো, "হাঁ, এ কথা সত্য। তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কখনো কোন অভিযোগ ছিল না।" তখন তিনি বললেন, "কুরাইশ ও গাতফানের অবস্থা তোমাদের থেকে স্বতন্ত্র। এ শহর তোমাদেরই শহর। এখানে তোমাদের স্ত্রী, সন্তান ও ধন-সম্পদ রয়েছে। এগুলো অন্যত্র সরিয়ে নেয়া তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কুরাইশ ও গাতফান মুহাম্মাদ ও তাঁর সাহাবীদের সাথে লড়তে এসেছে। তোমরা তাদের সাহায্য সহযোগিতা করছো। অথচ তাদের আবাসভূমি, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন অন্যত্র রয়েছে। সুতরাং তারা তোমাদের মত অবস্থায় নেই। তারা যদি এখানে স্বার্থ দেখতে পায় তাহলে তারা তা নেবেই। আর যদি না পায় তবে নিজেদের আবাসভূমিতে চলে যাবে। তখন তোমরা এই শহরে একাকী মুহাম্মাদের সম্মুখীন হবে। সে অবস্থায় তার বিরুদ্ধে তোমরা টিকতে পারবে না। অতএব মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে হলে আগে কুরাইশদের মধ্য হতে কতিপয় নেতাকে জিম্মী হিসেবে হাতে নাও। তারা তোমাদের হাতে জামানত হিসেবে থাকবে। তখন তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারবে। তাদেরকে সাথে নিয়ে তোমরা মুহাম্মাদের সাথে লড়াই করে তাকে পরাজিত করতে পারবে। এ ব্যবস্থা না করে মুসলমানদের সাথে লড়াই করা তোমাদের ঠিক হবে না।" তারা বললো, "তুমি ঠিক পরামর্শ দিয়েছো।"

এরপর তিনি কুরাইশদের কাছে গিয়ে আবু সুফিয়ান ও তার সহযোগী কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, আমি তোমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এবং মুহাম্মাদের ঘোর বিরোধী। আমি একটা খবর শুনেছি। সেটা তোমাদেরকে জানানো আমার কর্তব্য ও তোমাদের হিত কামনার দাবী। কথাটা তোমরা কারো কাছে প্রকাশ করো না।" তারা বললো, "ঠিক আছে, আমরা তা কারো কাছে প্রকাশ করবো না।"

নাঈম বললেন, "তাহলে শোনো। ইহুদীরা মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের সাথে তাদের সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে অনুতপ্ত হয়েছে। তারা মুহাম্মাদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে যে, 'আমরা যা করেছি তার জন্য অনুতপ্ত। এখন আমরা যদি কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের নেতৃস্থানীয় কিছু লোককে পাকড়াও করে তোমার কাছে হস্তান্তর করি আর তুমি তাদের হত্যা করো তাহলে কি তুমি আমাদের প্রতি খুশী হবে? এরপর আমরা তোমার সাথে মিলিত হয়ে কুরাইশ ও গাতফানের অবশিষ্ট সবাইকে খতম করবো।' একথায় মুহাম্মাদ রাজী হয়েছে।" নাঈম আবু সুফিয়ানকে আরো বললেন, "ইহুদীরা যদি তোমাদের কতিপয় লোককে জিম্মী রাখতে চায় তা হলে খবরদার একটি লোকও তাদের হাতে সমর্পণ করো না।"
এরপর নাঈম গাতফানীদের কাছে গিয়ে বললেন, "হে বসু গাতফান, তোমরাই আমার স্বগোত্র ও আপনজন। তোমরা আমার কাছে সবার চাইতে প্রিয়। মনে হয়, আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিযোগ নেই।" তারা বললো, "তুমি সত্য বলেছো।

তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই।" নাঈম বললেন, "তাহলে আমি যে খবর দিচ্ছি তা কাউকে জানতে দিওনা।" তারা বললো, "ঠিক আছে। তোমার কথার গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।" নাঈম তখন তাদেরকে অবকিল কুরাইশদের কাছে যা বলেছেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন এবং জিম্মীর প্রশ্নে কুরাইশদের কাছে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন গাতফানীদের কাছেও তাই উচ্চারণ করলেন।

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসের শনিবারের পূর্বরাত্রের ঘটনা। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রাসূলের সপক্ষে গোটা পরিস্থিতির মোড় পরিবর্তন করে দিলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ও গাতফান গোত্রের নেতৃবৃন্দ ইকরিমা ইবনে আবু জাহলের নেতৃত্বে কুরাইশ ও গাতফানীদের একটি দল পাঠালো বনু কুরাইযার কাছে। তারা গিয়ে বনু কুরাইযাকে বললো, "আমরা আর তিষ্ঠাতে পারছি না। আমাদের উট-ঘোড়া সব মারা যাচ্ছে। সুতরাং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমরা মুহাম্মাদের সাথে যুদ্ধ করে চূড়ান্ত একটা ফায়সালা করে নিতে চাই।" তারা বললো, "আজ শনিবার। এই দিন আমরা কিছুই করি না। ইতিপূর্বে আমাদের কিছু লোক শনিবারে একটা ঘটনা ঘটিয়েছিলো। তার ফলে যে পরিণতি হয়েছিলো তা তোমাদের অজানা নয়। তাছাড়া আমরা তোমাদের সহযোগিতা করার জন্য মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবো না। তবে তোমরা যদি তোমাদের কিছু লোককে আমাদের হাতে নিরাপত্তার রক্ষাকবচ হিসেবে জিম্মী রাখো তাহলে তোমাদের সহযোগিতা করতে যুদ্ধে অংশ নিতে পারি। আমাদের আশংকা হয় যে, যুদ্ধে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা যুদ্ধ অব্যাহত রাখা কঠিন মনে করলে তোমরা আমাদের নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে মুহাম্মাদের মুঠোর মধ্যে অসহায়ভাবে রেখে নিজ দেশে ফিরে যাবে। অথচ মুহাম্মাদের মুকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই।"

বনু কুরাইযার এই জবাব নিয়ে প্রতিনিধিদল যখন ফিরলো তখন কুরাইশ ও গাতফানীরা পরস্পরকে বললো, "নাঈম ইবনে মাসউদ আমাদেরকে যে খবর দিয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অতএব বনু কুরাইযাকে জানিয়ে দেয়া হোক যে, আমরা তোমাদের কাছে একজন লোকও জিম্মী হিসেবে সমর্পণ করতে রাজী নই। যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকেতো এসে যুদ্ধ করো।" কুরাইশ ও গাতফানীদের এ জবাব নিয়ে পুনরায় বনু কুরাইযার কাছে দূত গেলে বনু কুরাইযার নেতারা পরস্পরকে বললো, "দেখলে তো নাঈম যা বলেছে তা সম্পূর্ণ সত্য। কুরাইশ ও গাতফানীরা শুধু যুদ্ধই চায়। আমাদের ভালোমন্দ নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। তারা যদি লাভবান হয় তাহলে তো তাদেরই স্বার্থ উদ্ধার হলো। অন্যথায় তারা আমাদেরকে মুহাম্মাদের হাতে অসহায়ভাবে রেখে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে।”
কাজেই তারা কুরাইশ ও গাতফানীদের জানিয়ে দিল যে, "যতক্ষণ না তোমরা আমাদের হাতে জিম্মী না দেবে ততক্ষণ আমরা তোমাদের সহযোগী হয়ে মুহাম্মাদের সাথে যুদ্ধ করবো না।" এভাবে তারা গাতফান ও কুরাইশদের প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করলো এবং শত্রুদের ভেতরে আল্লাহ কোন্দল সৃষ্টি করে তাদেরকে পর্যদস্ত করে দিলেন। তদুপরি সেই প্রচণ্ড শীতের রাতে আল্লাহ তাদের ওপর অত্যন্ত ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করলেন। সে বাতাস তাদের তাঁবু ফেলে দিল এবং রান্নার আসবাবপত্র তছনছ করে দিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের এই কোন্দল ও বিভেদের খবর পৌঁছলে তিনি সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানকে রাতের বেলা শত্রুদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য পাঠালেন।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী থেকে বর্ণিত। জনৈক কুফাবাসী সাহাবী হুযাইফা ইবনে ইয়ামানকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন ও তাঁর সাহচর্যে থেকেছেন?" তিনি বললেন, 'হাঁ।' সে বললো, "আপনারা তাঁর সাথে কি রকম ব্যবহার করতেন।" হুযাইফা বললেন, "আমরা তাঁর জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করতাম।” কুফাবাসী লোকটি বললো, "খোদার কসম, আমরা যদি তাঁকে জীবিত পেতাম তাহলে তাঁকে মাটিতে হেঁটে চলতে দিতাম না, বরং ঘাড়ে চড়িয়ে রাখতাম।" হুযাইফা (রা) বললেন, ভাতিজা, শোনো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা পরিখায় ছিলাম। তিনি রাতের একাংশ নামায পড়ে কাটালেন। পরে তিনি আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে শত্রুদের গতিবিধির খোঁজ নিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে? আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, সে যেন জান্নাতে আমার সাথী হয়!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজ সেরে ফিরে আসার শর্ত আরোপ করছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে কেউ-ই ভয়, শীত ও ক্ষুধার দরুন যাওয়ার শক্তি পাচ্ছিলো না। কেউ যখন প্রস্তুত হলো না তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। ফলে আমাকে যাওয়ার জন্য

প্রস্তুত হতেই হলো। তিনি বললেন, "হে হুযাইফা, যাও শত্রুদের ভেতরে যাও, তারপর দেখো তারা কি করছে। আমাদের কাছে ফিরে না এসে তুমি কোন কিছু ঘটিয়ে বসোনা যেন।"

এরপর আমি গেলাম এবং সন্তর্পণে শত্রু বাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তখনো বাতাস ও আল্লাহর অদৃশ্য সৈন্যরা তাদেরকে হেস্তনেস্ত করে চলেছে। তাদের তাঁবু ও রান্নার হাঁড়ি পাতিল সবই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে এবং আগুন নিভে গেছে।

তখন আবু সুফিয়ান তাদের বললো, "হে কুরাইশগণ, তোমরা প্রত্যেকে নিজের আশেপাশে খেয়াল করে দেখো, অন্য কেউ আছে কিনা।" একথা শোনার পর আমিই প্রথম পার্শ্ববর্তী লোকের গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে?" সে বললো, "অমুকের ছেলে অমুক।"

পরে আবু সুফিয়ান আরো বললো, "হে কুরাইশগণ, তোমরা যে স্থানে অবস্থান করছে সে স্থান আর অবস্থানের যোগ্য নেই। আমাদের উট-ঘোড়াগুলো মরে গেছে। আর বনু করাইযা আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। আমরা যা অপছন্দ করি তারা তাই করেছে। প্রচণ্ড ঝড় বাতাসে আমাদের কি দশা হয়েছে তা দেখতেই পাচ্ছ। আমাদের রান্নার সাজ-সরঞ্জাম, তাঁর ইত্যাদি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। এমনকি আগুনও নিভে গেছে। অতএব তোমরা সবাই নিজ বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করো। আমি রওনা হচ্ছি।"

একথা বলেই সে তার উটের দিকে এগিয়ে গেল। উটটি ছিল বাঁধা। সে সেটির পিঠে উঠে বসলো। অতঃপর সেটিকে আঘাত করলো। তিনবার আঘাত করার পর সেটি লাফিয়ে উঠলো। উটটার বাঁধন খুললেও সেটি দাঁড়িয়েই ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে নির্দেশ না দিতেন যে, "ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন কিছু ঘটিয়ে বসবে না" তাহলে আমি ইচ্ছা করলেই তাকে হত্যা করতে পারতাম।

হুযাইফা বললেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে গেলাম। তখন তিনি একটি ইয়ামানী কম্বল গায়ে জড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। নামাযের মধ্যেই তিনি আমাকে দেখে পায়ের কাছে টেনে নিলেন এবং কম্বলের একাংশ আমার গায়ের উপর তুলে দিলেন। এই অবস্থায়ই তিনি রুকু ও সিজদা করলেন। সালাম ফিরানোর পর আমি তাঁকে শত্রুদের সব খবর জানালাম।

গাতফানীরা কুরাইশদের ফিরে যাওয়ার কথা জানতে পেরে স্বদেশ ভূমির পথে রওনা হলো।

সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ পরিখা ত্যাগ করে মদীনায় চলে গেলেন এবং অস্ত্র রেখে দিলেন।

বনু মুসতালিক অভিযান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাদিউস সানীর অবশিষ্টাংশ এবং রযব মাস মদীনায় অতিবাহিত করলেন। তারপর ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে খাজায়া গোত্রের বনু মুস্তালিক শাখার বিরুদ্ধে অভিযান চালান।

এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন যে, বনু মুসতালিক গোত্র তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে হারেস ইবনে আবু দিরার যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম স্ত্রী জুয়াইরিয়ার পিতা। এ খবর পেয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্য সামন্ত নিয়ে তাদের মুকাবিলায় বেরুলেন। মুরাইসী নামক ঝর্ণার কিনারে তাদের সাথে তুমুল যুদ্ধ হলো। আল্লাহ বনু মুস্তালিককে পরাজিত করলেন। তাদের বহু লোক নিহত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সন্তান, নারী ও সম্পদ গণীমত হিসেবে গণ্য করলেন।

বনু কালব ইবনে আওফ গোত্রের হিশাব ইবনে সুবাবা নামক জনৈক মুসলিম এতে নিহত হলেন। তাঁকে শত্রুপক্ষীয় মনে করে উবাদা ইবনে সামিতের (রা) দলভুক্ত জনৈক আনসারী সাহাবী ভুলক্রমে হত্যা করেন।

ঝর্ণার কিনারে অবস্থানকালেই মুসলমানদের মধ্যে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটলো। জাহজাহ ইবনে মাসউদ নামক বনু গিফারের এক ব্যক্তিকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর ঘোড়া রাখার জন্য মজুর হিসাবে নিয়োগ করেন। পানি নিয়ে সিনান ইবনে আবার জুহানীর সাথে তার ঝগড়া হয় এবং ক্রমে ঝগড়া মারামারিতে রূপান্তিরিত হয়। তখন জুহানী চিৎকার করে ডাকলো "হে আনসারগণ, বাঁচাও।" জাহজাহও চিৎকার করে বললো, “হে মুহাজিরগণ, আমাকে বাঁচাও।" আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল তখন তার গোত্রের একদল লোকের সাথে অবস্থান করছিল। কিশোর যায়িদ ইবনে আরকামও সেই দলের মধ্যে ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চিৎকার শুনে উত্তেজিত হয়ে বললো, "তারা কি শেষ পর্যন্ত এমন কান্ড ঘটালো? ওরাতো আমাদের মাঝে থেকেই দল ভারী করে অহমিকায় মেতে উঠেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ও মুহাজিরদের অবস্থা সেই প্রবাদ বাক্যের মতোই গড়াচ্ছে যে, 'নিজের কুকুরকে খাইয়ে দাইয়ে মোটাসোটা বানাও, দেখবে একদিন সে তোমাকেই কেটে খাবে।' আল্লাহর কসম, এবার যদি

আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে সবলরা দুর্বলদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেবে।" তারপর তার স্বগোত্রীয়দের বলতে লাগলো, "তোমরা নিজেদের কি সর্বনাশ করেছ, এখন দেখ। ওদেরকে এ দেশে ঠাঁই দিয়েছো। তোমাদের সম্পদের ভাগ দিয়েছো। ওদের প্রতি অমন বদান্যতা যদি না দেখাতে তাহলে ওরা অন্যত্র যেতে বাধ্য হতো।" যায়িদ ইবনে আরকাম এসব কথাবার্তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। এ সময় তিনি সবেমাত্র শত্রুকে পরাস্ত করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। তিনি যখন এই খবর শুনলেন তখন তাঁর কাছে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "আব্বাদ ইবনে বিশরকে নির্দেশ দিন তাকে যমের ঘরে পাঠাক।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "উমার, আমি যদি তা করি তাহলে লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ নিজেই তার সহচরদের হত্যা করছে। তা করা যায় না। তবে তুমি এখনই এখান থেকে রওনা হবার নির্দেশ জানিয়ে দাও।" যে সময় এ নির্দেশ দেয়া হলো সে সময় সাধারণত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও রওনা হতেন না। তথাপি সবাই রওনা হলো।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল যখন জানতে পারলো যে, যায়িদ ইবনে আরকাম তার কথাগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে দিয়েছেন, তখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে গিয়ে কসম খেয়ে বলতে লাগলো, "যায়িদ যা বলেছে, আমি সেসব কথা বলিনি।" আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যেহেতু স্বগোত্রে খুবই সম্মানিত লোক বলে গণ্য হতো তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যেসব আনসারী সাহাবী ছিলেন তারা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, যায়িদ হয়তো ভুল শুনেছে এবং সে যা বলেছে তা হয়তো পুরোপুরি মনে রাখতে পারেনি।" এভাবে তারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি একটু সৌজন্য দেখালেন এবং তাকে বাঁচিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওনা হলেন, তাঁর সাথে উসায়েদ ইবনে হুদাইর দেখা করলেন। তাঁকে সালাম ও অভিবাদন পূর্বক বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি বড়ই অসুবিধাজনক সময়ে যাত্রা করেছেন। সাধারণত এরকম সময়ে আপনি কোথাও যাত্রা করেন না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমাদের সঙ্গী লোকটি কি বলেছে তা শোননি?" তিনি বললেন, "কোন্ সঙ্গী?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।" উসায়েদ বললেন, "সে কি বলেছে?" রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তার ধারণা, সে যদি মদীনায় ফিরে যেতে পারে তাহলে সবলরা দুর্বলদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে।" উসায়েদ বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ইচ্ছা করলে তাকে আমরা বের করে দিতে পারি। সত্যই সে অত্যন্ত হীন ও নীচ। আর আপনি পরাক্রান্ত।" তিনি আরো বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, তার প্রতি একটু নমনীয় হোন। অল্লাহর কসম, আপনাকে আল্লাহ আমাদের কাছে এমন সময় এনে দিয়েছেন যখন তার গোত্র তাকে

মুকুট পরানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাই সে মনে করে, আপনি তার থেকে একটা রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন।"

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সাথে নিয়ে একদিন একরাত ধরে পথ চললেন। পথে প্রচণ্ড রৌদ্রে তাদের অসহনীয় কষ্ট হলে লাগলো। তাই এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করলেন। লোকেরা মাটিতে নামতেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। আগের দিন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কথায় লোকদের ভেতর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়ার সম্ভাবনা ছিল তা থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে দেয়ার জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে অসময়ে যাত্রা করেছিলেন। বিশ্রাম শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় সদলবলে যাত্রা শুরু করলেন। হিজাযের মধ্য দিয়ে যাত্রাকালে তিনি একটি ঝর্ণার কাছে যাত্রাবিরতি করলেন। সে স্থানটার নাম বাক্যা। সেখান থেকে পুনরায় যখন যাত্রা শুরু হলো তখন মুসলমানদের উপর দিয়ে হঠাৎ একটা কষ্টদায়ক ও ভীতিপ্রদ বাতাস বয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এ বাতাসকে তোমরা ভয় পেয়ো না। একটা মস্তবড় কাফিরের মৃত্যু ঘটেছে। সে জন্যই এ বাতাস।" মদীনায় ফিরে দেখেন বনু কাইনুকা গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তি রিফায়া ইবনে যায়িদ ঐ দিনই মারা গেছে। সে ছিল মুনাফিকদের আশ্রয়স্থল তথা কুমন্ত্রণাদাতা।

কুরআন শরীফের সূরা মুনাফিকুন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার মত লোকদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিল। এই সূরা নাযিল হলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়িদ ইবনে আরকামের কানে হাত রেখে বললেন, "এই ব্যক্তি তার কানের সাহায্যে আল্লাহর ওয়াদা পালন করেছে।" আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ তার পিতার ব্যাপারটা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি শুনেছি, আপনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে তার বৈরী কথাবার্তার জন্য হত্যা করতে ইচ্ছুক। যদি সত্যিই আপনি ইচ্ছুক হয়ে থাকেন তাহলে আমাকে নির্দেশ দিন আমি তার মাথা আপনার কাছে পৌঁছিয়ে দিই। আল্লাহর কসম, খাযরাজ গোত্র জানে যে, ঐ গোত্রে আমার চেয়ে পিতৃভক্ত লোক আর নেই। আমার আশংকা হয় যে, আপনি আমার পিতাকে হত্যার জন্য কাউকে নির্দেশ দেবেন। আর সে তাকে হত্যা করবে, তখন আমার পিতৃহন্তাকে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখে হয়তো আমার প্রবৃত্তি কুপ্ররোচনা দিয়ে আমাকে অসহিষ্ণু করে তুলবে। ফলে তাকে হত্যা করে আমি জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবো। কেননা সেক্ষেত্রে আমি একজন কাফিরের বদলায় একজন মু'মিনকে হত্যার দায়ে দোষী হবো।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "না, সে যতদিন আমাদের সাথে থাকে ততদিন তার প্রতি আমরা নমনীয় থাকবো এবং ভালো ব্যবহার করবো।"

এরপর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখনই কোন অঘটন ঘটাতো, তার গোত্রের লোকেরাই তাকে শায়েস্তা করতো। তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতো এবং পাকড়াও করতো। এই অবস্থা জেনে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) বললেন, "উমার, পরিস্থিতির পরিবর্তনটা দেখছো তো? তুমি যেদিন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যার পরামর্শ দিয়েছিলে সেদিন যদি তাকে হত্যা করতাম তাহলে অনেকেই নাক সিটকাতো। কিন্তু আজ যদি আমি তাকে হত্যার নির্দেশ দিই তাহলে সেদিন যারা নাক সিটকাতো তারাই আজ তাকে হত্যা করবে।" উমার (রা) বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি জানি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত আমার সিদ্ধান্তের চাইতে অধিক কল্যাণকর।"

যে মুসলমানকে উবাইদা ইবনে সামিত (রা) শত্রুর লোক সন্দেহে ভুলবশতঃ হত্যা করেছিলেন, সেই হিসাম ইবনে সুবাবার ভাই মিকইয়াস ইবনে সুবাবা একদিন মক্কা থেকে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করে নিজের ভাইয়ের খুনের পণ দাবী করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তপণ দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। মিকইয়াস নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করেছিল। রক্তপণ পাওয়ার পর সে অল্প কিছুদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থান করে। তারপর একদিন তার ভ্রাতৃহন্তাকে হত্যা করে ইসলাম ত্যাগ করে মক্কা চলে যায়।

ওইদিন বনু মুসতালিকের বহুলোক নিহত হয়েছিল। ৭৩ আলী ইবনে আবু তালিবেন (রা) হাতে মালিক ও তার পুত্রসহ বনু মুসতালিকের দু'জন লোক নিহত হয়। আ আবদুর রহমান ইবন আওফ হত্যা করেন অশ্বারোহী আহমার বা উহাইমিরকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন অনেককে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটা করেন। তাদেরকে তিনি মুসলমানদের মধ্যে দাসদাসীরূপে বণ্টন করে দেন। এইস যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে একজন ছিলেন বনু মুসতালিকের গোত্রপতি হারেস ইবনে আ দিরার দুহিতা জুয়াইরিয়া যিনি পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লামের স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসতালিকের যুদ্ধবন্দীদেরকে বণ্টন করলে জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস সাবিত ই কায়েসের ভাগে অথবা তার এক চাচাতো ভাইয়ের ভাগে পড়েন। জুয়াইরিয়া তৎক্ষ মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তিলাভের উদ্যোগ নেন। তিনি ছিলেন খুবই লাবণ্যময়ী মিষ্টি মেয়ে।
তাঁকে যে-ই দেখতো সে-ই মুগ্ধ হয়ে যেতো। জুয়াইরিয়া মুক্তি লাভের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সাহায্য কামনা করেন। তাঁকে আমার ঘরের দরজায় দাঁড়াতে দেখেই আমি তাঁকে খারাপ মনে করি। আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর যে

মনোহর রূপ আমি দেখেছি তা নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি এড়াবে না। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি হারেস ইবনে আবু দিরারের কন্যা। আমার পিতা গোত্রের সরদার। আমি কি বিপদে পড়েছি তা আপনার অজানা নয়। আমি সাবিত ইবনে কায়েস- অথবা তার চাচাতো ভাইয়ের ভাগে পড়েছি। আমার মুক্তিপণ আদায়ে আপনার সাহায্য কামনা করছি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি যদি তোমার জন্য আরো ভালো কিছুর ব্যবস্থা করি?" তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, সেটা কি?” তিনি বললেন, "আমি তোমার পক্ষ হতে মুক্তিপণ আদায় করে দিয়ে তোমাকে বিয়ে করবো।" জুয়াইরিয়া বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি এতে রাজী আছি।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি তাই করলাম।" মুসলমানগণ যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুয়াইরিয়াকে বিয়ে করেছেন, তখন তাঁরা তাঁদের হাতে বন্দী বনু মুসতালিকের সব লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় বিবেচনা করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে বনু মুস্তালিকের একশ' বন্দী শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুয়াইরিয়ার বিয়ে হওয়ার কারণে মুক্তিলাভ করলো। সত্যি বলতে কি নিজ গোত্রের জন্য জুয়াইরিয়ার চেয়ে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে এমন কোন মহিলার কথা আমার জানা নেই।

ইয়াযীদ ইবনে রোমান বলেন, বনু মুসতালিক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালীদ ইবনে উকবা ইবনে আবু মুয়াইতকে তাদের কাছে প্রেরণ করেন। তাঁর আগমনের খবর শুনে গোত্রের বহু অশ্বারোহী তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলো। এদিকে ওয়ালীদ এসব দেখে ভয় পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন যে, গোত্রের লোকেরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে এবং তাদের দেয় যাকাত আনতে দেয়নি। এতে মুসলমানগণ বনু মুস্তালিককে আক্রমণ করর জন্য খুব পীড়াপীড়ি শুরু করে দিলো। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঠিক এই সময় বনু মুস্তালিকের একটি প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের কাছে দূত পাঠিয়েছেন শুনে আমরা তাকে অভ্যর্থনা করতে এবং আমাদের দেয় যাকাত দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি ত্বরিত গতিতে ফিরে এলেন। পরে শুনলাম, তিনি আপনাকে বলেছেন যে, আমরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম। আল্লাহর কসম, আমরা সে জন্য আসিনি।” এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ সূরা হুজুরাতের এ আয়াত দু'টি নাযিল করেন :

“হে মু'মিনগণ, তোমাদের কাছে কোন ফাসিক ব্যক্তি কোন খবর নিয়ে এলে তা যাচাই-বাছাই করে দেখো যাতে অজান্তে কোন গোষ্ঠীর ওপর চড়াও হ'য়ে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। আর জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রয়েছেন।

তিনি যদি অনেক ব্যাপারে তোমাদের মত অনুসরণ করেন তাহলে তোমরা মুসিবতে পড়ে যাবে। ...."

এই সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আয়িশা (রা)ও ছিলেন। তাঁকে নিয়ে তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন মদীনার কাছাকাছি এক জায়গায় এলে একদল মুসলমান আয়িশার (রা) ওপর অপবাদ আরোপ করে বসে।

অপবাদের ঘটনা ৬ষ্ঠ হিজরী

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই সফরে যেতেন, তখনই কোন স্ত্রী তাঁর সাথে যাবেন তা নিয়ে লটারী করতেন। যার নামে লটারী উঠতো তাকে তিনি সাথে নিয়ে যেতেন। বনু মুসতালিক অভিযানকালেও তিনি যথারীতি লটারী করলেন এবং তাতে আমার নাম উঠলো। তাই তিনি আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন।

তৎকালে মেয়েদের মধ্যে স্বল্পাহারের প্রচলন ছিল। তাই শরীরের গোশত স্ফীত হয়ে ওজন বেড়ে যেতো না। সফরকালে আমার উট যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে আমি হাওদায় বসতাম। লোকজন এসে হাওদা উঠিয়ে পিঠে স্থাপন করতো এবং তা রশি দিয়ে উটের পিঠে বেঁধে দিতো। এরপর যাত্রা শুরু হতো।

বনু মুসতালিক অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তনকালে মদীনার নিকটে এসে এক জায়গায় একরাত কাটালেন। তারপর আবার যাত্রার ঘোষণা হলে সদলবলে যাত্রা শুরু হলো। এই সময় আমি প্রকৃতির ডাকে বাইরে গিয়েছিলাম। আমার গলায় একটা ইয়ামানী মুক্তার মালা ছিল। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে আসার পর আমি দেখলাম যে, সেই হার আমার গলায় নেই। কখন যে তা পড়ে গেছে আমি মোটেই টের পাইনি। অগত্যা আমি তা খুঁজতে আবার কাফিলা থেকে বেরিয়ে যেখানে প্রকৃতির ডাকে গিয়েছিলাম সেখানে ফিরে গেলাম। ইতিমধ্যে কাফিলা যাত্রার আয়োজন করলো। আমি হারটি খুঁজে পেলাম। যারা আমার উটের হাওদা উঠায় তারা আমার উটের কাছে এসে যথারীতি হাওদাটা উঠিয়ে দিল। ততক্ষণে তাদের যাত্রার প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। তারা যখন হাওদা উঠালো, তখন ভাবলো আমি যথারীতি হাওদার ভেতরেই আছি। তাই তারা হাওদা উঠিয়ে তা উটের সাথে বেঁধে দিল। আমার হাওদায় অবস্থান সম্পর্কে তাদের মোটেই সন্দেহ হলো না। তারপর তারা উট হাঁকিয়ে যাত্রা করলো। আমি হার কুড়িয়ে নিয়ে যখন কাফিলার রাত্রি যাপন স্থানে ফিরে এলাম তখন ময়দান ফাঁকা। সেখানে কেউ নেই। সমগ্র কাফিলা রওনা হয়ে গেছে। অনন্যোপায় হয়ে আমি

চাদর মুড়ি দিয়ে ঐ স্থানেই শুয়ে রইলাম। ভাবলাম আমার অনুপস্থিতি দেখলে তারা অবশ্যই আমার খোঁজে ফিরে আসবে। আমি তখনো শুয়ে আছি। দেখলাম সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল সুলামী আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছে। সেও কোন প্রয়োজনে কাফিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সে কাফিলার সাথে রাত যাপনও করেনি। দূর থেকে আমাকে দেখে সে এগিয়ে এলো এবং আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। পর্দার হুকুম নাযিল হবার আগে সে আমাকে দেখেছিল। সে আমাকে দেখেই বলে উঠলো, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এ যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী!" আমি তখনো কাপড়ে আবৃত। সে বললো, "আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আপনি কিভাবে পেছনে পড়লেন?" আমি তার সাথে কোন কথা বললাম না। অতঃপর সে উট এগিয়ে দিয়ে বললো, "আরোহণ করুন।" সে একটু দূরে সরে গেল। আমি উটের পিঠে সওয়ার হলাম। আর সে উটের মাথা ধরে কাফিলার দিকে দ্রুত এগিয়ে চললো। এভাবে সকাল হলো। লোকজন এক জায়গায় বিশ্রাম করছিলো। এমন সময় সে আমাকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে হাজির হলো। এই দৃশ্য দেখেই অপবাদ আরোপকারীরা অপবাদ রটালো। মুসলমানদের মধ্যে তা নিয়ে চাঞ্চল্য ও হুলস্থুল পড়ে গেল। কিন্তু আমি কিছুই জানতে পারলাম না।

মদীনায় পৌঁছেই আমি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমি তখনো ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানি না। কথাটা ক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আমার পিতা-মাতার কানেও গেল। তাঁরাও আমাকে এর বিন্দুবিসর্গ জানতে দিলেন না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করলাম। আমার প্রতি আগের মত সহৃদয় ব্যবহার তাঁর কমে গেল। কখনো অসুস্থ হলে তিনি আমাকে আদর সোহাগ করতেন। কিন্তু এবারের অসুস্থতায় তিনি তা করলেন না। এটা আমার কাছে খুব ভাল লাগলো না। আমার পরিচর্যার জন্য আমার মা কাছে ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে তিনি আমার কাছে এসে শুধু বলতেন, " কেমন আছ?" এর বেশি একটা কথাও তিনি বলতেন না। এতে আমি খুবই মনোকষ্ট পোহাচ্ছিলাম। তাঁর এ নিরস ও হৃদয়হীন আচরণ দেখে একদিন আমি তাঁকে বললাম, “ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমি আমার মার কাছে চলে যাই! তিনি আমার পরিচর্যা করবেন।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়ে বললেন, " যেতে পারো, কোন বাধা নেই।"

আমি মার কাছে চলে গেলাম। তখনো আমি রটনা সম্পর্কে কিছুই জানিনা। বিশ দিনেরও বেশি রোগে ভুগে আমি জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেলাম।

আমরা ছিলাম আরব। অনারবদের মত আমাদের বাড়ীতে পায়খানা বানাতাম না। এসব আমাদের কাছে বিরক্তিকর মনে হতো। আমরা নারীরা খোলা ময়দানে গভীর রাত্রে গিয়ে

প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতাম। আমি কোন এক রাতে আবদুল মুত্তালিব পুত্র আবু রেহেমের কন্যা উম্মে মিসতাহর সাথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গিয়েছিলাম। আমার সাথে চলতে গিয়ে এই মহিলা হঠাৎ নিজের গায়ের কম্বলে পা জড়িয়ে হোঁচট খেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "কপাল পুড়ক মিস্তাহর।" আমি বললাম, "ছি। ছি! এ আপনি কি বললেন, এমন একজন মুহাজিরের নামে এমন কথা-যিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছেন?" তিনি বললেন, "ওহে আবু বাক্রের মেয়ে, তুমি কি ওর ব্যাপারে কিছু শোন নি?" আমি বললাম, "কিসের ব্যাপার?" তখন তিনি আমাকে রটিত অপবাদের কথা জানালেন। আমি বললাম, "এ রটনায় কি মিসতাহও যোগ দিয়েছিল?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, ও ছিল।"

আয়েশা বলেন: একথা শোনার পর আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না। ঘরে ফিরে এলাম এবং কাঁদতে লাগলাম। কান্নার চোটে আমার কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। মাকে বললাম, "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। লোকেরা যা বলার তাতো বলেছেই। কিন্তু আপনি যে তাঁর বিন্দুমাত্রও আমাকে জানালেন না! ব্যাপার কি?" মা বললেন, "মা, ব্যাপারটা তুমি হালকাভাবে নাও। কোন মেয়ে যদি সুন্দরী হয় এবং তার স্বামী যদি তাকে খুব ভালবাসে আর তার যদি সতিনও থাকে, তাহলে পুরুষ এবং স্ত্রী নির্বিশেষে সবাই তাকে পেয়ে বসে। তার বিরুদ্ধে এন্তার রটনায় লিপ্ত হয়।"

ইতিমধ্যে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের এক সমাবেশে ভাষণ দেন। এই ভাষণের কথাও আমি জানতাম না। তিনি ভাষণের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করেন। অতঃপর বললেন, "হে লোকজন! কিছু লোক আমার পরিবার পরিজন সম্পর্কে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিচ্ছে? তাদের ব্যাপারে অসত্য কথা বলছে? অথচ আমি আমার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু জানি না। আর এমন একটি লোক সম্পর্কে অপবাদ রটানো হচ্ছে যার সম্পর্কেও আমি ভাল ধারণা পোষণ করি। আমার অনুপস্থিতিতে সে কখনো আমার ঘরে প্রবেশ করে না।"

আয়িশা বলেন: এই অপবাদ রটনার প্রধান ও নেপথ্য নায়ক ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল। খাযরাজ গোত্রের কিছু লোকও তার সহযোগী ছিল। মিসতাহ ও হামনা বিনতে জাহাশ (উম্মুল মুমিনীন যায়নাব বিনতে জাহাশের বোন) যেটুকু বলেছিল ঐ মুনাফিক দল তাকে অতিরঞ্জিত করে তুলেছে। হামনার বোন যায়নাব বিনতে জাহাশ রাসূলুল্লাহর অন্যতমা স্ত্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র যায়নাবকেই আমার সমান মর্যাদা দিতেন। অথচ যায়নাব আমার সম্পর্কে একটিও খারাপ কথা বলেননি। আল্লাহ তাকে সততার উচ্চতম মানে বহাল রেখেছিলেন। কেবল হামনা বিনতে জাহাশই অপবাদ

রটনায় অংশগ্রহণ করে। এমনকি সে তার বোনের জন্য আমার সাথে বাকবিতণ্ডাও করতো। তার এ আচরণে আমি খুবই বিব্রত ছিলাম।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত ভাষণ দিলে উসায়েদ ইবনে হুদায়ের বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, অপবাদ আরোপকারীরা যদি আওস গোত্রের লোক হয় তাহলে আমরাই তাদের শায়েস্তা করার জন্য যথেষ্ট। আর যদি খাযরাজের লোক হয় তাহলে আমাদেরকে আপনি যে নির্দেশ দিতে চান, দিন। আল্লাহর শপথ, এ ধরনের লোকেরা হত্যার যোগ্য।" সাদ ইবনে উবাদাকে ভাল লোক বলেই মনে হতো। একথা শুনে সে বললো, "মিথ্যা কথা, আমরা তাদেরকে হত্যা করবো না। তারা খাযরাজ গোত্রের লোক, তাই তুমি এ কথা বলছো। তোমার গোত্রের লোক হলে একথা বলতে না।" উসায়েদ বললেন, "তুমি মিথ্যা বলছো। আসলে তুমি একজন মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছো।"

আয়িশা (রা) বলেন: এরপর দুই পক্ষে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল। আওস ও খাযরাজ এ দুই গোত্রে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ারও আশংকা দেখা দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে আলী (রা) ও উসামা ইবনে যায়িদকে (রা) ডেকে পরামর্শ করলেন। উসামা আমার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার স্ত্রী? তার সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছু জানি না। এটা একটা মিথ্যা ও অলীক অপবাদ।" আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, স্ত্রীলোকের অভাব নেই। আপনি ইচ্ছা করলে একজন স্ত্রীর স্থলে আর এক স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারেন। তবে দাসীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। সে প্রকৃত তথ্য জানাতে পারবে।" সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশার পরিচারিকা বারীরাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকলেন। সে এলে আলী (রা) তাকে ভীষণভাবে প্রহার করলেন। তারপর বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সত্য কথা বলবি।" বারীরা বললো, "আল্লাহর শপথ! আয়িশাকে আমি সচ্চরিত্র বলেই জানি। তার মধ্যে কোন দোষই আমি দেখতে পাইনি। তবে শুধু এতটুকুই পেয়েছি যে, আমি গম পিষে আটা বানিয়ে আয়িশাকে তা হিফাজত করতে বলি। কিন্তু কখনো কখনো সে আটার কথা ভুলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আর ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলে।"

আয়িশা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমার পিতামাতা আমার কাছেই বসেছিলেন। আমার কাছে তখন জনৈকা আনসারী মহিলা উপবিষ্টা। আমি কাঁদছিলাম আর আমার সাথে ঐ মহিলাও কাঁদছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে বসে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, "আয়িশা, লোকেরা যা বলেছে সে ধরনের কোন খারাপ কাজ যদি করে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবাহ কর। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবাহ কবুল করে থাকেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথাটুকু শুনতেই আমার অশ্রু থেমে গেল। তাঁর উপস্থিতি যেন আমি আর অনুভবই করতে পারলাম না। পিতামাতা আমার পক্ষ থেকে তাঁকে একটা জবাব দেবেন বলে আশা করছিলাম। কিন্তু তাঁরা কোন কথাই বললেন না। আল্লাহর শপথ, আমি নিজেকে কখনো এতটা মর্যাদাবান বলে ভাবিনি যে, আল্লাহ আমার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল করবেন, যা মসজিদে মসজিদে তিলাওয়াত করা হবে এবং নামাযে পড়া হবে। আমি শুধু এতটুকুই আশা করছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে কিছু দেখানো হবে যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমার ওপর আরোপিত অপবাদ খণ্ডন করে দেবেন। কেননা আল্লাহ তো জানেন যে আমি নির্দোষ। স্বপ্ন না হোক, মামুলীভাবে একটা খবর হয়তো আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দেবেন। কিন্তু কুরআনে অঙ্গীভূত যে ওহী, আমার হয়তো সম্পর্কে তা নাযিল হবে আল্লাহর কসম, আমি নিজেকে এতটা মর্যাদাবান কখনো ভাবিনি।

পিতামাতাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে আমি তাঁদেরকে বললাম, "আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন জবাব দিলেন না?" তাঁরা বললেন, "আল্লাহর শপথ, জবাব দেবার মত কোন কিছু আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।" বস্তুত সেই দিনগুলোতে আবু বাক্রের (রা) পরিবার যেরূপ সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, অতবড় সংকটে আর কোন পরিবার কখনো পড়েছে বলে আমার জানা নেই।

পিতামাতাকে আমার ব্যাপারে নীরব থাকতে দেখে আমার গণ্ডদেশ পুনরায় চোখের পানিতে ভাসতে লাগলো এবং আমি কাঁদতে লাগলাম। আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ! আপনি যে গুনাহর কথা বলছেন সেজন্য আমি কখনো তাওবাহ করবো না। আমি জানি, লোকেরা যা রটিয়ে বেড়াচ্ছে তা যদি স্বীকার করি তাহলে এমন একটা বিষয় স্বীকার করে নেয়া হবে যা আমার দ্বারা আদৌ সংঘটিত হয়নি। স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষী যে, আমি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নির্দোষ। আর আমি যদি তা অস্বীকার করি তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না।" আয়িশা বলেন: অতঃপর আমি ইয়াকুব আলাইহিস সাল্লামের নাম স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু স্মরণ করতে পারলাম না। অগত্যা বললাম, "ইউসুফ আলাইহিস সাল্লামের পিতা যে কথা বলেছিলেন আমি সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করবো- 'পূর্ণ ধৈর্য অবলম্বনই সুন্দর পন্থা।' তোমরা যা বর্ণনা করছো সে ব্যাপারে আল্লাহই (আমার) একমাত্র সহায়।" এ কথা বলার অল্পক্ষণ পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহীর লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। তাঁকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো এবং তাঁর মাথার নীচে বালিশ রেখে দেয়া হলো। আমি দৃশ্য দেখে সম্পূর্ণ নির্বিকার, বেপরোয়া ও নির্ভীক রইলাম। আমি জানতাম যে, আমি নির্দোষ। আল্লাহ আমার ওপর যুলুম করতে পারেন না। পক্ষান্তরে আমার পিতা মাতার প্রাণ যেন বেরিয়ে

যাওয়ার উপক্রম হলো। যদি ওহীর দ্বারা রটিত অপবাদটি সত্য বলে ঘোষিত হয়, সেই ভয়ে তাঁদের অবস্থা শোচনীয় হড়ে দাঁড়ালো।

আয়িশা (রা) বলেন: কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিক হয়ে বসলেন। সেই প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর গা দিয়ে মুক্তার দানার মত ঘাম পড়ছিলো। তিনি কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, "আয়িশা তোমার জন্য সুসংবাদ! আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করে ওহী নাযিল করেছেন।" আ বললাম, "আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা।"

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে গিয়ে মুসলিম জনগণকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন এবং কুরআনের যে আয়াতগুলো ঐ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে তা তাদের পড়ে শোনালেন। তারপর মিসতাহ ইবনে উসামা, হাসসান ইবনে সাবিত ও হামনা বিনতে জাহাশের ক্ষেত্রে অপবাদ রটনার শাস্তি কার্যকর করলেন। কারণ তারা এই অপবাদের অন্যতম রটনাকারী ছিলেন।

ইবনে ইসহাক বনু নাজ্জারের কিছু লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন:

আবু আইয়ুব খালিদ ইবনে যায়িদকে তার স্ত্রী উম্মে আইয়ুব বলেছিলেন, "আয়িশা সম্পর্কে যা রটানো হচ্ছে, তুমি কি তা শুনেছো?" আবু আইয়ুব বললেন, “হাঁ, শুনেছি। সে তো মিথ্যে কথা। উম্মে আইয়ুব, এ রকম কাজ কি তুমি করতে পারতে?" উম্মে আইয়ুব বললেন, "কখনো না।" আবু আইয়ুব বললেন, "আল্লাহর শপথ, আয়িশা তো নিঃসন্দেহে তোমার চেয়েও ভালো।"

আয়িশা বলেন: কুরআনে এই অপবাদ রটনাকারীদের সম্পর্কে যে কয়টি আয়াত নাযিল হয়, তার কয়েকটি এই, "যারা এই মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে তারা তোমাদেরই একটি গোষ্ঠী। এ ঘটনাকে তোমরা নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না। আসলে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যে যেটুকু পাপ করেছে তার ফল সেই ভোগ করবে। আর তাদের মধ্যে যে এই অপকর্মের বেশীরভাগ দায়িত্ব নিয়েছে তার জন্য তো বিরাট আযাব রয়েছে।" (এ আয়াতে হাসসান ইবনে সাবিত ও তাঁর সহযোগীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা অপবাদ রটনায় অংশ নিয়েছিলেন।) "তোমরা যখন কথাটা শুনেছিলে তখন মু'মিন স্ত্রী পুরুষেরা নিজেদেরই লোক সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করলো না কেন? (অর্থাৎ আবু আইয়ুব ও তার স্ত্রীর মত) যখন তোমরা মুখ থেকে মুখে কথাটা গ্রহণ করছিলে এবং যা জানো না তাই রটিয়ে বেড়াচ্ছিলে, আর একে একটা হালকা জিনিস মনে করছিলে। অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল একটা সাংঘাতিক ব্যাপার।"

আয়িশা (রা) ও তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের সম্পর্কে এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর আবু বাক্স (রা) বললেন, "আল্লাহর শপথ, মিসতাহ যখন এমন জঘন্য অপবাদ আয়িশার বিরুদ্ধে রটিয়েছে তখন তার ভরণ-পোষণের ভার আমি আর বহন করবো না এবং তার বিন্দুমাত্রও উপকার আর করবো না।" উল্লেখ্য যে, মিসতাহ তার একজন দরিদ্র আত্মীয় ছিল এবং তিনি তার ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করতেন।

আবু বাক্সের এই প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে নাযিল হলো, "তোমাদের মধ্যে যারা সচ্ছল ও অনুগ্রাহক তারা যেন আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র ও আল্লাহর পথে হিজরাতকারীদের প্রতি বদান্যতা না দেখানোর প্রতিজ্ঞা না করে। তারা যেন ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" আবু বাক্স রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত শুনে তৎক্ষণাৎ বললেন, "হাঁ, আমি চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।" অতঃপর তিনি মিসতাহর ভরণ-পোষণের ভার পুনরায় গ্রহণ করেন এবং আর কখনো এ দায়িত্ব ত্যাগ করবেন না বলে শপথ নেন।

ইবনে ইসহাক বলেন: আয়িশার (রা) প্রতি অপবাদ আরোপের জন্য হাসসান ইবনে সাবিতের যে শাস্তি হয় মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি সে সম্পর্কে নিম্নরূপ কবিতা আবৃত্তি করেন,

"হাসসান সমুচিত শাস্তি পেয়েছে। আর হামনা এবং মিসতাহও।

কেননা তারা অশ্লীল কথা বলেছিল।

তাদের নবীর মহিষী সম্পর্কে আনুমানিক উক্তি করে এবং তাঁকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তারা আরশ অধিপতির ক্রোধের শিকার হয়েছিল।

তারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছিল, চিরস্থায়ী গ্লানিকর অপপ্রচারণাকে গুরুত্ব দিয়ে চারদিকে ছড়িয়েছিল এবং অপমানিত করেছিল।

(ফলে) রটনাকারীদের ওপর শাস্তির দণ্ড মুষলধারে

বৃষ্টি বর্ষণের মত বর্ষিত হতে লাগলো।"

টীকা১.সীরাতে ইবনে হিশাম বই।

হুদাই বিয়ার সন্ধি

কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সুহাইল ইবনে আমরকে পাঠালো। তারা তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আপোষ করার নির্দেশ দিয়ে পাঠালো। এই আপোষরফার একমাত্র লক্ষ্য হবে মুহাম্মাদ যেন অবশ্যই এ বছরের মত মক্কায় প্রবেশ না করে ফিরে যায়। আরবরা যেন কখনো বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ কুরাইশদের ওপর শক্তিপ্রয়োগ করে মক্কায় প্রবেশ করেছে।

সুহাইল ইবনে আমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলো। তাকে আসতে দেখে তিনি বললেন, "এ লোকটিকে তখনই পাঠানো হয়েছে যখন কুরাইশরা নিশ্চয়ই সন্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" সুহাইল এসে খুব লম্বা আলাপ জুড়ে দিল। তারপর সন্ধির ব্যাপারে উভয়পক্ষে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলো।

সন্ধি চুক্তির সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হয়ে লিখিত রূপ নিতে শুধু বাকী, এই সময় উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবু বাক্রের (রা) নিকট ছুটে গিয়ে বললেন, “হে আবু বাক্র, তিনি কি আল্লাহর রাসূল নন?” আবু বাক্র বললেন, “হ্যাঁ।” উমার বললেন, “আমরা কি মুসলমান নই?” আবু বাক্র বললেন, "অবশ্যই।” উমার বললেন, "কুরাইশরা কি মুশরিক নয়?” আবু বাক্র বললেন, “হ্যাঁ।” উমার আবারো বললেন, “তাহলে কিসের জন্য আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এভাবে নতিস্বীকার করতে যাচ্ছি?” আবু বাক্র বললেন, "উমার, তাঁর আনুগত্য কর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।" উমার বললেন, "আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল।"
তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।” উমার বললেন, "আমরা কি মুসলমান নই?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।” উমার বললেন, "ওরা কি মুশরিক নয়?” তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" উমার আবারো বললেন, “তাহলে কি কারণে আমরা আমাদের দীনের প্রশ্নে এই অবমাননা বরদাশত করতে যাচ্ছি?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। তাঁর নির্দেশ আমি কখনো লংঘন করবো না। আর তিনি আমাকে কখনো বিপথগামী করবেন না।"

পরবর্তীকালে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "আমি সেদিনের সেই ভ্রান্ত আচরণের জন্য সারাজীবন সাদকা, নামায, রোযা ও গোলাম আযাদ করার মাধ্যমে কাফফারা দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছি। আমার কথাগুলোর খারাপ পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য আমি এসব করেছি। অবশেষে আমার আশার সঞ্চার হয়েছে যে, আমি ভাল ফল পাবো।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে আবু তালিবকে (রা) ডেকে বললেন, "লেখ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।" সুহাইল বললো, "এটা আমার অজানা কথা। তুমি বরং লেখ, বিসমিকা আল্লাহুম্মা।" (হে আল্লাহ, তোমার নামে।) অতঃপর আলী (রা) সুহাইল যা বললো সেটাই লিখলেন।

অতঃপর তিনি বললেন, "লেখ, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল ইবনে আমরের সাথে নিম্নলিখিত মর্মে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন।" একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুহাইল ইবনে আমর বলে উঠলো, "আমি যদি তোমাকে আল্লাহর রাসূল বলেই মানতাম তাহলে তো তোমার সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতাম না। শুধু তোমার নাম ও পিতার নাম লেখ।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বেশ, তাই লেখ। আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ নিম্নলিখিত মর্মে আমরের পুত্র সুহাইলের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। তারা উভয়ে একমত হয়েছেন যে, দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এই দশ বছর জনগণ পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করবে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে সব রকমের আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে। কুরাইশদের কোন লোক তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মাদের নিকট এলে তিনি তাকে ফেরত পাঠাবেন। আর মুহাম্মাদের সাহাবাদের কেউ কুরাইশদের কাছে আসলে কুরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। আমাদের এই চুক্তি কখনো লংঘিত হবে না। উভয় পক্ষ আন্ত রিকভাবে ও পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তা মেনে চলবে। কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কেউ গোপন পাচারের কাজে লিপ্ত হবে না। মুহাম্মাদ অথবা কুরাইশ যে কোন পক্ষের সাথে যে কেউ এ চুক্তিতে অংশগ্রহণ বা নতুন চুক্তি করতে চাইলে অবাধে তা করতে পারবে।" এই ধারা ঘোষিত হওয়া মাত্র বনু খাযায়া গোত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এবং বনু বাক্র কুরাইশদের সাথে তৎক্ষণাৎ মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করলো। সন্ধি চুক্তিতে আরো লিপিবদ্ধ করা হলো, "তুমি (মুহাম্মাদ) এ বছর আমাদের শহর মক্কায় প্রবেশ না করে ফিরে যাবে। আগামী বছর আমরা তোমার জন্য মক্কার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে অন্যত্র চলে যাবো। তুমি অবাধে প্রবেশ করবে এবং তোমার সাথীদের নিয়ে তিনদিন মক্কায় অবস্থান করবে। কোষবদ্ধ তরবারী সঙ্গে নিতে পারবে। তরবারী ছাড়া ঢুকবার বাধ্যবাধকতা থাকবে না।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সুহাইল ইবনে আমরের তত্ত্বাবধানে যখন এই সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবু জানদাল শৃংখলিত অবস্থায় সেখানে এসে হাজির হলো। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পালিয়ে এসেছেন। এ সময় ঐ স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন না। ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা স্বপ্নে যে বিজয়ের ইংগিত ছিল সে ব্যাপারে তারা সংশয়াবিষ্ট হয়ে পড়ছিলেন। তাই তারা সন্ধি চুক্তিতে এ বছর (উমরা ছাড়াই) ফিরে যাওয়ার ধারা সন্নিবেশিত

হতে দেখে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা বরদাশত করতে ও মেনে নিতে দেখে মহা বিপাকে পড়ে যান এবং প্রায় পথভ্রষ্ট হবার উপক্রম হন। ওদিকে আবু জানদালকে দেখে সুহাইল ইবনে আমর বেসামাল হয়ে তার মুখে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করলো এবং তার বুকের কাপড় টেনে ধরলো। সে তখন বলছিল, " হে মুহাম্মাদ, আবু জানদাল আসার আগেই তোমার ও আমার মধ্যে চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, " সে কথা সত্য।" অতঃপর সে আবু জানদালকে বুকের কাপড় ধরে প্রবল জোরে টানতে লাগলো মক্কায় ফেরত পাঠানোর জন্য। আর আবু জানদাল উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, "হে মুসলমানগণ, আমাকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যারা নির্যাতন করছে সেই কুরাইশদের কাছেই কি আমাকে ফেরত পাঠানো হবে?" তার এ আর্তচিৎকারে মুসলমানদের ক্ষোভ আরো বেড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, " হে আবু জানদাল, তুমি সবর কর এবং নিজের অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট থাক। তুমি ও তোমার মত যেসব অসহায় ও নির্যাতিত মুসলমান তোমার সাথে মক্কায় রয়েছে, আল্লাহ তাদের মুক্তির জন্য একটা ব্যবস্থা করে দিবেন। আমরা কুরাইশদের সাথে একটা সন্ধি ও শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছি। এ ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী মেনে আমরা পরস্পরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমরা তাদেরকে দেয়া এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবো না।"

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবু জানদালের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, "হে আবু জানদাল, সবর কর। ওরা তো মুশরিক। ওদের সবার রক্ত কুকুরের রক্তের সমতুল্য।" উমার (রা) একথা বলার পাশাপাশি আবু জানদালের কাছে নিজের তরবারী এগিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আশা করছিলাম যে, আবু জানদাল তরবারী নিয়ে তার পিতাকে হত্যা করে ফেলুক। কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত তার পিতার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ব্যাপারটা ওখানেই থেকে যায়।

দলীলটি লেখার কাজ শেষ হলে মুসলমান ও মুশরিক উভয় পক্ষের অনেকে এর সাক্ষী হলেন। সাক্ষীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবু বাক্র সিদ্দীক (রা), উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল ইবনে আমর, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, মাহমুদ ইবনে মাসলামা, মিকরায ইবনে হাফস ও আলী ইবনে আবু তালিব (রা)। মিকরায তখনো মুশরিক ছিল। আর আলী (রা) ছিলেন দলীলের লেখক।

কুরবানীর উটগুলোকে কিভাবে কুরবানী করে ইহরাম মুক্ত হওয়া যায় সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তিত ছিলেন। তখনো তিনি ইহরাম অবস্থায় নামায আদায় করছিলেন। চুক্তি সই হয়ে গেলে তিনি নিজের কুরবানীর পশুটা কুরবানী করে মাথা মুণ্ডন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সব সাহাবীও কুরবানী করে মাথা মুণ্ডন করলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। মক্কা ও মদীনার মাঝখানে থাকতেই সূরা আল ফাতহ্ নাযিল হলো:

"হে নবী, আমি তোমার জন্য সুস্পষ্ট বিজয়ের উদ্বোধন করেছি, যেন আল্লাহ তোমার আগের ও পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেন, তোমার ওপর তার নিয়ামত পূর্ণ করেন এবং তোমাকে নির্ভুল পথে চালিত করেন।"

আল্লাহ আরো বলেন, "আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই নিরাপদে ও নির্ভয়ে মক্কায় প্রবেশ করবেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে নিরাপদে মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ও ছেঁটে নির্ভীকচিত্তে প্রবেশ করবে। সে (আল্লাহর রাসূল) সেই জিনিস অবগত হয়েছে যা তোমরা অবগত হওনি। ঐ ঘটনার (হুদাইবিয়ার সন্ধির) পরেই নির্ধারিত রেখেছেন আসন্ন বিজয়।"

যুহরী বলেন: পূর্বে ইসলামের যতগুলো বিজয় অর্জিত হয়েছে তার মধ্যে এটিই (হুদাইবিয়ার সন্ধি) ছিল সবচেয়ে বড় বিজয়। আগে মানুষ বিপক্ষের মুখোমুখী হলেই যুদ্ধে লিপ্ত হতো। কিন্তু সন্ধি হলে যুদ্ধের অবসান ঘটলো আর তার ফলশ্রুতিতে লোকজন পরস্পরের সাথে নির্ভয়ে মেলামেশা ও আলাপ আলোচনা করার সুযোগ পেল। ফলে ইসলাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এ সময়ে এমন অবস্থা হলো যে, সামান্য কাণ্ডজ্ঞান ছিলো এমন ব্যক্তির সাথে ইসলাম সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করলেই সে ইসলাম গ্রহণ করতো। সন্ধি পরবর্তী দুই বছরে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের সংখ্যা সন্ধি পূর্ব ইসলাম গ্রহণকারীদের মোট সংখ্যার চেয়ে কম তো নয়ই বরং বেশী।

খাইবার বিজয়:৭ম হিজরী মুহাররম মাস

হুদাইবিয়া থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় যিলহাজ্জ ও মুহাররাম মাসের কিছু অংশ অতিবাহিত করেন। মুশরিকরা এ বছর হজ্জ করেনি। মুহাররামের শেষাংশে তিনি খাইবার অভিযানে বের হন।

আবু মুয়াত্তাব ইবনে আমর (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার পৌঁছে সাহাবীদের বললেন, “থামো।" তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। এরপর বললেন, “হে আল্লাহ, আসমান যমীন ও তার মধ্যে অবস্থিত সবকিছুর অধিপতি, সব শয়তান এবং তারা যত লোককে গুমরাহ করেছে তাদেরও সর্বময় মালিক এবং বাতাস ও তার চালিত, বাহিত ও উৎক্ষিপ্ত জিনিসসমূহের নিরংকুশ প্রভু, আমরা আপনার কাছে এই জনপদ, তার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে সর্বতোভাবে কল্যাণ কামনা করি। আর এই জনপদ ও অধিবাসীদের পক্ষ থেকে সব রকমের অকল্যাণ থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহর নামে তোমরা এগিয়ে যাও।" তিনি প্রতিটি জনপদে প্রবেশকালেই এ কথাগুলো বলতেন।

আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল বেলা ছাড়া কোন জনগোষ্ঠির ওপর আক্রমণ করতেন না। সেখানে আযান শুনলে থেমে যেতেন। আযান না শুনলে আক্রমণ চালাতেন। আমরা রাতের বেলা খাইবারে পৌছে যাত্রাবিরতি করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সেখানে রাত কাটালেন। কিন্তু কোন আযান শুনতে পেলেন না। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে যাত্রা করলেন। আমি আবু তালহার পেছনে সওয়ার হয়েছিলাম। আমার পা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের পা স্পর্শ করছিল। সকাল বেলা খাইবারের শ্রমিকরা কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে দিনের কাজে বেরুচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বাহিনীকে দেখে তারা সবিস্ময়ে বলে উঠলো "সর্বনাশ। মুহাম্মাদ তার বাহিনীসহ হাজির হয়েছে দেখছি"- বলেই তারা পালিয়ে পেছনে ফিরে যেতে লাগলো। সে দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ডাম বললেন, "আল্লাহু আকবার! খাইবারের পতন ঘটেছে। আমরা কোন জনপদে আগমন করলেই তার অধিবাসীর সকাল বেলাটা দুর্ভাগ্যময় হয়ে ওঠে।"

ইবনে ইসহাক বলেনঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে খাইবার যাওয়ার সময় ই'সর পাহাড়ের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য সেখানে একটা মসজিদ তৈরী করা হয়। এরপর যান 'সাহবা'র মধ্য দিয়ে। তারপর তাঁর সমগ্র বাহিনী নিয়ে রাজী উপত্যকায় যাত্রাবিরতি করেন। এখানে তিনি

খাইবারবাসী ও গাতফানীদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন যাতে গাতফানীরা খাইবারবাসীদের সাহায্য করতে না পারে। তারা সব সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে খাইবারের ইয়াহুদীদের সাহায্য করতো।

গাতফানীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের কথা শুনে একদল যোদ্ধা সংগ্রহ করে খাইবারের ইয়াহুদীদের শক্তিবৃদ্ধি করতে অগ্রসর হলো। কিছুদূর গেলেই পেছনে ফেলে আসা তাদের পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের ওপর আপতিত একটা বিপদের শোরগোল শুনতে পেল। তারা ভাবলো, মুসলমানরা হয়তো তাদের পরিবার পরিজনের ওপর ভিন্ন দিক থেকে গিয়ে চড়াও হয়েছে। তাই ফিরে গিয়ে তারা নিজ নিজ পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত হলো এবং খাইবারবাসী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুকাবিলার জন্য ছেড়ে দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রমান্বয়ে খাইবারের ইয়াহুদীদের ধন সম্পদ ও দুর্গসমূহ এক এক করে দখল করতে লাগলেন। তিনি সর্বপ্রথম তাদের 'নায়েম' দুর্গ জয় করেন। এখানে সাহাবী মাহমুদ ইবনে মাসলামা শহীদ হন। তাঁর ওপর গম পিষা যাঁতার পাট ছুড়ে মারা হলে তিনি শহীদ হন। এরপর আবুল হুকাইকের দুর্গ 'কামুস' বিজিত হয়। সেখানে থেকে তিনি কিছুসংখ্যক ইয়াহুদীকে আটক করেন। তাদের মধ্যে হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়া অন্যতম। সে কিনানা ইবনে রাবীর স্ত্রী ছিল। তার দু'জন চাচাতো বোনও গ্রেফতার হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়াকে নিজের জন্য মনোনীত করেন। দাহইয়া ইবন খালীফা কালবী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাফিয়াকে চেয়েছিলেন। তিনি সাফিয়াকে নিজের জন্য গ্রহণ করে নিয়েছিলেন বলে দাহইয়াকে তার চাচাতো বোনকে দিয়ে দেন। ক্রমে খাইবারের গ্রেফতারকৃত লোকদেরকে সাহাবীদের সকলের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

এক এক করে খাইবারের কিল্লাগুলো এবং তাদের ধনসম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্তগত হচ্ছিল। কেবল ওয়াতীহ ও সুলালিম নামক কিল্লা দুটি দখল করা তখনও বাকী ছিল। সবশেষে তিনি এ দুটি কিল্লা জয় করেন। এ দুটিকে তিনি দশদিনের অধিক সময় ধরে অবরোধ করে রাখেন।

ইয়াহুদ নেতা মারহাব অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুকাবিলায় এগিয়ে এসে একটি রণোদ্দীপক কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। কবিতাটি হলোঃ

"সমগ্র খাইবার জানে যে, আমি মারহাব। (অর্থাৎ খুব প্রতাপশালী)

অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে পারদর্শী, অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী বীর।

কখনো এফোঁড় ওফোঁড় করে দিই আবার কখনো শক্ত আঘাত করি।

শার্দুলেরা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে ধেয়ে আসে তখন আমার ধারে কাছেও

কেউ ঘেঁষতে পারে না।"

সে চ্যালেঞ্জ করলো, "এসো আমার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করতে কে প্রস্তুত আছ?" কা'ব ইবনে মালিক (রা) রণসংগীত আবৃত্তি করেই তার জবাবে বললেন,

"খাইবার জানে যে আমি কা'ব। আমি দুঃখ দুর্দশা ঘুচাই, সাহসী ও অনমনীয়।

যখন যুদ্ধ বেঁধে যায় তখন যুদ্ধের পর যুদ্ধই চলতে থাকে।

আমার আছে বিজলীর আলোকচ্ছটার মত ধারালো তরবারীটা।

আমরা তোমাদেরকে পদদলিত করবো যাতে সব জটিলতার অবসান ঘটে।

এতে আমরা পুরস্কৃত হবো অথবা আমাদের কাছে

প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চলে আসবে! (সে সম্পদ আসবে) বজ্রমুষ্ঠির আঘাতে

এবং তাতে কোন তিরস্কারের অবকাশ থাকবে না।"

রাসূলুল্লাহ বললেন, "এই লোকটির সাথে কে লড়তে প্রস্তুত আছে?" মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তার সাথে লড়তে প্রস্তুত আছি। আল্লাহর কসম, আমি ভীষণ লড়াকু। আমি ওর থেকে স্বজন হত্যার প্রতিশোধ নিতে

চাই। গতকাল সে আমার ভাইকে (মাহমুদ ইবনে মাসলামা) হত্যা করেছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যাও। হে আল্লাহ, মারহাবকে পর্যুদস্ত করতে ওকে সাহায্য কর।" অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ও মারহাবের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। একটি পুরনো বৃক্ষ তাদের মাঝখানে আড় হয়ে দাঁড়ালো। উভয়ে পালাক্রমে ঐ গাছের আড়ালে আশ্রয় নিতে লাগলো। এক সময় মারহাবের তরবারী মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার ঢালে আটকে গেল। তৎক্ষণাৎ মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা তরবারীর আঘাতে মারহাবকে হত্যা করলেন।

মারহাব নিহত হলে তার ভাই ইয়াসার হুংকার দিয়ে এগিয়ে এলো। হিশাম ইবনে উরওয়ার মতানুসারে, যুবাইর ইবনুল আওয়াম তার সাথে যুঝতে গেলেন। একথা শুনে তাঁর মাতা সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার পুত্র কি নিহত হবে?" তিনি বললেন, "না, তোমার পুত্র ইনশায়াল্লাহ ইয়াসারকে হত্যা করবে।" যুবাইর সত্যি সত্যিই ইয়াসারকে হত্যা করলেন।

সালামা ইবনে আমর ইবনে আকওয়া বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারে কোন একটি দুর্গ অধিকার করার জন্য আবু বাক্র সিদ্দীককে (রা) পতাকা দিয়ে পাঠালেন। তিনি যুদ্ধ করলেন। অনেক চেষ্টা করেও তিনি দুর্গ জয় করতে না পেরে ফিরে এলেন। পরদিন উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) পাঠালেন। তিনিও তুমুল যুদ্ধ করলেন। কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কাল সকালে আমি এমন একজনকে পতাকা দেবো যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তার হাতেই দুর্গ জয় করাবেন। তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে কখনো পালাবার মত লোক না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে (রা) ডাকলেন। তিনি তখন চক্ষুরোগে ভুগছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চোখে থু থু দিলেন এবং বললেন, "এই পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাও। আল্লাহ যতক্ষণ তোমার হাতে বিজয় না দেন ততক্ষণ লড়াই করে যাও।"

সালামা বলেন: তিনি এগিয়ে গেলেন। শত্রুকে কাবু করার মত প্রচণ্ড বলবীর্য ও পরাক্রম ছিল তাঁর। তিনি শুধু হেলেদুলে পাঁয়তারা দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। আমরা তাঁর পেছনে তাঁর অনুসরণ করছিলাম। তিনি কিল্লার নীচে একটা পাথর স্তূপের মধ্যে পতাকা স্থাপন করলেন। ওপর থেকে একজন ইয়াহুদী তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কে?" তিনি বললেন, "আমি আবু তালিবের পুত্র আলী।" ইয়াহুদী বললো, "তাওরাতের শপথ! তোমরা বিজয়ী হয়েছো।" অবশেষে আল্লাহ আলীর হাতেই বিজয় দান করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারবাসীকে তাদের দুই দুর্গ ওয়াতীহ ও সুলালিমে অবরোধ করলেন। যখন তারা নিশ্চিতভাবে বুঝলো যে, মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় নেই তখন তারা তাঁর কাছে প্রাণভিক্ষা চাইল এবং খাইবার থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করার প্রস্তাব দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রস্তাব মেনে নিলেন ও প্রাণভিক্ষা দিলেন। ইতিপূর্বেই তিনি তাদের আশ্ শাক্ক আন্ নাতাহাহ ও আল কুতাইবার ভূমিসহ সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পদ এবং ঐ দুটি দুর্গ ছাড়া সকল দুর্গ অধিকার করে নিয়েছিলেন। ফাদাকবাসী সমস্ত খবর জানতে পারলো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের প্রাণভিক্ষা দিয়ে বিতাড়িত করণ এবং জমিজমা ও ধনসম্পদ হস্তগত করার অনুরোধ জানালো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুরোধ গ্রহণ করলেন। ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে যারা এই অনুরোধ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়েছিল তাদের মধ্যে মুহাইসা ইবনে মাসউদ ছিলো অন্যতম। সে ছিল বনু হারেসার লোক। খাইবারবাসী এই ব্যবস্থা প্রথমে মেনে নেয়। কিন্তু পরে অনুরোধ করে যে, আমাদেরকে বহিষ্কার না করে অর্ধেক বর্গাভাগের ভিত্তিতে জমি চাষের কাজে নিয়োজিত করুন। তারা যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলে যে, এখানকার জমিজমা আমরাই ভাল আবাদ করতে সক্ষম এবং এ কাজে আমরাই সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রস্তাব মঞ্জুর করে তাদের সাথে আপোষরফা করলেন। তবে শর্ত আরোপ করলেন যে, আমরা ইচ্ছা করলেই তোমাদেরকে উচ্ছেদ করার অধিকার আমাদের থাকবে। ফাদাকবাসীও এই শর্তে তাঁর সাথে আপোষ করলো। এভাবে খাইবার মুসলমানদের যৌথ সম্পদ এবং ফাদাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হলো। কেননা ফাদাক জয় করতে সামরিক অভিযানের প্রয়োজন পড়েনি।এসব আপোষরফার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ঠিক তখনই সাল্লাম ইবনে মুসকামের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারেস তাঁকে একটি ভুনা বকরী উপহার দিল। ভুনা ছাগলটি পাঠানোর আগে সে জিজ্ঞেস করে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর কোন অংশ খেতে বেশী পছন্দ করেন?" তাকে জানানো হলো যে, তিনি উরু বা রানের গোশত বেশী পছন্দ করেন। তখন সে উরুতে বেশী করে বিষ মিশিয়ে দেয়। অতঃপর পুরো ছাগলটিকে সে বিষাক্ত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসে। তা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক টুকরো গোশ্ত চিবালেন কিন্তু গিললেন না। সাহাবী বিশর ইবনে বারা ইবনে মা'রুরও তাঁর সাথে বসে খাচ্ছিলেন। বিশরও এক টুকরো গোশ্ত মুখে নিয়ে চিবালেন। তিনি গিলে ফেললেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উগরিয়ে ফেলে দিলেন। তিনি বললেন, "এই হাড্ডিটা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তা বিষাক্ত।" অতঃপর তিনি মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। সে স্বীকারোক্তি করলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলন, "এমন কাজ কেন করলে?" সে বললো, "আপনি আমার কওমের সাথে কি আচরণ করেছেন তা আপনার জানা আছে। আমি ভাবলাম আপনাকে এভাবে বিষ খাওয়াবো। আপনি যদি কোন রাজা-বাদশাহ হয়ে থাকেন তাহলে আপনার হাত থেকে উদ্ধার পাবো আর যদি নবী হয়ে থাকেন তাহলে তো আপনাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) সাবধান করে দেয়া হবে।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাফ করে দিলেন। কিন্তু বিশর যে টুকরাটি খেয়েছিলেন তাতেই তিনি মারা গেলেন।

খাইবার বিজয় সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদিউল কুরাতে চলে গেলেন। সেখানকার অধিবাসীদের কয়েকদিন অবরোধ করে রাখলেন, অতঃপর মদীনা চলে গেলেন।

খাইবার কিংবা পথিমধ্যে কোন এক জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়ার সাথে বাসর রাত কাটান। আনাস ইবনে মালিকের (রা) মা উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান সাফিয়াকে বধূর বেশে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গম্বুজ সদৃশ একটি তাঁবুতে তাকে নিয়ে বাসর রাত যাপন করলেন। এদিকে আবু আইয়ূব খালিদ ইবনে যায়িদ (রা) উন্মুক্ত তরবারী হাতে নিয়ে সারারাত জেগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাহারা দিলেন। সারারাত তিনি তাঁবু গৃহের চারপাশে টহল দেন। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি আবু আইয়ূব।" তিনি জবাব দিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই মহিলার পক্ষ থেকে আপনার ওপর কোন বিপদ আসে এই আশংকায় আমি পাহারা দিচ্ছিলাম। কেননা তার পিতা, স্বামী ও গোত্রের অন্যান্য লোকজনকে আপনি হত্যা করিয়েছেন। তাছাড়া সে সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই তার দিক থেকে আপনার ওপর বিপদের আশংকা করেছিলাম।" অনেকে বলেন : একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, “হে আল্লাহ, আবু আইয়ূব যেভাবে সারারাত আমার হিফাজতে নিয়োজিত ছিল তেমনি আপনিও তাকে হিফাজত করুন।" খাইবার থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাত্রাবিরতি করেন। শেষ রাতে তিনি বললেন, "আমরা যাতে এখন ঘুমাতে পারি

সেজন্য ফজরের সময় আমাদের ডেকে দেয়ার দায়িত্ব কে নিতে পারে?” বিলাল (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এ দায়িত্ব নিতে পারি।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সহগামী মুসলমানগণ যাত্রাবিরতি করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতে বিলাল (রা) নামায পড়তে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ নামায পড়ার পর তিনি উটের গায়ে হেলান দিয়ে প্রভাত হবার প্রতীক্ষায় বসে রইলেন। এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিম মুজাহিদগণ যথাসময়ে ঘুম থেকে জাগতে সক্ষম হলেন না। তপ্ত রোদের পরশ লাগার সাথে সাথেই তাদের ঘুম ভাংলো। প্রথমেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম জেগে উঠলেন। উঠেই তিনি বিলালকে (রা) বললেন, "বিলাল, তুমি আজ এ কি করলে?" তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, যে ঘুমে আপনাকে ধরেছিল সেই ঘুমের কাছে আমিও পরাভূত হয়েছি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছো।" এরপর তিনি নিজের উট নিয়ে অল্প কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। অতঃপর উট থামিয়ে তিনি অযু করলেন। সাহাবাগণও অযু করলেন। তারপর বিলালকে নামায শুরু করার জন্য ইকামাত দিতে বললেন। তিনি ইকামাত বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি সাহাবীদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা কখনো নামায পড়তে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই পড়ে নেবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, "আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম কর।"

খাইবার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে লুকাইম আবাসীকে (রা) খাইবারের যাবতীয় মুরগী ও গৃহপালিত প্রাণী পুষতে দিয়েছিলেন। সফর মাসে খাইবার বিজয় সম্পন্ন হয়। ইবনে লুকাইম খাইবার সম্পর্কে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন যা নিম্নরূপ:

"এক দুরুন্ত দুঃসাহসী সাদা বেশধারী সেনাদল পরিবেষ্টিত নবী কর্তৃক

নাতা আক্রান্ত হলো,

নাতাবাসী যখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো

এবং আসলাম ও গিফার গোত্রদ্বয়ও তার মাঝে বিছিন্ন হলো

তখন তারা নিশ্চিত হলো পরাজয় সম্পর্কে।

বনু আমর ইবনে জুরআর লোকেরা প্রভাতকালেই দেখতে পেল,

আশ্ শাক্-এর অধিবাসী দিনের বেলাতেই ঘোর অন্ধকারে পতিত হয়েছে। তার সমগ্র সমভূমি জুড়ে দৌড়ে গেছে ধ্বংস ও মৃত্যু।

প্রত্যুষে চিৎকারকারী মোরগগুলো ছাড়া কোন কিছুকেই তা অবশিষ্ট রাখেনি।

আর প্রতিটি দুর্গকে অধিকার করেছে আবদ আশহাল কিংবা বনু নাজ্জারের অশ্বারোহীগণ। (আনসার দের দুই গোত্রের নাম।)
আর মুহাজির যারা শিরস্ত্রাণের ওপর দিয়ে তাদের কপালকে উন্মুক্ত করেছে-যারা পালানোর কথা চিন্তাও করতে পারে না।

আমি জানতাম, মুহাম্মাদ অবশ্যই জয়লাভ করবে এবং

যুগ যুগ ধরে সেখানে অবস্থান করবে।

সেই দিনের চিৎকারে হুংকারে ইহুদীদের চোখে খুলে গেছে।”

মক্কা বিজয়:৮ম হিজরী রমযান মাস

মৃতার যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাদিউস সানী ও রজব মাস মদীনায় অবস্থান করেন।

এই সময় বনু বকর বনু খযায়া গোত্রের ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের কারণ ছিল ইসলাম আগমনের পূর্বে বনু হাদরামী গোত্রের মালিক ইবনে আব্বাদ নামক এক ব্যক্তি ব্যবসা উপলক্ষে খযায়া গোত্রের বসতিস্থল অতিক্রম করার সময় তাদের লোকেরা তাকে হত্যা করে এবং তার কাছে যা কিছু ছিল ছিনিয়ে নেয়।

এর ফলে বনু বকর জনৈক খযায়ীর ওপর চড়াও হয়ে তাকে হত্যা করে। এর প্রতিশোধে খুযায়া গোত্র ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে বনু বকরের একাংশ বনু দায়েলের সরদার আসওয়াদের তিন সন্তান সালমা, কুলসুম ও যুয়াইবকে হারাম শরীফের সীমানার কাছে হত্যা করে। কেননা আসওয়াদ ছিল হাদরামীর মিত্র। এই বিষয় নিয়ে বনু বকর ও বনু খুযায়ার মধ্যে তুমুল উত্তেজনা চলে আসছিল। ইসলামের অভ্যুদয় ঘটার ফলে উভয় গোত্রের এই উত্তেজনা স্তিমিত হয় এবং তাদের মনোযোগ চলে যায় ইসলামের দিকে।

কুরাইশগণ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সম্পাদিত হুদাইবিয়ার সন্ধিতে একটি শর্ত ছিল এই যে, কোন তৃতীয় পক্ষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা কুরাইশদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করতে পারবে। তদনুযায়ী বনু বকর কুরাইশদের এবং বনু খুযায়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিত্রতার ঘোষণা করে।

চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর বনু বকরের শাখা বনু দায়েল বনু খুযায়ার দ্বারা আসওয়াদের উক্ত তিন সন্তানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের মোক্ষম সুযোগ পেয়েছে বলে মনে করে। তাই বনু দায়েল পরিবারের প্রধান নাওফেল ইবনে মুয়াবিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। উল্লেখ্য যে, এই লোকটির গোটা বনু বকরের ওপর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। একদিন রাত্রে খুযায়া গোত্রের লোকেরা তাদের নিজস্ব ঝর্ণা ওয়াতীরে অবস্থানকালে নাওফেল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে খুযায়ীদের একজনকে হত্যা করলো। আর যায় কোথায়। উভয় গোত্র অন্যান্য গোত্রের সাথে দল পাকিয়ে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলো। কুরাইশরা এই সময় বনু বকরকে অস্ত্র দিল এবং তাদের সহযোগিতায় কুরাইশদের অনেকেই রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে খুযায়ীদের সাথে যুদ্ধ করলো। দিশেহারা হয়ে খুযায়া গোত্র মসজিদুল হারামের নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয় নিল। নাওফেলের নেতৃত্বে প্রতিহিংসাপরায়ণ দায়েল গোত্রের লোকেরা তাদের ধাওয়া করে হারাম শরীফ পর্যন্ত

এলো। বনু বকরের লোকেরা নাওফেলকে বললো, "হে নাওফেল, এবার থামো। আমরা এখন হারাম শরীফের অভ্যন্তরে আছি। খোদাকে ভয় কর।"

তখন নাওফেল একটা সাংঘাতিক কথা বলে বসলো। সে বললো, "আজকে তার কোন ইলাহ বা প্রভু নেই। হে বনু বকর, তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর। তোমরা তো হারাম শরীফে চুরি করতেও কুণ্ঠিত হও না। (উল্লেখ্য যে, কা'বা শরীফের সোনার তৈরী বহু মূল্যবান মূর্তি চুরি করার অভিযোগ কুরাইশদের বিরুদ্ধে ছিল।) এখন এখানে প্রতিশোধ নিতে কুণ্ঠিত হও কেন?" ইতিপূর্বে ওয়াতীর ঝর্ণার কাছে রাতের আঁধারে 'মুনাব্বিহ' নামক জনৈক দুর্বলচিত্ত খুযায়ীকে হত্যা করেও তাদের পিপাসা মেটেনি। মুনাব্বিহ তামীম ইবনে আসাদ নামক তার গোত্রের অপর এক ব্যক্তিকে সাথে করে বেরিয়েছিল। মুনাব্বিহ বললো, "হে তামীম, তুমি নিজেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর। আমি তো মরতেই যাচ্ছি। তারা আমাকে হয় হত্যা করবে নয় ছেড়ে দেবে।" তামীম সেখান থেকে পালিয়ে গেল আর তারা মুনাব্বিহকে হত্যা করলো।

খুযায়ার লোকেরা মক্কায় তাদের এক মিত্র বুদাইল ইবনে ওয়ারাকার সাবেক এক গোলাম রাফের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়া সত্ত্বেও বনু বকর ও কুরাইশদের মিলিত আক্রমণে খুযায়ার অনেকেই প্রাণ হারায়। এভাবে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিত্র বনু খুযায়াকে হারাম শরীফের নিষিদ্ধ স্থানে হত্যা করে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে। এরপর আমর ইবনে সালেম খুযায়ী ও বনু কা'বের এক ব্যক্তি মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে সব ঘটনা বিবৃত করে। এই ঘটনা ছিল মক্কা বিজয়ের অন্যতম কারণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসে ছিলেন তখন সে সেখানে গিয়ে উপনীত হয় এবং একটি কবিতা আবৃত্তি করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে। কবিতাটির মর্ম এইঃ সসাগামর দুই নদী কার্যওি উকন্দী

"হে প্রভু! আমি মুহাম্মাদের নিকট আমাদের পিতা ও তাঁর পিতার পুরানো মৈত্রীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ও তা কার্যকরী করার অনুরোধ জানাই। তোমরা সন্তান ছিলে। আর আমরা পিতা ছিলাম। সেখানে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তা ত্যাগ করিনি। আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমাদেরকে অবিলম্বে সাহায্য কর। আর আল্লাহর বান্দাদেরকে আহ্বান কর যেন সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন যিনি (চুক্তি থেকে) বিছিন্ন হয়ে রয়েছেন। তাকে যদি আবমাননা করা হয় তাহলে তাঁর মুখে কলংক লেপন করা হবে। তিনি রয়েছেন এমন একটি বাহিনীর সঙ্গে যা সমুদ্রের মত ফেনারাশি নিয়ে প্রবাহিত। (জেনে রাখ) কুরাইশরা তোমার চুক্তি ভঙ্গ করেছে। তারা তোমার সন্ধি লংঘন করেছে এবং কাদা নামক স্থানে আমার জন্য গুপ্ত ঘাঁটি স্থাপন করেছে। তারা মনে করেছে, আমি ডাকবো এমন কোন মিত্র আমার নেই। অথচ তারা সংখ্যায় অল্প ও শক্তিতে অপেক্ষাকৃত

হীনবল। তারা আল ওয়াতীরে গোপন রাত্রি যাপন করেছে এবং নামায পড়া অবস্থায় আমাদের লোকদেরকে হত্যা করেছে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাহিনী শুনে বললেন, "হে আমর, তোমাকে সাহায্য করা হবে।" এর অব্যবহিত পর তিনি আকাশে এক খণ্ড মেঘ দেখে বললেন, "এই মেঘখণ্ডটিই বনু কা'বের সাহায্যের সূচনা করবে।"

এরপর বুদাইল বিন ওয়ারাকা বনু খুযায়ার কতিপয় লোককে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলো। তাঁকে তাদের বিপদ মুসিবতের কথা এবং কুরাইশরা বনু বকরকে তাদের ওপর লেলিয়ে দিয়ে যে নির্যাতন চালাচ্ছে তার কথা অবহিত করলো। অতঃপর মক্কায় ফিরে গেল। তার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে জানালেন, "তোমরা ধরে নিতে পার যে, আবু সুফিয়ান তোমাদের কাছে এসেছে এবং সন্ধি চুক্তি অলংঘনীয় করা ও তার মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দিয়েছে।"

বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা ও তার সাথীরা মক্কায় ফিরে যাওয়ার সময় উসফানে আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের সাথে তাদের সাক্ষাত হলো। কুরাইশরা তাকে রাসূলুল্লাহর নিকট সন্ধি চুক্তিকে অলংঘনীয় ও তার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য পাঠিয়েছে। কেননা তারা বনু খুযায়ার সাথে যে আচরণ করেছে তাতে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আবু সুফিয়ান বুদাইল ইবনে ওয়ারাকার সাথে দেখা হওয়া মাত্রই তাকে জিজ্ঞেস করলো, "বুদাইল, তুমি কোথা থেকে আসছো?" সে ধারণা করেছিল যে, বুদাইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই গিয়েছিল। বুদাইল জবাব দিল, "এই এলাকায় বন্ধু খুযায়ার লোকদের সাথে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম।" আবু সুফিয়ান বললো, "তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাওনি?" সে বললো, 'না।' বুদাইল মক্কা চলে গেলে আবু সুফিয়ান বুদাইলের উট থামানোর জায়গায় গিয়ে তার গোবর পরীক্ষা করলো। গোবরের মধ্যে খেজুরের আটি দেখে বললো, "নিশ্চয়ই বুদাইল মুহাম্মাদের নিকট গিয়েছিল।" খেজুরের আটিকে সে তার মদীনায় যাওয়ার আলামত হিসেবে গণ্য করলো।

তারপর আবু সুফিয়ান রওনা হয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে নিজের কন্যা উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবার কাছে গেল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় বসার উপক্রম করতেই উম্মে হাবীবা বিছানা গুটিয়ে ফেললেন। তা দেখে আবু সুফিয়ান বললো, "হে আমার কন্যা, তুমি কি আমাকে ঐ বিছানায় বসার যোগ্য মনে করনি?" উম্মে হাবীবা বললেন, "ওটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা। আর আপনি একজন মুশরিক, অপবিত্র। আমি চাই না যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের বিছানায় বসেন।" আবু সুফিয়ান বললো, "হে আমার কন্যা, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার পর তুমি খারাপ হয়ে গিয়েছো।"

আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হলো এবং কথা বললো। কিন্তু তিনি তার কোন কথার জবাব দিলেন না। অতঃপর সে আবু বাক্রের (রা) নিকট গিয়ে এ মর্মে অনুরোধ করলো যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার সম্পর্কে সুফারিশ করেন। আবু বাক্র (রা) এ অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন।

অতঃপর সে উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) নিকট গিয়ে অনুরূপ অনুরোধ করলো। উমার বললেন, "কি বলছো! আমি তোমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সুপারিশ করবো? আমি যদি ছোট পিঁপড়ে ছাড়া কোন সহযোগী না পাই তবুও তোমার সাথে লড়াই করবো?"
এরপর সে আলী ইবনে আবু তালিবের (রা) নিকট গেল। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা) ছিলেন। তাঁর সামনে শিশু হাসান (রা) হামাগুড়ি দিচ্ছিলো। সে বললো, "হে আলী, তুমি আমার প্রতি সর্বাধিক দয়ালু। আমি তোমার কাছে এসেছি একটা বিশেষ প্রয়োজনে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে চাই না। কাজেই তুমি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সুপারিশ কর।" তিনি বললেন, "ধিক্ তোমাকে হে আবু সুফিয়ান। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা ব্যাপারে সংকল্প গ্রহণ করেছেন, আমরা সে সম্পর্কে তাঁর সাথে কথা বলতে অক্ষম।"

অনন্যোপায় হয়ে আবু সুফিয়ান ফাতিমার (রা) দিকে তাকালো। বললো, "হে মুহাম্মদের কন্যা! তুমি কি এটা পছন্দ কর যে, তোমার এই শিশু পুত্র লোকজনকে রক্ষা করার নির্দেশ দেবে আর তার ফলে সে চিরকালের জন্য আরবের নেতা হয়ে থাকবে?" ফাতিমা (রা) বললেন, "আমার ঐ ছেলে লোকজনকে রক্ষা করার যোগ্য হয়নি। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না।" আজো ম

আবু সুফিয়ান বললো, "হে আলী! আমি দেখছি পরিস্থিতি আমার প্রতিকূল। এখন আমাকে একটা সদুপদেশ দাও।" আলী (রা) বললেন, "তোমার উপকারে আসবে এমন কোন উপদেশ আমার জানা নেই। তবে তুমি তো বনু কিনানা গোত্রের নেতা। তুমি যাও, লোকজনকে রক্ষা কর। অতঃপর তোমার জন্মস্থানে অবস্থান করতে থাক।" সে বললো, "এতে আমার শেষ রক্ষা হবে তো?" আলী (রা) বললেন, "তা আমার মনে হয় না। তবে এ ছাড়া তোমার জন্য আর কোন উপায়ও দেখছি না।" মোনাজাতের

অতঃপর আবু সুফিয়ান মসজিদে গিয়ে ঘোষণা করলো, "হে জনতা! আমি সকল মক্কাবাসীর রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছি।" এই বলেই সে উটে চড়ে প্রস্থান করলো। কুরাইশদের কাছে গেলে তারা জিজ্ঞেস করলো, "কি করে এসেছো?" সে বললো, "মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে কথা বললাম। সে কোন কথারই জবাব দিল না। তারপর আবু বারের কাছে গেলাম। সেও কোন আশাপ্রদ কথা বললো না। তারপর গেলাম উমারের কাছে। তাকে সবচেয়ে কট্টর দুশমন পেলাম। তারপর আলীর সাথে দেখা করতে গেলাম। তাকে সবার চাইতে নমনীয় মনে হলো। আলী আমাকে একটা কাজ করার পরামর্শ দিয়েছে। সে কাজ আমি করেছি। জানি না তাতে কিছু হবে কি না।"

সবাই বললো, "আলী তোমাকে কি করতে বলেছে?" আবু সুফিয়ান বললো, "সে আমাকে বলেছিল মক্কাবাসীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে। সেটা আমি ঘোষণা দিয়ে এসেছি।" জনতা বললো, "মুহাম্মাদ কি তোমাকে এ কাজ করার অনুমতি দিয়েছে?" সে বললো, 'না।' জনতা বললো, "তাহলে আলী তোমার সাথে তামাশা করেছে মাত্র। এ তোমার কোন উপকারে আসবে না।" সে বললো, "কিন্তু এছাড়া আমার কোন গত্যন্তর ছিল না।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনস্থ সকল মুসলমান এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। আবু বাকর (রা) তাঁর কন্যা আয়িশার (রা) কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি জিনিসপত্র গোছগাছ করছেন। তা দেখে তিনি বললেন, "হে আয়িশা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন?" আয়িশা (রা) বললেন, "ই। আব্বা, আপনিও প্রস্তুতি নিন।" আবু বাকর বললেন, "তিনি কোথায় যেতে মনস্থ করেছেন বলে মনে কর।" আয়িশা বললেন, "জানি না।" এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি মক্কা অভিমুখে যাত্রা করতে যাচ্ছেন। তিনি তাদেরকে সফরের জন্য তৈরী হতে বললেন। তিনি আরও বললেন, "হে আল্লাহ! কুরাইশদের থেকে আমাদের প্রস্তুতির যাবতীয় খবর গোপন রাখুন যাতে আমরা তাদের ওপর আকস্মিকভাবে গিয়ে চড়াও হতে পারি।" মুসলমানগণ অল্পক্ষণের মধ্যেই তৈরী হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিযানে রওনা হওয়ার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছেন এমন সময় সাহাবী হাতিব ইবনে আবু বালতায়া (রা) জনৈক মহিলার মাধ্যমে কুরাইশদের কাছে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিতে জানিয়ে দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিযানে যাওয়ার আয়োজন করেছেন। মহিলা চিঠিটা তার খোঁপার মধ্যে লুকিয়ে রওয়ানা হলো। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাতিবের কারসাজির রহস্য ফাঁস করে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আলী

ইবনে আবু তালিব (রা) ও যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে (রা) এই বলে পাঠিয়ে দিলেন যে, "তোমরা পথিমধ্যে সেই মহিলাকে পাকড়াও করবে এবং তার কাছে থেকে হাতিবের চিঠি উদ্ধার করে নিয়ে আসবে- যাতে হাতিব মক্কাবাসীকে আমাদের অভিযান প্রস্তুতির সব খবর জানিয়ে সাবধান করে দিয়েছে।" তাঁরা উভয়ে রওনা হয়ে গেলেন এবং খালীফা নামক স্থানে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন। তারা তাকে উট থেকে নামিয়ে তার উটের হাওদার মধ্যে চিঠির সন্ধান করলেন। কিন্তু পেলেন না। আলী (রা) বললেন, "আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মিথ্যা হতে পারে না এবং আমরাও মিথ্যা বলছি না। এই চিঠি বের করে দাও, নচেত আমরা তোমার দেহ তল্লাশী করবো।"বশাল

মহিলা যখন দেখলো আলী (রা) নাছোড়বান্দা, তখন সে বললো, "তুমি অন্য দিকে মুখ ফিরাও।" তিনি মুখ ফিরালেন। মহিলা নিজের খোঁপা খুলে চিঠি বের করলো। আলী (রা) ও যুবাইর (রা) চিঠি নিয়ে রাসূলুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতিবকে ডেকে তার চিঠি পাঠানোর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হাতিব বললেন, "আল্লাহর কসম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি আমার ঈমানে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন আসেনি। মক্কায় আমার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। অথচ কুরাইশদের মধ্যে আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি রয়েছে। তাই এভাবে আমি তাদের সহানুভূতি লাভ করতে চেয়েছি।"

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে মুনাফেকী করেছে। আমাকে অনুমতি দিন তার ঘাড় কেটে ফেলি।" লোখানাকে তীক্যান্ডাল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে উমার, তোমার তো জানা নেই। এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে বদরের দিন বলে দিয়েছেন যে, তোমরা যা খুশী কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম।"

আল্লাহ তায়ালা হাতিব সম্পর্কে সূরা মুমতাহিনায় আয়াত নাযিল করলেন "হে মুমিনগণ। যারা আমার ও তোমাদের শত্রু তাদের প্রতি দরদ ও ভালোবাসা দেখিয়ে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে পেতে চেয়ো না।........ ইবরাহীম ও তার সহচরদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। সে তার জাতিকে বলেছিলো, আমরা তোমাদের ও আল্লাহ ছাড়া আর যাদের তোমরা দাসত্ব করছো পরোয়া করি না। আমরা তোমাদের সম্পর্ককে অস্বীকার করলাম। আর আমাদের ও তোমাদের মাঝে স্থায়ী শত্রুতার উদ্ভব হয়েছে যতক্ষণ না তোমরা একমাত্র আল্লাহকে মা'বুদ বলে মেনে নাও।"

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিযানে রওনা হলেন। এ সময় আবু বুরহুম গিফারীকে মদীনায় তাঁর খলিফা নিয়োগ করলেন। রমযানের দশ দিন অতিবাহিত হবার পর তিনি যাত্রা করলেন। তিনি নিজে এবং মুসলমানগণ সকলেই রোযা রাখলেন। উসফান ও আমাজের মধ্যবর্তী কুদাইদ নামক স্থানে পৌঁছলে সকলে ইফতার করলেন।

এখান থেকে দশ হাজার মুসলমানকে সাথে নিয়ে তিনি আবার রওনা করলেন এবং মাররুয যাহরানে পৌছে যাত্রাবিরতি করলেন। পথিমধ্যে বনু সুলাইমের সাতশ' মতান্তরে এক হাজার ও বনু মুযাইনার এক হাজার লোক তাঁর সাথে যোগ দিল। এ সময় আরবে এমন কোন গোত্র ছিল না যার বেশ কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি। মুহাজির ও আনসারদের সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং কোন একজনও পিছপা হননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাররুয যাহরানে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলেন। তখনো পর্যন্ত কুরাইশরা তাঁর যাত্রা বা তিনি কি করতে যাচ্ছেন তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি। ঐ সময় এক রাতে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হাকীম ইবনে হিযাম ও বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করতে বের হলো। পথিমধ্যে কোন এক জায়গায় আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করেছিলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ও আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া ইবনে মুগীরা পথিমধ্যে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) নাইফুল উকাব নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে উপনীত হলো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লামের সাক্ষাতপ্রার্থী হলে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার চাচাতো ভাই ও শ্যালক এসেছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ওদের দিয়ে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার চাচাতো ভাই তো আমাকে অপমান করেছে। আর আমার শ্যালক (আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া উম্মে সালামার সৎ ভাই) মক্কায় অবস্থানকালে আমার চরম বিরোধিতা করেছে।"

তারা যখন উভয়ে এই জবাব পেলো তখন আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস বললো, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে সাক্ষাত করার সুযোগ না দেন তাহলে আমি আমার এই ছেলে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে একদিকে চলে যাবো এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় ধুঁকে ধুঁকে মরবো।"

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন বিগলিত হলো। তিনি অনুমতি দিলেন। তখন তারা উভয়ে তাঁর কাছে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাররুয যাহরানে যাত্রাবিরতি করলে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব প্রমাদ গুনলেন। তিনি বুঝলেন যে, কুরাইশরা যদি স্ব উদ্যোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সন্ধি না করে এবং তিনি যদি জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেন তাহলে কুরাইশরা চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে।

আব্বাস (রা) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদা খচ্চরটিতে আরোহণ করে আরাক নামক স্থানে এসে খোঁজ করতে লাগলাম কোন কাঠুরিয়া, দুধওয়ালা কিংবা আর কোন লোক মক্কায় যায় কিনা। তাহলে বলবো মক্কাবাসীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের খবর দিতে যাতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করার আগে তাঁর কাছে এসে সন্ধি করে।

আমি এই অনুসন্ধানের কাজে ব্যাপৃত ছিলাম। ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ান ও বুদাইল ইবনে ওয়ারাকার কথাবার্তা শুনতে পেলাম। তারা উভয়ে কথাবার্তা বলছিল। আবু সুফিয়ান বলছিল, "গতরাত্রে আমি যে রকম আগুন দেখলাম এমন আগুন আর কখনো দেখিনি এবং এত বড় বাহিনীও আর কখনো দেখিনি।" বুদাইল বলছিল, "এটা নিশ্চয়ই খুযায়া গোত্রের বাহিনী। তারা নিশ্চয়ই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে।" আবু সুফিয়ান জবাব দিল, "খুযায়ার এত প্রতাপ ও জনবল নেই যে, এত আগুন জ্বালাবে এবং এত বড় বাহিনীর সমাবেশ ঘটাবে।" আমি আবু সুফিয়ানের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বললাম, "ওহে আবু সুফিয়ান!" সে বললো, "কে আব্বাস নাকি?" আমি বললাম, 'হাঁ'! সে বললো, “খবর কি?" আমি বললাম, "তুমি জান না? এই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বাহিনী। আল্লাহর শপথ! কুরাইশদের জীবন বিপন্ন।" সে বললো, "তাহলে এখন উপায় কি?” আমি বললাম, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তোমাকে হাতে পান তাহলে খুন করে ফেলবেন। অতএব এই খচ্চরের পেছনে ওঠো। আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গিয়ে তোমার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।"

অতঃপর সে আমার পেছনে চড়ে বসলো। আর তার সঙ্গীদ্বয় ফিরে গেল। আবু সুফিয়ানকে নিয়ে আমি মুসলিম বাহিনীর এক এক অগ্নিকুণ্ডের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। সবাই বলছিলো, "এ কে?" কিন্তু একবার নজর বুলিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চরে আমাকে আরোহী দেখে প্রত্যেকেই শান্ত হয়ে যাচ্ছিল। আমার পেছনে যে আবু সুফিয়ান রয়েছে তা কেউ লক্ষ্য করছিল না।

উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) সামনে দিয়ে যখন অতিক্রম করলাম তখন তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। পেছনে আবু সুফিয়ানকে বসা দেখে বললেন, "আল্লাহর শত্রু আবু সুফিয়ান!

আল্লাহর শুকরিয়া যে, কোন চুক্তি ছাড়াই তোমাকে আমাদের হস্তগত করে দিয়েছেন।” একথা বলেই তিনি দৌড়ে চললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। এদিকে আমিও দ্রুত ছুটলাম। উমার ও খচ্চর কেউই তেমন দ্রুতগামী ছিল না। তথাপি খচ্চর একটু আগে গেল। খচ্চর থেকে নেমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে উমার (রা)ও গেলেন সেখানে। তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ। এই যে আবু সুফিয়ান। আল্লাহ ওকে অনায়াসেই জুটিয়ে দিয়েছেন। ওর সাথে আমাদের কোন চুক্তিও হয়নি। সুতরাং আমাকে অনুমতি দিন ওর গর্দান উড়িয়ে দিই।"

আমি বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ওকে আশ্রয় দিয়েছি।" অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসলাম এবং তার মাথা আকর্ষণ করে বললাম, "আল্লাহর কসম, আজ রাতে ওকে আমি ছাড়া কারো সাথে একা থাকতে দেব না।"

উমার (রা) আবু সুফিয়ান সম্পর্কে অনেক কথা বলতে লাগলেন। তা শুনে আমি বললাম, "চুপ কর, উমার। আবু সুফিয়ান বনু কা'ব গোত্রের লোক হলে বিনু কা'ব উমার (রা)-এর গোত্র) তুমি এ রকম বলতে না। বনু আবদ মানাফের লোক বলেই তুমি এ রকম বলছো।"

উমার বললেন, "আব্বাস! আপনি এ রকম কথা বলবেন না। আমার পিতা যদি ইসলাম গ্রহণ করতেন তবে তাঁর ইসলামের চাইতে আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে অনেক বেশী প্রিয়।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আব্বাস, আবু সুফিয়ানকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। সকালে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

আমি আবু সুফিয়ানকে নিয়ে গেলাম। রাত্রে সে আমার কাছে থাকলো। সকাল বেলা তাকে নিয়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আবু সুফিয়ান, ধিক্ তোমাকে! আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই একথা মেনে নেয়ার সময় কি তোমার এখনো হয়নি?" সে বললো, "আপনার উদারতা, মহত্ত্ব, স্বজনবাৎসল্য অতুলনীয়। আমার ধারণা, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ যদি থাকতো তাহলে এতদিনে আমাকে সাহায্য করতো।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, "হে আবু সুফিয়ান, ধিক্ তোমাকে! আমি যে আল্লাহর রাসূল, তা কি এখন পর্যন্ত তুমি উপলব্ধি করনি?" আবু সুফিয়ান বললো, "আপনার জন্য আমার মাতাপিতা উৎসর্গ হোক! আপনি এত উদার, সহনশীল এবং আত্মীয় সমাদরকারী যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না। তবে আপনার রাসূল হওয়া সম্পর্কে আমার এখনো কিছু দ্বিধা-সংশয় রয়েছে।" আব্বাস তখন বললেন, "ধিক্ তোমাকে! ইসলাম গ্রহণ কর এবং সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া

আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল। নচেত এক্ষুণি তোমার গর্দান মারা হবে।"স

আবু সুফিয়ান সত্যের সাক্ষ্য দিল এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। অতঃপর আব্বাস (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু সুফিয়ান একটু মর্যাদালোভী। কাজেই তাকে গৌরবজনক একটা কিছু দিন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বেশ, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। যে ব্যক্তি নিজের বাড়ীর দরজা বন্ধ করে রাখবে সেও নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে তাকেও কিছু বলা হবে না।"

অতঃপর আবু সুফিয়ান মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বের হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আব্বাস, তাকে উপত্যকার কিনারে পাহাড়ের মাথায় গিরিপথে একটু থামিয়ে রাখো। আল্লাহর সৈনিকরা তার সামনে দিয়ে যাক এবং সে তাদেরকে দেখুক।" আব্বাস বলেন, এরপর আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জায়গার কথা বলেছিলেন সেই গিরিপথে তাকে থামিয়ে রাখলাম। এরপর বিভিন্ন গোত্র নিজ নিজ পতাকার পেছনে সারিবদ্ধভাবে রওনা হলো। যখনই একটা গোত্র তার সামনে দিয়ে যায়, সে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, "হে আব্বাস। এরা কারা?" আমি বলি, "এরা বনু সুলাইম, অথবা বনু মুযাইনা অথবা অমুক গোত্র, তমুক গোত্র।" আবু সুফিয়ান সঙ্গে সঙ্গে বলে, "এদের সাথে আমার কোন তুলনাই হয় না।" এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের সবুজ বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন।(১)

এতে মুহাজির ও আনসারদের সমাবেশ ঘটেছিল। এ বাহিনীতে লোহার ধারালো অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। আবু সুফিয়ান বললো, "সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! হে আব্বাস এরা কারা?" আমি বললাম, "এ বাহিনীতে রয়েছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে আছেন মুহাজির ও আনসারগণ।" সে বললো, "এ বাহিনীর মুকাবিলা করার ক্ষমতা কারো নেই। আল্লাহর শপথ, হে আব্বাস! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আগামীকাল এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি হতে যাচ্ছেন।" আমি বললাম, "হে আবু সুফিয়ান! এটা কোন রাজকীয় ব্যাপার নয়। এটা নবুয়াতের প্রতাপ।" সে বললো, "তাহলে এটা কতই না চমৎকার!" আমি বললাম, "তুমি তাড়াতাড়ি কুরাইশদের কাছে চলে যাও।"

আবু সুফিয়ান মক্কা গিয়ে ঘোষণা করে দিল, "হে কুরাইশগণ, মুহাম্মাদ এমন এক বাহিনী নিয়ে এসেছে যার মুকাবিলা করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এখন আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে যে আশ্রয় নেবে তার ভয় নেই।"

এই সময় উতবার কন্যা হিন্দ আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে তার গোঁফ টেনে ধরে বললো, "হে কুরাইশগণ, এই মোটা পেটুককে হত্যা কর। জাতির নেতৃত্বের মর্যাদায় থেকে সে কলংকিত হয়েছে।"
আবু সুফিয়ান বললো, "তোমাদের বিপর্যয় সম্পর্কে সাবধান হও। এই মহিলার কথায় তোমরা বিপথগামী হয়ো না। তোমাদের ওপর এক অপ্রতিরোধ্য বাহিনী সমাগত! এমতাবস্থায় আমার বাড়ীতে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে।"

সবাই বললো, "তোর ওপর অভিসম্পাত! তোর বাড়ী আমাদের কি কাজে আসবে?"

আবু সুফিয়ান বললো, “যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে এবং যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ থাকবে।"

লোকেরা সবাই যার যার বাড়ীতে অথবা মসজিদুল হারামে চলে গেল।

আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাকর বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিতুয়ায় পৌঁছে লাল ইয়ামানী কাপড় দিয়ে পাগড়ী বাঁধলেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহের ফলে যে বিজয় লাভ করতে চলেছেন তার জন্য মাথা নীচ করে চলতে লাগলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তিনি মাথা এত নীচ করেছিলেন যে, তাঁর দাড়ি উটের দেহ স্পর্শ করছিল।

আসমা বিনতে আবু বাক্ (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যিতুয়াতে থামলেন তখন আবু কুহাফা (আবু বাক্রের (রা) পিতা) তার এক অল্পবয়স্কা কন্যাকে বললেন, "আমাকে আবু কুবাইস পাহাড়ের ওপর নিয়ে চল।” আবু কুহাফা তখন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। মেয়েটি তাকে পাহাড়ের ওপর নিয়ে গেল। তখন আবু কুহাফা তাঁর কন্যাকে বললেন, "তুমি কি দেখছো?" সে বললো, "একটা বিরাট জনসমাবেশ দেখতে পাচ্ছি।" তিনি বললেন, "ঐ তো সেই বাহিনী।" মেয়েটি বললো, "আরো দেখতে পাচ্ছি এক ব্যক্তি ঐ জনসমাবেশের সামনে একবার আগে আর একবার পেছনে ছুটছে।" তিনি বললেন, "তিনি ঐ বাহিনীর অধিনায়ক।" মেয়েটি বললো, "এবার জনসমাবেশটি বিচ্ছিন্ন হয়েছে।" আবু কুহাফা বললেন, "তাহলে বাহিনীকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।" এবার আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী নিয়ে চল।

মেয়েটি তাঁকে নিয়ে পাহাড় থেকে নামলো। আবু কুহাফা বাড়ী পৌঁছার আগেই বাহিনী তাঁর কাছে পৌছে গেল। মেয়েটির গলায় একটি রূপার হার ছিল, কে একজন তা ছিনিয়ে নিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌঁছে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলে আবু বাক্স (রা) তার পিতাকে নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে বললেন, "এই বৃদ্ধকে ঘরে রেখে এলে না কেন? আমিই তাঁর কাছে যেতাম।"
আবু বাক্স (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনার যাওয়ার চাইতে তাঁর আসাই অধিকতর শোভনীয়।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজের সামনে বসালেন। অতঃপর তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন।" তৎক্ষণাৎ আবু কুহাফা ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর আবু বাক্স তাঁকে নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। এ সময় আবু কুহাফার মাথায় 'সাগামা' নামক সাদা এক ধরনের গুলু জাড়ানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাঁর চুল থেকে এটা সরিয়ে দাও।"

অতঃপর আবু বাক্স তাঁর বোনের হাত ধরলেন। বললেন, "আল্লাহর কসম, আমার বোনের জন্য আজ ইসলামই গলার হার?" এর জবাবে কেউ কিছু বললো না। আবু বাক্স বললেন, "হে আমার আদরের বোন! তোমার হার হারিয়ে যাওয়াতে মনে কষ্ট নিও না।"

মক্কা বিজয় ও তায়েফের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ মুহাজিরদের জন্য 'বনু আবদুর রহমান' খাযরাজ গোত্রের জন্য 'বনু আবদুল্লাহ' এবং আওসের 'বনু উবাইদুল্লাহ' সাংকেতিক নাম রেখেছিলেন।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশের নির্দেশ দেন তখন মুসলিম অধিনায়কগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, "হামলা না চালানো হলে কারো সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ো না।" কেবল কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করে বলেন যে, "এরা কা'বার গিলাফের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও তাদেরকে হত্যা করবে।" এদের একজন বনু আমেরের আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ। এই ব্যক্তি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে। পরে ওহী লেখক হিসেবে নিয়োজিত হয়। তারপর পুনরায় ইসলাম ত্যাগ করে মুশরিক হয়ে কুরাইশদের কাছে ফিরে যায়। এ জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু সে পালিয়ে তার দুধভাই উসমান ইবনে আফফানের কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। উসমান (রা) তাকে লুকিয়ে রাখেন। পরে মক্কার অবস্থা স্বাভাবিক এবং জনগণ শান্ত হয়ে আসলে তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির করেন। উসমান (রা) তার প্রাণের নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জবাব না দিয়ে দীর্ঘ নীরবতা পালন করেন। অতঃপর বলেন, "আচ্ছা।" পরে উসমান (রা) চলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন, "আমি চুপ

ছিলাম যাতে তোমরা কেউ তাকে হত্যা করার সুযোগ পাও।" আনসারী সাহাবাদের একজন বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে একটু ইংগিত দিলে পারতেন।" তিনি বললেন, "কোন নবী ইংগিত দিয়ে মানুষ হত্যা করায় না।"৮২

দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল বনু তামীম গোত্রের আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল। তাকে হত্যার নির্দেশ প্রদানের কারণ ছিল, সে যখন মুসলমান ছিল তখন তাকে অপর এক ব্যক্তির সাথে যাকাত আদায় করতে পাঠানো হয়। তার সাথে একজন মুসলমান খাদেমও ছিল।

পথিমধ্যে এক জায়গায় তারা যাত্রাবিরতি করে। এই সময়ে সে ভৃত্যকে একটি ছাগল

জবাই করে খাবার তৈরী করতে বলে। কিন্তু ভৃত্যটি খাবার তৈরী না করে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন সে তাকে হত্যা করে ইসলাম ত্যাগ করে মুশরিক হয়ে যায়।

তার দু'জন দাসী ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিন্দাসূচক গান গাইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে খাতালকে তার দুই দাসীসহ হত্যার নির্দেশ দেন।

আর একজন হলো 'হুয়াইরিস ইবনে নুকাইজ'। সে মক্কায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহকে উত্যক্ত করতো।

আর একজন মিকইয়াস ইবনে লুবাবা। একজন আনসারী সাহাবা ভুলক্রমে তার ভাইকে হত্যা করলে মিকইয়াস উক্ত আনসারীকে হত্যা করে। অতঃপর মুশরিক হয়ে কুরাইশদের কাছে চলে যায়। এজন্য তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

আর একজন হলো বনু আবদুল মুত্তালিবের আযাদকৃত দাসী সারা। সেও মক্কায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্যক্ত করতো।

আর একজন আবু জাহলের পুত্র ইকরিমা।

ইকরিমা ইয়ামানে পালিয়ে যায় এবং তার স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারেস ইসলাম গ্রহণ করে। উম্মে হাকীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইকরিমার নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে নিরাপত্তা দেন। তখন সে ইকরিমাকে ইয়ামান থেকে ডেকে নিয়ে আসে। পরে ইকরিমা ইসলাম গ্রহণ করে।

আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল ও মিকইয়াসকে হত্যা করা হয়। তবে আবদুল্লাহর দাসীদ্বয়ের একজনকে হত্যা করা হয়। অপরজন পালিয়ে যায়। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন। সারাকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পরে উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করে। আলী (রা) হুয়াইরিসকে হত্যা করেন।

আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানী (রা) বলেন: মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে বনু মাখযুম গোত্রের আমার দুই দেবর পালিয়ে এসে আমার কাছে আশ্রয় নেয়। উম্মে হানীর স্বামী ছিল মাখযুম গোত্রের হুবাইরা ইবনে আবু ওয়াহাব। উম্মে হানী বর্ণনা করেন: তারা আমার কাছে আসার সাথে সাথে আমার ভাই আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আমার কাছে এসে বললেন, "আমি ওদেরকে হত্যা করবো।" আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি তখন গোসল করছিলেন। গোসলের পাত্রে খামীর করা আটা লেগেছিল। ফাতিমা তাঁকে কাপড় দিয়ে আড়াল করে দিলেন। গোসল সম্পন্ন করে তিনি আট রাকাআত যুহার নামায পড়লেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "খোশ আমদেদ হে উম্মে হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো, আমিও তাকে আশ্রয় দিয়েছি। তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছো আমিও তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। কাজেই আলী যেন তাদেরকে হত্যা না করে।"

সাফিয়া বিনতে শাইবা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং লোকজন শান্ত হলে তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করে কা'বা শরীফে গিয়ে তাওয়াফ করলেন। এই সময় তিনি এক প্রান্ত বাঁকা একটি লাঠি দিয়ে ইশারা করে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। তওয়াফ শেষ করে তিনি উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে তার নিকট থেকে কা'বার চাবি নিলেন। দরজা খুলে দেয়া হলে তিনি কা'বার ভেতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে কাঠের তৈরী একটি কবুতরের মূর্তি দেখতে পেলেন। তিনি তা ভেঙ্গে ছুড়ে ফেললেন। অতঃপর তিনি কা'বার দরজার ওপর দণ্ডায়মান হলেন। লোকেরা এ সময় তাঁর পক্ষ থেকে প্রাণের নিরাপত্তা লাভের নিমিত্ত মসজিদুল হারামে আশ্রয় নিয়ে সেখানে অবস্থান করছিল।

ইবনে ইসহাক বলেন: আমি বিশ্বস্ত লোকদের নিকট শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার দরজার ওপর দাঁড়িয়ে নিম্নরূপ ভাষণ দিলেন:

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও লা-শরীক। তিনি তাঁর ওয়াদা পালন করেছেন, স্বীয় বান্দাকে বিজয়ী করেছেন এবং তিনি কাফিরদের সংগঠিত দলগুলোকে পরাস্ত করেছেন। শুনে রাখ, অতীতের যে কোন রক্ত, সম্পদ বা অর্থের দাবী আমার এই পায়ের তলায় দলিত

করলাম। (অর্থাৎ রহিত করলাম) তবে কা'বার সেবা এবং হাজীদের আপ্যায়নের রীতি চালু থাকবে। শুনে রাখ, ভুলক্রমে হত্যা ইচ্ছাকৃত হত্যার কাছাকাছি। চাই তা লাঠি দ্বারা হোক কিংবা ছড়ি দ্বারা হোক। এর জন্য চল্লিশটা গাভীন উটসহ একশত উট দিয়াত দিতে হবে। হে কুরাইশরা, তোমাদের জাহিলিয়াতের আভিজাত্য এবং পূর্বপুরুষদের নামে বড়াই করার প্রথা আল্লাহ রহিত করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম মাটির তৈরী।" অতঃপর এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

"হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি। শুধুমাত্র পরিচিতির সুবিধার জন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি। আসলে তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী খোদাভীরু সে-ই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানার্হ।" (হুজুরাত) অতঃপর তিনি আরো বললেন, "হে কুরাইশগণ, তোমরা আমার কাছে কি ধরনের আচরণ প্রত্যাশা কর?" সবাই বললো, "উত্তম আচরণ। কেননা তুমি আমাদের এক মহান ভ্রাতা এবং এক মহান ভ্রাতার পুত্র।"

তিনি বললেন, "যাও, তোমরা সকলে মুক্ত, স্বাধীন।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদুল হারামে বসলেন। তাঁর কাছে আলী ইবনে আবু তালিব এলেন। তাঁর হাতে ছিল কা'বার চাবি। তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, হাজীদের আপ্যায়নের সাথে কা'বার দ্বার রক্ষকের দায়িত্বও আমাদের হাতে নিয়ে নিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "উসমান ইবনে তালহা কোথায়?" উসমানকে ডাকা হলো। তিনি বললেন, "হে উসমান! এই নাও তোমার চাবি। আজকের দিন সৌজন্য ও সহৃদয়তা প্রদর্শনের দিন।"

ইবনে হিশাম বলেন: কিছুসংখ্যক জ্ঞানী লোকের নিকট থেকে আমি জানতে পেরেছি যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানে ফিরিশতা ও অন্যান্য অনেক কিছুর প্রতিকৃতি দেখতে পেলেন। এমনকি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতিকৃতিও দেখতে পেলেন। তার হাতে রয়েছে ভালমন্দ নির্ধারণের তীরসমূহ। তা দেখে তিনি বললেন, "আল্লাহর অভিশাপ হোক মুশরিকদের ওপর। আমাদের প্রবীণতম মুরব্বীকে ভালমন্দ নির্ধারণের তীর বানিয়ে ছেড়েছে। কোথায় ইবরাহীম আর কোথায় এসব?" অতঃপর এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "ইবরাহীম ইহুদীও ছিলেন না, খৃস্টানও না। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। তিনি মুশরিকও ছিলেন না।"

অতঃপর ঐসব প্রতিকৃতি বিনষ্ট করার নির্দেশ দিলেন এবং তা বিনষ্ট করা হলো।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলালকে (রা) সাথে নিয়ে কা'বার ভেতর প্রবেশ করেন। তাঁকে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। তখন আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, আত্তাব ইবনে উসাইদ এবং হারেস ইবনে হিশাম কা'বার আঙিনায় উপবিষ্ট। আত্তাব ইবনে উসাইদ বললো, "ভাগ্যিস আল্লাহ (আমার পিতা) উসাইদকে সসম্মানে আগেভাগে সরিয়ে নিয়েছেন। তা না হলে আজ এই আযান শুনে সে এমন কিছু কথা
বলে বসতো যা তার ক্রোধেরও উদ্রেক করতো।" হারেস ইবনে হিশাম বললো, "আমি যদি মনে করতাম সে (মুহাম্মাদ) হক পথে চলছে তাহলে আমি তার অনুসরণ করতাম।" আবু সুফিয়ান বললো, "আমি কিছুই বলবো না। একটা কথাও যদি বলি, তাহলে এই পাথরের টুকরোগুলোও তা ফাঁস করে দেবে।"

এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এলেন। তিনি বললেন, "তোমরা যা বলাবলি করেছো আমি তা শুনেছি।" হারেস ও আত্তাব বললো, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। আমাদের কাছে যারা ছিল তাদের কেউই তো এ কথা আপনাকে জানায়নি। কাজেই এ কথা আপনাকে জানানোর জন্য আমাদের কোন সঙ্গীকেই দোষারোপ করতে পারি না।" (তাই এটা নিশ্চয়ই আল্লাহ জানিয়েছেন এবং আল্লাহর রাসূল হলেই সেটা সম্ভব।)

ইবনে হিশাম বলেন:

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন স্বীয় সওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কায় প্রবেশ করে সবার আগে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করলেন। তখনো কা'বার চারপাশে সীসা দিয়ে সংরক্ষিত মূর্তিসমূহ বিরাজ করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোর দিকে ইংগিত করে বললেন, "সত্য এসেছে এবং বাতিল উৎখাত হয়েছে। বস্তুতঃ বাতিল উৎখাত হওয়ারই যোগ্য।" একথা বলে যে মূর্তিটার দিকেই তিনি ইশারা করতে লাগলেন, তা চিৎ বা উপুড় হয়ে পড়ে যেতে লাগলো। এভাবে একে একে সবক'টা মূর্তিই ধরাশায়ী হলো।

নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র আমাকে জানিয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কা'বার তাওয়াফ করছিলেন তখন ফুজালা ইবনে উমাইর লাইসী তাকে হত্যা করার ফন্দি আঁটে। এই ফন্দি নিয়ে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হলেই তিনি বললেন, "কে, ফুজালা নাকি?” সে বললো "হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।" তিনি বললেন, "তুমি মনে মনে কি ভাবছিলে?” সে বললো, "কিছুই না, আমি আল্লাহকে স্মরণ করছিলাম।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে বললেন, "আল্লাহর কাছে তাওবাহ

কর।" অতঃপর তার বুকের ওপর নিজের হাত রাখলেন। তাতে তার মন শান্ত হলো। পরবর্তীকালে ফুজালা বলতো, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মুহূর্তে আমার বুকের ওপর থেকে হাত তুলে নিলেন তখন থেকে পৃথিবীতে কোন জিনিস আমার কাছে তাঁর চাইতে প্রিয় বলে মনে হয়নি।"

ফুজালা আরো বলেন: এরপর আমি নিজ পরিবারের কাছে চললাম। যাওয়ার সময় এমন এক মহিলার কাছ দিয়ে গেলাম যার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে বললো, "এসো আমরা গল্প করি।" আমি বললাম, 'না'।

এ প্রসঙ্গে ফুজালা নিম্নরূপ কবিতা আবৃত্তি করেন,

"মহিলাটি আমাকে কথা বলতে ডাকলো। আমি বললাম, আল্লাহ ও ইসলাম তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে নিষেধ করেন। তুমি যদি বিজয়ের দিন মুহাম্মাদ ও তাঁর বাহিনীকে দেখতে- যেদিন মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করা হচ্ছিলো, তাহলে দেখতে যে, আল্লাহর দ্বীন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এবং শিরক অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গিয়েছে।"

ইবনে ইসসাক বলেন: মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন সর্বমোট দশ হাজার

মুসলমান। তন্মধ্যে বনু সুলাইম গোত্রের সাতশ' মতান্তরে এক হাজার, বনু গিফার ও বনু আসলামের চারশ', মুযাইনার এক হাজার তিন জন, আর অবশিষ্ট সবাই কুরাইশ ও আনসার, তাদের মিত্র এবং তামীম, কাইস ও আদাস গোত্রত্রয় সহ আরব গোত্রসমূহের লোক।

মক্কা বিজয়ের দিন সম্পর্কে রচিত প্রসিদ্ধ কবিতা হলো হাসসান ইবনে সাবিত

আনসারীর কবিতা:

"যাতুল আসাবি ও জিওয়া থেকে আযরা পর্যন্ত গোটা এলাকা উজাড় হয়ে গেছে। জিওয়ার ঘরবাড়ী বিরান হয়ে গেছে। বনু হাশহাশ গোত্রের এলাকা এখন উষর মরুভূমি। প্রবল বাতাস তার চিহ্ন মুছে দেয় এবং আকাশ সেখানে বারি বর্ষণ করে না।

ইতিপূর্বে সেখানে একজন উপকারী বন্ধু ছিল, ঐ এলাকার শ্যামল বনানীতে উট মেষ চরে বেড়াতো। সেসব স্মৃতিচারণ এখন থাক্। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, রাত গভীর হয়ে এলে আমার ঘুম আসে না। এর কারণ সেই আলুলায়িত কুন্তলা (এলোমেলো বিশৃংখল অবস্থা) যা তাকে জাপটে ধরেছিল, ফলে তার মনের শান্তি খুঁচাবার উপায় নেই। যেন বাইতুর রা'সের গুপ্ত বস্তু, মধু ও পানি তার সাথে মিশানো হতো। একদিন যখন পানীয় বস্তুসমূহের পর্যালোচনা হবে, তখন দেখা যাবে, ঐগুলো উৎকৃষ্ট সুপেয় বস্তু এবং উৎসর্গীকৃত। তাকে তিরস্কারের অধিকার দেবো যদি আমরা তিরস্কারযোগ্য কোন কাজ করি- চাই তা গালাগাল বা প্রহার পর্যন্ত গিয়ে গড়াক। আমরা সেই সব পানীয় পান করবো ফলে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা রাজা বাদশাহে পরিণত হবো, পরিণত হবো সেই সিংহে- যা কোন কিছুর সম্মুখীন হতে ভয় পায় না। আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, যা ধুলা উড়িয়ে ছোটে এবং যার গন্তব্য হলো কা'দা (মক্কার উচ্চভূমি), জানি না তোমরা তা দেখেছো কিনা। যে বাহিনী লাগাম নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় (কে আগে সওয়ার হবে সে জন্য) যা অতিশয় আগ্রহী এবং যার ঘাড়ের ওপর রক্তপিপাসার বর্শা রয়েছে। আমাদের ঘোড়াগুলো অতি দ্রুতবেগে ছোটে।

মহিলারা ওড়না দিয়েও তাকে হাঁকিয়ে নিতে পারে। তোমরা যদি আমাদের বাধা না দাও তা'হলে আমরা উমরা করবো- অবশ্য বিজয় অবধারিত হয়ে আছে এবং সমস্ত পর্দা ছিন্ন হয়ে গেছে। (অর্থাৎ বিজয়ের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেছে) অন্যথায় ভবিষ্যতের কোন যুদ্ধের জন্য অন্বেষা কর। আল্লাহর দূত জিবরীল আমাদের মধ্যে রয়েছেন। তিনি পরম পবিত্র আত্মা- যার সমতুল্য কেউ নেই। আল্লাহ বলেন যে, এমন এক বান্দাকে আমি পাঠিয়েছি যিনি বিপদ-আপদে উপকারী হক কথা বলে থাকেন।

আমি তার কার্যকলাপের সাক্ষী। তোমরা তাকে মেনে নাও। কিন্তু তোমরা (হে মক্কাবাসী) জবাব দিলে, আমরা তাকে মানবো না, মানবার কোন ইরাদা আমাদের নেই। আল্লাহ আরো বললেন, আমি আনসার বাহিনীকে পাঠিয়ে দিয়েছি, তাদের লক্ষ্য হলো যুদ্ধ। আমাদের প্রতিদিনই কিছু না কিছু মুকাবিলা করতে হয়- কখনো গালাগালি,কখনো যুদ্ধ, কখনো তিরস্কার। যারা তিরস্কার বা গালাগালি করে তাদেরকে ছন্দায়িত ভাষায় দাঁতভাঙ্গা জবাব দিই, আর যারা আমাদের রক্তপাতে লিপ্ত হয় তাদের ওপর আঘাত হানি। আবু সুফিয়ানকে জানিয়ে দাও (আমাদের

মক্কায়) প্রবেশ আসন্ন। আর এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আমাদের তরবারী তোমাকে গোলাম বানিয়ে ছেড়েছে এবং আবদুদ দার গোত্রের সরদারদেরকে দাস বানিয়ে ছেড়েছে। তুমি মুহাম্মাদকে গালাগালি করেছো। আর আমি তার জবাব দিয়েছি এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান রয়েছে। তুমি এক পরম কল্যাণময় পরোপকারী ও একনিষ্ঠ সত্যপন্থীকে গালাগালি করেছো। যিনি আল্লাহর পরম বিশ্বস্ত এবং ওয়াদা পূর্ণ করা যার জীবন ব্রত। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলকে গালাগাল করে আর যে ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করে ও সাহায্য করে সে কি সমান হতে পারে? বস্তুতঃ আমার পিতা, দাদা এবং আমার সম্ভ্রমের বিনিময়ে মুহাম্মাদের সম্ভ্রমকে তোমাদের হাত থেকে রক্ষা করবো। আমার জিহ্বা অকাট্য এবং নির্দোষ। আমার সমুদ্রকে কোন অপবিত্র বালতি দিয়ে কলুষিত করা সম্ভব নয়।"

টীকা১.

বিলালের আযান:

আল্লাহর রাসূল বিলালকে আজান দেওয়ার জন্য ডাকলেন। আজ থেকে আট বছর আগে বিলাল কথা বলতেন চুপিচুপি, কিন্তু আজ বিলাল দাঁড়িয়ে আছেন কাবাঘরের ওপরে উন্মুক্ত কণ্ঠে আজান দেবেন বলে। আজ তিনি মক্কার কাউকে ভয় পান না। বিলাল ছিলেন মুশরিকদের চোখে নীচুশ্রেণি। তাকে দেখে অনেকেরই সহ্য হলো না। তারা কানাঘুষা করতে লাগলো, 'এই কালো কাকটা এখানে কী করছে?'

কাউকে পাত্তা না দিয়ে বিলাল তার সুমধুর কণ্ঠে আজান দিলেন। সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেল। আজানের ধ্বনি যেন সবাইকে তন্ময় করে দিলো। এই একই আজানের ধ্বনিতে কারো অন্তরের দরাজ ভেঙে ইসলাম প্রবেশ করলো, আর কারো অন্তরে দাউদাউ করে বিদ্বেষের আগুন জ্বলতে লাগলো। কাবাঘর হলো আল্লাহর ঘর। শিরকের অত্যাচারে এতদিন এই ঘরটা যেন খা-খা করছিল, দীর্ঘদিন পর বিলালের আযানের মাধ্যমে তাওহীদ ফিরে এল। বিলাল ছিলেন একজন দাস। কাবায় তার আজান ছিল মক্কায় গোত্রভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যের প্রতীকি সমাপ্তি। বিলালকে দিয়ে আজান দেওয়ানোর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, ইসলাম দ্বারা যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে তাতে জাহিলিয়াতের শ্রেণীবৈষম্যের আর কোনো স্থান নেই। একজন মানুষের মর্যাদা বা হীনতা নির্ধারিত হবে তাক্বওয়ার মাধ্যমে।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা:

মক্কায় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা হলো। তাদের বাড়িঘর তাদেরই থাকলো, কোনো করও আরোপ করা হলো না। বলা হলো, কেউ যদি তার নিজ বাড়িতে অবস্থান করে তাহলে সে নিরাপদ। যদি সে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেয় সে নিরাপদ। যদি কেউ মসজিদে অবস্থান করে তাহলে সে নিরাপদ। বিজিত শত্রুর প্রতি এই অভাবনীয় দয়া, একজন নবী ছাড়া আর কে-ই বা করতে পারেন? মক্কার লোকেরা উপলব্ধি করলো, যে দেবতাদের তারা এতকাল উপাসনা করে এসেছে, তারা আসলে মিথ্যা মাবুদ। ইসলামের সত্য উপলব্ধি করে তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো।

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসা করবেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী।" (সূরা নাসর, ১১০)

তায়েফ যুদ্ধ:৮ম হিজরী

বনু সাকীফের পরাজিত বাহিনী তায়েফে গিয়ে নগরীর দ্বার রুদ্ধ করে দেয় এবং পুনরায় লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। উরওয়া ইবনে মাসউদ ও গাইলান ইবনে সালামা হুনাইন ও তায়েফের অভিযানে অংশ নেননি। তারা জুরাশে ট্যাংক, কামান ও দবুর জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন।

হুনাইনের বিজয় শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানে বেরুলেন। এই অভিযান সম্পর্কে কা'ব ইবনে মালিক একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তার অর্থ হলো-"তিহামা ও খাইবার থেকে আমরা সকল সংশয় দূর করে তরবারীকে বিশ্রাম দিয়েছিলাম। তরবারীগুলোকে আমরা দাওস অথবা সাকীফের যে কোন একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছিলাম। আর সেসব তরবারী যদি কথা বলতো তবে চূড়ান্ত কথাই বলতো। সে তরবারী যদি তোমরা তোমাদের বাসস্থানের আঙিনায় দেখতে না পাও, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কেউ (তোমাদেরকে) রক্ষা করতে চাইলেও তার প্রতি আমি মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন হবো না। আমরা (তোমাদের) ঘরের ছাদগুলোকে ভেঙ্গে ওয়াজ্জের প্রান্তরে নিয়ে যাবো। ফলে তোমাদের ঘরবাড়ী বিরান হয়ে যাবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নাখলা ইয়ামানিয়াতে, তারপর কারনে, তারপর মুলাইহে, তারপর সেখান থেকে লিয়া এলাকার বুহরাতুর রুগাতে গিয়ে উপনীত হলেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়ে তাতে নামায পড়লেন। এরপর দাইকা নামক রাস্তা দিয়ে নাখাবে গিয়ে বনু সাকীফের এক ব্যক্তির জমির কাছে 'ছাদেরা' নামক কুল গাছের নীচে যাত্রাবিরতি করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই লোকটিকে চরমপত্র দিলেন যে, "এই জায়গা খালি করে দিয়ে সরে যাও, নচেৎ আমরা তোমার দেয়াল ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবো।" লোকটি বেরিয়ে যেতে অস্বীকার করলে তিনি তার দেয়াল ভেঙ্গে দিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার যাত্রা শুরু করলেন। তায়েফের কাছাকাছি গিয়ে তাঁবু স্থাপন করে সৈন্যদের নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণ করলেন। এইখানে কতিপয় সাহাবী তীরবিদ্ধ হয়ে মারা যান। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৈন্যরা তায়েফের দেয়ালের পাশেই অবস্থান নিয়েছিলেন, তাই নগরের ভেতর থেকে তায়েফবাসীদের নিক্ষিপ্ত তীর তাঁদের ওপর এসে পড়েছিল। তায়েফবাসীরা শহরের দরজা এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল যে, মুসলমানগণ তার ভেতরে ঢুকতে পারলো না। তীরবিদ্ধ হয়ে কতিপয় সাহাবী শাহাদাত বরণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গোটা বাহিনীকে নিয়ে নগরীর সেই স্থানে স্থাপন করলেন যেখানে আজ তায়েফের মসজিদ অবস্থিত। তিনি তায়েফবাসীকে অবরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অভিযানে উম্মে সালামা (রা) সহ দুজন স্ত্রী সহগামিনী হয়েছিলেন। তাঁদের জন্য তিনি গম্বুজ আকৃতির দু'টি ঘর নির্মাণ করে দিলেন। সেই ঘরের মাঝে তিনি নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। বনু সাকীফ ইসলাম গ্রহণ করলে আমর ইবনে উমাইয়া (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়ার জায়গায় মসজিদ তৈরী করেন। এই মর্মে জনশ্রুতি আছে যে, ঐ মসজিদে একটি যোদ্ধা দল থাকতো। প্রতিদিনই তাদের রণহুংকার ও তর্জন গর্জন শোনা যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফবাসীকে অবরোধ করে তীর ধনুক দ্বারা তুমুল যুদ্ধ করলেন। (১)

তায়েফের প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য যে দিনটি নির্ধারিত করা হয়েছিল সে দিন সমাগত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী একটি ট্যাংকের নীচে ঢুকলেন, অতঃপর তা নিয়ে তায়েফের প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য সংঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হলেন। বনু সাকীফ গোত্রের লোকরা তাদের ওপর আগুনে পোড়ানো লোহার শেল নিক্ষেপ করতে লাগলো। এতে সাহাবীগণ ট্যাংকের নীচ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন। আর যিনিই বের হন তিনিই সাকীফের তীরে বিদ্ধ হন। এভাবে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান শহীদ হন। এই পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাকীফের বাগান কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণ তা কেটে ফেলতে শুরু করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বনু সাকীফের অবরোধ চলাকালে একদিন আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) কে বললেন, "হে আবু বাক্র, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমাকে এক পেয়ালা ঘি উপহার দেয়া হয়েছে। একটা মোরগ এসে ঠোকরাতে ঠোকরাতে পেয়ালার ঘি টুকু ফেলে দিল।" আবু বাক্র (রা) বললেন, "আমার মনে হয়, আজ আপনি বনু সাকীফকে পরাজিত করতে পারবেন না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমার ধারণাও তাই।"

একদিন উসমান ইবনে মাযউনের স্ত্রী খুয়াইলা বিনতে হাকীম (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ যদি আপনাকে তায়েফবাসীর ওপর বিজয় দান করেন তাহলে বন্ধু সাকীফের সবচেয়ে অলংকার সজ্জিতা মহিলা বাদিয়া বিনতে গীলান অথবা ফারেগা বিনতে আকীলের অলংকার আমাকে দেবেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "আমাকে যদি বনু সাকীফের ব্যাপারে অনুমতি না দেওয়া হয় তা হলেও?" খুয়াইলা একথা শুনে চলে গেলেন এবং উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) কথাটা জানালেন। উমার (রা) তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, খুয়াইলা যে কথা আমাকে জানালো তা কি আপনি বলেছেন?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাঁ'। উমার (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বনু সাকীফের ব্যাপারে অনুমতি কি আপনি পাননি?" তিনি বললেন, 'না।' উমার বললেন, "তাহলে কি আমি এখন মুসলমানদেরকে এ স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দেবো?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হাঁ।' উমার (রা) তখন মুসলিম বাহিনীকে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। যাত্রা শুরু হলে সাঈদ ইবনে উবাইদ আওয়াজ দিলেন, "বনু সাকীফ যেমন ছিল, তেমনই রয়ে গেলো।" উয়াইনা ইবনে হিসন বললেন, "হাঁ, আপন মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে (রয়ে গেল)।" জনৈক সাহাবী বললেন, "হে উয়াইনা! মুশরিকরা আল্লাহর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করলো আর তুমি তাদের প্রশংসা করছো? অথচ তুমি এসেছো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে লড়াই করতে। ধিক্ তোমাকে!" তিনি বললেন, "আসলে আমি তোমাদের পক্ষে বনু সাকীফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো সে জন্য আসিনি। আমি এসেছি এই উদ্দেশ্যে যে, মুহাম্মাদ তায়েফ জয় করলে আমি বনু সাকীফের একটা মেয়েকে হস্তগত করবো যাতে সেই মেয়ের গর্ভে আমার একটা পুত্র জন্ম নেয়। কারণ বনু সাকীফ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী।"

অবরোধ চলাকালে তায়েফের কিছু সংখ্যক দাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন।

পরবর্তী সময়ে তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের কেউ কেউ ঐ দাসদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করে। আবেদনকারীদের মধ্যে হারেস ইবনে কালদা ছিলেন অন্যতম। তিনি তাদের 'না' সূচক জবাব দেন এবং বলেন, "ওরা আল্লাহর মুক্ত বান্দা। ওদেরকে আবার আমি দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করতে পারি না।"

মোট বারোজন সাহাবী তায়েফে শাহাদাত বরণ করেন। তন্মধ্যে সাতজন কুরাইশ, চারজন আনসার এবং একজন বনু লাইস গোত্রের।

যুদ্ধ ও অবরোধ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ ত্যাগ করলে বুজাইর ইবনে যুহাইর তায়েফ ও হুনাইনের বর্ণনা দিয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন যার মর্ম হলো-

"হুনাইনের প্রান্তরে সমবেত হওয়ার দিনে, আওতাসে সমবেত হওয়ার প্রভাত কালে এবং বিদ্যুত চমকানোর দিন (শেষোক্তটি সম্ভবতঃ তায়েফ) তুমুল যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল। প্রতারণার মাধ্যমে হাওয়াযিন তার জনতাকে সমবেত করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা নীড়ভ্রষ্ট শতধা বিভক্ত পাখীর মত হলো। আমাদের কোন অবস্থান গ্রহণকেই তারা বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি। পেরেছে শুধু তাদের প্রাচীর ও খন্দকের ভেতরটা ঠেকিয়ে রাখতে। তায়েফবাসী যাতে বেরিয়ে আসে সেজন্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু দরজা বন্ধ করে তারা তাদের ঘরে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে থাকলো। তারা অনুতপ্ত হয়ে একদিন ফিরে যাবে সেই বিশালকায় বাহিনীর কাছে- যে বাহিনী মৃত্যুর দীপ্ত গৌরবে উদ্ভাসিত- যে বাহিনীর সমাবেশে সবুজ আভা পরিস্ফুট। (নাজদের) হাযান পর্বতে যদি তাকে চালিত করা হয় তবে সে পর্বত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বনের সিংহরা কাঁটাযুক্ত ঘাসের ওপর দিয়ে যেভাবে চলে আমরা সেইভাবে চলি। যেন আমরা দ্রুতগামী ঘোড়া, যা চলার পথে কখনো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় আবার মিলিত হয়। সব রকমের যুদ্ধবর্মই আমরা পরে থাকি। এসব বর্মই আমাদের দুর্গের কাজ করে- যেমন অগভীর কুয়ার ভেতরে পুঞ্জিভূত বাতাস বেরিয়ে গেলে তা দুর্গের মত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্মগুলো এত দীর্ঘ যে তা আমাদের জুতা স্পর্শ করে এবং তা দাউদ (আ) এবং হীরার বাদশাহ আমর ইবনে হিন্দের তৈরী বর্মের মত সুনির্মিত।”

.টীকা১.ইবনে হিশাম বলেছেন, এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামান ব্যবহার করেন। তায়েফবাসীর বিরুদ্ধে তিনি যে কামান ব্যবহার করেন সেটাই ইসলামের প্রথম কামান।

মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুসাইলিমা ও আসওয়াদ আন্‌সীর বিবরণ

দু'জন মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় নবুওয়াতের দাবী করেছে। তারা হলো, ইয়ামামা অঞ্চলের বনু হানীফা গোত্রের মুসাইলিমা ইবনে হাবিব এবং ইয়ামানের সানয়াতে আসওয়াদ ইবনে কা'ব আন্সী। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন: আমি মসজিদে নববীর মিম্বার থেকে খুতবা প্রদানরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “হে লোকজন! আমি লাইলাতুল কদর কোন্ রাতে তা স্বপ্নে দেখেছিলাম। কিন্তু আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি আরো স্বপ্নে দেখেছি যেন আমার দুই ডানায় দুটো সোনালী বাজুবন্দ রয়েছে। আমি তাতে ফুঁ দিতেই তা উড়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম, ঐ দুটো বাজুবন্দ ইয়ামান ও ইয়ামামার এই দুই মিথ্যা দাবীদারের প্রতি ইংগিত।"

একজন বিশ্বস্ত লোক আবু হুরাইরার (রা) উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে জানিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের আগে ত্রিশজন দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাদের প্রত্যেকেই নবুওয়াতের দাবীদার হবে।"

বিদায় হজ্জ

রাসূলুল্লাহ হিজরতের দশম বছরে হজ্জ করেছিলেন। এই হজ্জকেই বলা হয় বিদায় হজ্জ। এই হাজ্জেই রাসূলুল্লাহ মুসলিম উম্মতের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত ভাষণ প্রদান করেন। সকল মুসলিম সম্মিলিতভাবে শেষবারের মতো রাসূলুল্লাহকে দেখার ও শোনার সুযোগ পায়। মদীনা থেকে তিনি এই একবারই হজ্জ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ উটে চড়ে হজ্জ করেছিলেন। তাঁর এই হাজ্জে কোনো বিলাসিতা ছিল না, নিতান্তই সাদাসিধেভাবে তিনি হজ্জ সম্পন্ন করেছিলেন। সেই হজ্জ এখনকার মতো ভিআইপি হজ্জ ছিল না। আল্লাহর রাসূল মুসলিমদের হজ্জের নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করলেন, এরপর যখন তিনি আরাফাতের ময়দানে তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন,

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।" (সূরা মায়িদা, ৫: ৩)

এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবিরা কাঁদতে শুরু করেন। তারা বুঝতে পারলেন আল্লাহর রাসূল আর বেশিদিন তাদের মাঝে থাকবেন না। উমারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি কেন কাঁদছেন। তিনি উত্তর দেন, 'যখন কোনো কিছুর উত্থান ঘটে আর সেটা পরিপূর্ণতা লাভ করে, এরপর তার কেবল পতনই সম্ভব।' উমার বলতে চাচ্ছিলেন, ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। মুসলিমরা এই শ্রেষ্ঠত্ব কিছুকাল ধরে রাখবে, এরপর আস্তে আস্তে তাদের পতন হবে। এজন্যই আমরা বিশ্বাস করি, সাহাবিদের যুগ ছিল শ্রেষ্ঠ সময়, সেই স্বর্ণযুগ আর কখনো ফিরে আসবে না।

মাসজিদ আল-হারামে এসেই আল্লাহর রাসূল কালো পাথর স্পর্শ করে চুমু খেলেন। এরপর তাওয়াফ শুরু করলেন। প্রথম তিনবারের তাওয়াফ ছিল দ্রুতগতির তাওয়াফ, আর পরের চারবার ছিল সাধারণ গতিতে। এরপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন,

"আর স্মরণ করো, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে,) তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকুকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো।" (সূরা বাকারাহ, ২: ১২৫)

এরপর তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর আর কাবার মাঝে রেখে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি আবার কালো পাথর স্পর্শ করলেন, চুমু খেলেন। এরপর পাঠ করলেন সূরা বাকারাহ অন্য একটি আয়াত।

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে কিংবা উমরা করবে তার কোনো অপরাধ হবে না যে, সে এগুলোর তাওয়াফ করবে। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কল্যাণ করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ শোকরকারী, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাক্কারাহ, ২, ১৫৮)

এরপর আল্লাহর রাসূল সাফা ও মারওয়ার মাঝে 'সাঈ' করলেন সাতবার। আল্লাহর রাসূল উরানাহ উপত্যকায় এসে সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, যেটা বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে পরিচিত। তিনি বললেন,

'লোকেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো! হয়তো আজকের পর আমি আর কখনো এখানে তোমাদের সঙ্গে একত্রিত হতে পারবো না।

আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর যেমন পবিত্র; তোমাদের জান, মাল, ইজ্জত কিয়ামত পর্যন্ত তেমনই পবিত্র। কারো কাছে যদি কোনো আমানত রক্ষিত থাকে, তাহলে সে যেন তা আমানতকারীর কাছে পৌঁছে দেয়। তোমরা অন্যের ওপর অত্যাচার করবে না, নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না।

জেনে রেখো, জাহিলী যুগের সকল অপসংস্কৃতি আমার পায়ের নিচে। শুধু কাবাঘরের তত্ত্বাবধান ও হাজীদের পানি পান করানো ছাড়া। জাহিলিয়াতের সকল রক্তপণের দাবি বাতিল করা হলো। প্রথম যে রক্তপণের দাবি বাতিল করছি, তা হলো রবিয়া ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিবের রক্ত। সে শিশু অবস্থায় বনু সাদের দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে।

জাহেলী যুগের সুদের প্রথা বিলুপ্ত করা হলো। তোমাদের কেবল মূলধনের ওপর অধিকার থাকলো। সর্বপ্রথম যে সুদ বাতিল করছি, তা হলো আমাদের বংশের আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো।

নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নারীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষদের উপর রয়েছে নারীদের অধিকার। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর নির্ধারিত কালিমা বাক্যের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছো। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা অপছন্দ করো এমন কাউকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ভার বহন করবে ন্যায়সঙ্গতভাবে।

আমার পর তোমরা পরস্পর খুনোখুনিতে জড়িয়ে কুফরে পতিত হয়ো না। যারা সালাত আদায় করবে, তারা (পুনরায়) শয়তানের ইবাদাত করবে, এটা শয়তান আশা করে না। কিন্তু সে তোমাদের মধ্যে বিবাদ করতে থাকবে।

তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। যদি বিকলাঙ্গ কোনো দাসও তোমাদের উপর নেতা নিযুক্ত হয় এবং সে তোমাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নেতৃত্ব দেয়, তাহলে তাঁকে শুনবে ও মানবে।

সাবধান! অপরাধী তার অপরাধের জন্য নিজেই দায়ী। সাবধান! পিতার অপরাধ সন্তানের ওপর বর্তায় না, না বর্তায় সন্তানের অপরাধ পিতার ওপরে। জেনে রেখো, এ নগরে আর কখনো

শয়তানের ইবাদাত হবে না, এ থেকে সে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তুচ্ছ ভেবে এমন অনেক কাজ তোমরা করবে, যা করলে সে খুশি হবে।

তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, রামাদান মাসে সিয়াম পালন করবে, যাকাত আদায় করবে ও তোমাদের নেতার আদেশ মেনে চলবে, তবে তোমরা জান্নাত লাভ করবে।

তোমাদের গোলাম ও অধীনস্থদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তা খেতে দেবে। তোমরা যা পরবে তাদেরকেও সেভাবে পরতে দেবে।

জেনে রেখো, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। তোমাদের একের সম্পদ আরেকজনের জন্য বৈধ নয়। তবে কেউ স্বেচ্ছায়, খুশি মনে তার সম্পদ কাউকে দিয়ে দিলে সেটা ভিন্ন কথা। কাজেই নিজেরা নিজেদের ওপর জুলুম কোরো না।
আল্লাহ তাআলা তোমাদের সম্পদের মিরাস নির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন। তার থেকে কম বেশি করবে না। সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো অসিয়ত বৈধ নয়। সন্তান যার বিছানায় জন্য গ্রহণ করবে, সে তারই হবে। ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে প্রস্তরাঘাত। (অর্থাৎ সন্তানের জন্য শর্ত হলো তা বিবাহিত দম্পতির হতে হবে। ব্যভিচারীর সন্তানের অধিকার নেই)। যে সন্তান আপন পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা এবং যে দাস নিজের মালিক ব্যতীত অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানব জাতির অভিশাপ।

নিশ্চয়ই তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক। আরবের ওপর অনারবের এবং অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সাদার উপর কালোর আর কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে কেবল তাকওয়ার মাপকাঠিতে।

মনে রেখো, সকলকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে হবে। সে দিন তিনি প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। তোমরা আমার পরে গোমরাহিতে লিপ্ত হবে না, পরস্পর হানাহানিতে মেতে উঠবে না। আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। আমার মাধ্যমে ওয়াহীর পরিসমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এই দুটি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব ও অপরটি রাসূলের সুন্নাহ।

প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেয়। হতে পারে, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবে যারা উপস্থিত শ্রোতার চাইতে আমার কথাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবে।'

খুতবা শেষে আল্লাহর রাসূল সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা তখন কী বলবে?"

সাহাবিরা উত্তর দিলেন, 'আমরা সাক্ষ্য দেবো, নিশ্চয়ই আপনি আপনার বার্তা পৌঁছে। দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদের আন্তরিক উপদেশ দিয়েছেন।' এরপর আল্লাহর রাসূল আকাশের দিকে আঙুল তুললেন, এরপর আবার মানুষের দিকে আঙুল দেখালেন, এরকম কয়েকবার করলেন আর বলতে থাকলেন,

'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো!'

রসূলুল্লাহ্ সা এর দোয়া:

বিদায় হজ্জের আলোচনার উপসংহার হিসাবে যোগ্য আল্লাহর রাসূলের এই দু'আটি। শাইখ আবুল হাসান আন-নাদভী তাঁর আস-সীরাহ আন-নববী গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন,

'হে আল্লাহ! তুমি নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো শুনেছো, দেখেছো আমি কোথায় আছি। তুমি আমার অন্তরের খবর জানো, তুমি আমার বাহ্যিক অবস্থাও জানো, আমার কিছুই তোমার কাছে গোপন নয়। আমি অসহায়, দুর্বল। আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই, তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমি তোমার শাস্তির আশঙ্কা করি, ভয় করি। আমি নিজের সমস্ত দোষ তোমার কাছে স্বীকার করে নিচ্ছি। এক অসহায় বান্দা হিসেবে আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই, গুনাহগার হিসেবে আমি তোমার কাছে তাওবা করি। একজন ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ হয়ে আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, নিজেকে সঁপে দিয়ে তোমার কাছে মিনতি করছি, অঝোরে কেঁদে তোমার কাছে মিনতি করছি, বিনম্র হয়ে তোমার কাছে মিনতি করছি। ও আল্লাহ! ও আমার রব! তুমি আমার এই মিনতি কবুল করে আমাকে সন্তুষ্ট করো। আমার প্রতি দয়া করো, করুণা করো! তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দুআ শ্রবণকারী, তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দাতা!'

রসূলুল্লাহর সে এর পীড়াকষ্ট

ইবনে ইসহাক বলেন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়িশা থেকে উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ, তাঁর থেকে মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম যুহরী এবং তাঁর থেকে ইয়াকুব ইবনে উতবা আমাকে জানিয়েছেন যে, আয়িশা (রা) বলেছেন, "(অন্যান্য স্ত্রীদের কাছ থেকে আমার ঘরে পরিচর্যার জন্য অবস্থানের অনুমতি লাভের পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পরিবারভুক্ত দুই ব্যক্তি ফযল ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্য একজনের কাঁধে ভর করে মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় পা টেনে হাঁটতে হাঁটতে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতে অপর ব্যক্তিটি ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব (রা)।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যন্ত্রণা বেড়ে গেল এবং তিনি কাতর হয়ে বললেন, "বিভিন্ন কুয়া থেকে সাত মশক পানি এনে আমার মাথায় ঢাল যাতে আমি জনগণের কাছে গিয়ে অঙ্গীকার আদায় করে আসতে পারি।" আমরা তাঁকে হাফসা বিনতে উমারের (রা) একটি বড় কাপড় ধোয়া পাত্রের কাছে বসিয়ে তার মাথায় প্রচুর পরিমাণে পানি ঢাললাম। অবশেষে তিনি বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে!"

যুহরী বলেন: আইয়ুব ইবনে বাশীর আমাকে জানিয়েছেন যে, মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে মসজিদের মিম্বারে বসলেন। অতঃপর তিনি মুখ খুলেই সর্বপ্রথম উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য রহমত কামনা করলেন ও তাঁদের জন্য ক্ষমা চাইলেন। তাঁদের জন্য রহমত কামনা করে তিনি অনেক দোয়া করলেন। অতঃপর বললেন, "এক বান্দাকে আল্লাহ দুনিয়ার সম্পদ ও আল্লাহর নিকট যে নিয়ামত রয়েছে তার মধ্যে যে কেন একটি বেছে নিতে বললেন। সেই বান্দা আল্লাহর কাছে যে নিয়ামত রয়েছে তা-ই বেছে নিল।" এ কথার মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন আবু বাক্স সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বুঝেছিলেন যে, এই বান্দা খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ নন। তাই তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমাদের নিজেদেরকে আর আমাদের সন্তান সন্ততিকে বরং আপনার জানের বদলায় কুরবানী করে দিই!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে আবু বাক্স একে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ কর!” অতঃপর বললেন, "মসজিদের এই উন্মুক্ত দরজাগুলো বন্ধ করে দাও। তবে আবু বাক্সের ঘরের সাথে সংলগ্ন দরজা বন্ধ করো না। কেননা আমার সাহচর্যে যত লোক এসেছে তার মধ্যে আবু বাক্সকেই আমি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সহযোগী পেয়েছি।"

আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সাথে একথাও বলেছিলেন, "আল্লাহর বান্দাদের ভেতর থেকে কাউকে যদি আমি নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বাক্রকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু যতদিন আমরা আল্লাহর কাছে সম্মিলিত না হই ততদিন শুধু সাহচর্য, ভ্রাতৃত্ব ও ঈমানই আমাদের পারস্পরিক বন্ধনের যোগসূত্র হয়ে থাকবে।"

উরওয়া ইবনে যুবাইর প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তির সূত্র উল্লেখ করে আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে যুবাইর জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রোগাবস্থায় থাকা সত্ত্বেও উসামার (রা) বাহিনী প্রেরণে বিলম্ব হওয়ায় অস্থিরতা প্রকাশ করেন। ওদিকে কেউ কেউ প্রবীণ মুহাজির ও আনসারগণ থাকতে অল্পবয়স্ক তরুণ উসামা অধিনায়ক মনোনীত হওয়ায় মৃদু আপত্তি প্রকাশ করছিলেন। একথা জেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় মিম্বারে এসে বসলেন। আল্লাহর যথোচিত প্রশংসা করার পর বললেন, "হে জনগণ, উসামার বাহিনী তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও। তার অধিনায়কত্ব নিয়ে যদি তোমাদের মধ্যে কথা উঠে থাকে তবে এ ধরনের কথা তোমরা তার পিতার অধিনায়কত্ব নিয়েও তুলেছিল। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, উসামা এ কাজের যোগ্য আর তাঁর পিতাও এ কাজের যোগ্য ছিল।"

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে এলেন। মুসলমানগণ উসামার বাহিনী প্রেরণের আয়োজন করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগযন্ত্রণাও প্রবল হতে লাগলো। উসামা বাহিনী নিয়ে যখন মদীনা থেকে এক ফারসাখ দূরে অবস্থিত নিম্নভূমিতে পৌঁছেছেন, সেখানে তাঁর সেনাবাহিনীও পৌঁছেছে এবং অন্যান্য মুসলমানগণও তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে, ঠিক তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো। এ খবর পেয়ে উসামা (রা) ও তাঁর সঙ্গী মুসলমানগণ সেখানে থামলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা কি দাঁড়ায় দেখার জন্য। যুহরী বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন তাঁর ভাষণে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য দোয়া এবং মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে যা কিছু বলেছিলেন তার সাথে এ কথাও বলেছিলেন, "হে মুহাজিরগণ, তোমরা আনসারদের দিকে ভালভাবে লক্ষ্য রেখ। অন্যান্য লোকদের তো ক্রমেই আর্থিক সচ্ছলতা এসে থাকে। কিন্তু আনসারদের বর্তমান অবস্থার আলোকে সে অবকাশ নেই। তারা আমার গোপনীয়তার সংরক্ষক ও আশ্রয়দাতা ছিল। সুতরাং ভাল ব্যবহারের বদলায় তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। আর তাদের থেকে কোন মন্দ ব্যবহার পেলে মাফ করে দিও।"

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন।

এই সময় উম্মে সালামা ও মাইমুনা (রা) সহ তাঁর কতিপয় স্ত্রী এবং আসমা বিনতে উমাইস সহ মুসলমানদের কতিপয় স্ত্রীলোক তাঁর কাছে জমায়েত হলেন। তাঁর কাছে তাঁর চাচা আব্বাস (রা) আগেই উপস্থিত ছিলেন।

সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'লাদুদ' নামক ওষুধ খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। আর আব্বাস (রা) বললেন, "আমি তাঁকে অবশ্যই 'লাদুদ' খাওয়াবো।"

শেষ পর্যন্ত তাঁকে লাদুদ খাওয়ানো হলো এবং তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাকে এ জিনিস কে খাইয়েছে?" সবাই বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার চাচা খাইয়েছেন।" তিনি বললেন, এটা হাবশার দিক থেকে আগত কিছু মহিলার আনীত এক ধরনের ওষুধ। তোমরা কেন এটা প্রয়োগ করলে?" আব্বাস (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আশংকা করেছিলাম যে, আপনি ফুসফুস প্রদাহে আক্রান্ত হয়েছেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ রোগে আল্লাহ আমাকে কখনো আক্রান্ত করবেন না। আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আমার চাচা ছাড়া আর কেউ এই 'লাদুদ' থেকে অব্যাহতি পাবে না।" মাইমুনা (রা)কে রোযা অবস্থায় লাদুদ সেবন করতে হয়েছিল। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার-পরিজনকে ঐ ভুল কর্মের জন্য শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

উসামা ইবনে যায়িদ (রা) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়লে আমি এবং আমার সহগামী বাহিনী ও মুসলমানগণ মদীনায় ফিরে গেলাম এবং পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি, তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। কথা বলতে পারছেন না। আমাকে দেখে, তিনি আকাশের দিকে হাত তুলতে লাগলেন এবং হাত নামিয়ে আমার গায়ে রাখতে লাগলেন। এতে বুঝলাম যে, তিনি আমার জন্য দোয়া করছেন। আয়িশা (রা) বলেন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি প্রায়ই বলতে শুনতাম, "আল্লাহ কোন নবীকে জীবন ও মৃত্যুর ইখতিয়ার না দিয়ে মৃত্যু দেননি।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হলে তাঁর শেষ যে কথাটা উচ্চারিত হতে শুনেছি তা ছিল এইঃ "বরং জান্নাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ যে বন্ধু, তাঁকে আমি চাই।" আমি তা শুনে মনে মনে বললাম: তিনি আমাদেরকে অগ্রাধিকার দেন না। এই সময় আমি বুঝতে পারলাম তিনি যে বলতেন "কোন নবীকে জীবন ও মৃত্যুর ইখতিয়ার না দিয়ে মৃত্যু দেয়া হয়নি,"-তাঁর। মনোনীত সেই প্রিয়তম বস্তুই তাঁর এই উক্তিতে বিঘোষিত হয়েছে- "বরং জান্নাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ যে বন্ধু তাঁকে আমি চাই।"

বিদায় বেলা

আল্লাহর রাসূল মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আইশা পাশেই ছিলেন। প্রচণ্ড মাথাব্যথায় কাতর হয়ে আইশা বলছিলেন, 'উহ! ব্যথায় মারা যাচ্ছি!' রাসূলুল্লাহ তখন রসিকতা করে বললেন, 'যদি তা-ই হয়, আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারবো, তোমার জন্য দুআ করতে পারবো।' আইশা তখন স্বভাবসুলভ অভিমানী ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি তো সেটাই চান। আমি মরে গেলে তো আপনি অন্য স্ত্রীদের কাছে যেতে পারবেন।' রাসূলুল্লাহ ব্যথায় মারা যাচ্ছি!'117 তখন বললেন, 'আমারই বরং বলা উচিত --রাসূলুল্লাহর ও ছিল প্রচণ্ড জ্বর। এক সাহাবি রাসূলুল্লাহর ও মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনার তো প্রচণ্ড জ্বরা' রাসূলুল্লাহ ও তখন বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা নবীরা অন্য যে কারো চেয়ে দ্বিগুণ কষ্ট ভোগ করে থাকি।' আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাঁদের বেশি ভালোবাসেন, তাই তাঁদের পরীক্ষাগুলো বেশি কঠিন, কষ্টগুলো বেশি তীব্র, আর পুরস্কারও অন্যদের চাইতে বেশি।

শেষ দিনগুলো আল্লাহর রাসূল কাটিয়েছেন স্ত্রী আইশার ঘরে। অন্য স্ত্রীরা তাতে

সায় দিয়েছিলেন, কারণ রাসূলুল্লাহ তখন এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে প্রত্যেকের ঘরে যাওয়া তাঁর জন্য খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে তাকে আইশার ঘরে আসতে হয়। শেষ দিনগুলোতে একদিন রাসূলুল্লাহ মসজিদে যেতে চাইলেন। তিনি চাইলেন মানুষদের কিছু নাসীহা দেবেন। বললেন, 'আমার গায়ে সাত বালতি পানি ঢেলে দাও, আমি মানুষের কাছে গিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।' রাসূলুল্লাহর শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢালা হলো যেন শরীরের তাপমাত্রা কমে আসে আর তিনি মসজিদে যেতে পারেন। রাসূলুল্লাহকে কাপড়ে জড়ানো ছিল। রাসূলুল্লাহ মসজিদে নিয়ে যাওয়া হলো, তাঁর মাথা কালো একা হাঁটতে পারছিলেন না, তাঁর পা মাটিতে ঘষা খাচ্ছিল, তাই অন্যের ওপর ভর করে তাঁকে মসজিদে যেতে হলো।

রাসূলুল্লাহ প্রথমেই আল্লাহ আযযা ওয়াজালের প্রশংসা করলেন। এরপর উহুদের শহীদদের কথা স্মরণ করলেন, তাদের জন্য সালাত পাঠ করলেন এবং মাগফিরাতের দুআ করলেন। এরপর মুহাজিরদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

'মুহাজিররা শোনো, তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু আনসারদের সংখ্যা কমে আসছে। শুরুর দিকে তারাই আমাকে সাহায্য করেছে। তোমরা তাদের প্রতি সদয় হবে। কাজেই, তাদের মধ্যে যারা উত্তম, তাদের সাথে ভালো আচরণ কোরো, আর যারা ভুল-ত্রুটি করে, তাদের ক্ষমা করে দিও।'

এরপর রাসূলুল্লাহ বললেন,

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন একজন বান্দা আছে যাকে দুনিয়ার শান-শওকত অথবা আল্লাহর কাছে যা আছে এই দুইয়ের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।'

আল্লাহর রাসূল আসলে নিজের কথাই বলছিলেন, কিন্তু কে এই বান্দা সেটা আবু বকর ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারলো না। আবু বকর কাঁদতে শুরু করলেন। সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা হঠাৎ করে আসে। কিন্তু নবীদের কাছে জান কবজের আগে তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করা হয়। আবু বকর কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'আমরা আর আমাদের সন্তানরা আপনার জন্য কুরবান হয়ে যাক!'
রাসুলুল্লাহ আবু বকরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

'বন্ধুত্ব আর অর্থ-সম্পদের ত্যাগ স্বীকারে যে মানুষটি আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি ইহসান করেছে, সে হচ্ছে আবু বকর। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই নিজের খলিল বানাতাম। কিন্তু আমার সাথে আবু বকরের সম্পর্ক হলো ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার। তোমরা মসজিদের খোলা দরজাগুলোর দিকে তাকাও। ওগুলো তোমরা বন্ধ করে দেবে, শুধু আবু বকরের দরজা ছাড়া।'

রাসূলুল্লাহ তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সবার সামনে আবু বকরের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানিত অবস্থান সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। খলিল হলো বন্ধুত্বেরও ওপরে একটি স্থান, যা অন্তরকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয়। যদি দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ কাউকে খলিল হিসেবে বেছে নিতেন, তাহলে সে স্থানটি আবু বকরের হতো। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ আল্লাহর খলিল, তাই আবু বকর হলেন তাঁর দ্বীনের ভাই, বন্ধু, সবচেয়ে আপনজন।

মসজিদে নববীর সাথে রাসূলুল্লাহর ঘর ছাড়াও আরও কিছু সাহাবিদের ঘর লাগোয়া ছিল আর সেই ঘর দিয়ে সরাসরি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করা যেত। সেগুলো ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত দরজার মতো। রাসূলুল্লাহ বলছেন, কেবলমাত্র আবু বকরের দরজাই খোলা থাকবে আর বাকিগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। অনেক আলিম মনে করেন এই আদেশের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল তাঁর ইন্তেকালের পরে আবু বকরের খলিফা হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করছেন, তবে এটা তাঁর আদেশ ছিল না।

রাসূলুল্লাহ তাঁর উম্মাহকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি আশঙ্কা করতেন, তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিমরা খ্রিস্টান ও ইহুদিদের অনুসরণ করা শুরু করতে পারে। মৃত্যুর চার দিন আগে তাই তিনি এই ব্যাপারে ওসিয়ত করে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন,

'জাযিরাতুল আরব থেকে তোমরা ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের বের করে দেবে। আর প্রতিনিধিদলের সাথে আমি যেমন ব্যবহার করতাম, তেমন ব্যবহার করবে।'

আল্লাহর রাসূল দ্বীন ইসলামের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন, তাই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে সেখানে স্থান দিতে চাননি। তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ব্যাপারে আরও বললেন,

'আল্লাহর লানত ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের প্রতি! তারা তাদের নবীদের কবরের উপর মসজিদ বানাচ্ছে। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছে।'
অর্থাৎ, তিনি মুসলিমদের নিষেধ করে দেন যেন তারা তাঁর কবরস্থানকে ইবাদাতের স্থান বানিয়ে না নেয়, যে ভুলটা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা করেছে।

জীবনের অন্তিম পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল আরও একটি বিষয়ের ওপর জোর দেন, সেটি হলো সালাহ। রাসূলুল্লাহ বলেন, সালাতের ব্যাপারে যত্নশীল হও। তিনি মুসলিমদের দাসদের প্রতি যত্নশীল হওয়ারও উপদেশ দেন। উপদেশ দেন নারীদের ব্যাপারে, যেন তাদের ওপর অবিচার করা না হয়। আর জিহাদের ব্যাপারে বলেন,

'মানুষ যখন জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখনই অপদস্থ হবে।'

মৃত্যুর চার দিন আগ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল সালাতের ইমামতি করেছিলেন। কিন্তু ইশার ওয়াক্তে তাঁর শরীর এত খারাপ হয়ে গেল যে তিনি কোনোভাবেই উঠে দাঁড়াতে পারছিলেন না। বারবার বেঁহুশ হয়ে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, আবু বকর যেন ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আইশা চাচ্ছিলেন না তার বাবা আবু বকর সালাতে নেতৃত্ব দিক। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার বাবা তো খুব নরম মনের মানুষ। আমি ভয় পাচ্ছি উনি যদি আপনার স্থানে দাঁড়ান তাহলে হয়তো উনার পক্ষে ইমামতি করাই অসম্ভব হয়ে যাবে।' রাসূলুল্লাহ আবার বললেন, 'আবু বকরকে বলো সালাতে ইমামতি করতে।' আইশা আবারও একই কথা বললেন। এভাবে তিনবার। এরপর রাসূলুল্লাহ বলেন, 'তোমরা নারীরা হলে ইউসুফের নারীদের মতো। আবু বকরকে বলো সালাতে ইমামতি করতে।'

ইউসুফের নারীর সাথে তুলনা দেওয়ার কারণ হলো, আযীযের স্ত্রী যখন অন্য নারীদের দাওয়াত দিয়েছিল, বাহ্যত মনে হবে, সেটা স্রেফ নারীদের জন্য একটা আসর বা আড্ডার আয়োজন। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য ছিল সবাই যেন ইউসুফকে দেখতে পায়। অর্থাৎ, তার মুখের কথা ছিল এক, আর মনের কথা ছিল আরেক। যখন আল্লাহর রাসূল আবু বকরকে দিয়ে ইমামতি করানোর আদেশ করেছেন, তখন আইশা কারণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন তার বাবা খুব নরম মনের মানুষ, তাই তিনি ইমামতি করতে গিয়ে হয়তো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন, কাজেই তিনি ইমামতি না করলেই ভালো। তবে আসল কারণ সেটা ছিল না। আসল কারণ কী ছিল সেটা আইশা পরবর্তীতে নিজেই বলেছেন, 'আমি চাইনি আমার বাবা সালাত পড়ান তার কারণ হলো, মানুষ হয়তো আল্লাহর রাসূলের স্থানে দাঁড়ানোর জন্য তাকে অপছন্দ করতে পারে।' আল্লাহর রাসূলের স্থানে অন্য কাউকে দেখতে উম্মাহ অভ্যস্ত নয়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল আবু বকরকেই ইমামতির জন্য নির্ধারিত করে দিয়ে গেছেন।

আইশা বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ অসুস্থ বোধ করতেন, তখন মুআউয়্যিযাত (সূরা নাস, সূরা ফালাক) পরে নিজের হাতে ফুঁ দিয়ে শরীরে মুছে নিতেন। কিন্তু এবার রাসূলুল্লাহ এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে নিজ হাতে সেটা করতে পারছিলেন না, তাই আইশা সূরাগুলো পড়ে রাসূলুল্লাহর হাতে ফুঁ দিতেন এবং তাঁর হাত দিয়েই তাঁর শরীর মুছে দিতেন, কেননা রাসূলুল্লাহর হাত আইশার হাতের চেয়ে বেশি বরকতময়। 118

উসামা ইবন যাইদের সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল মদীনার বাইরে জুরফে। রাসূলুল্লাহ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে উসামা ইবন যাইদ তাঁকে দেখতে মদীনায় আসলেন। রাসূলুল্লাহ তখন এতটাই অসুস্থ যে কথা বলার শক্তিটুকু পর্যন্ত ছিল না। উসামা ইবন যাইদ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ তাঁর হাত উঠিয়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন, আমি বুঝতে পারলাম রাসূলুল্লাহ আমার জন্য দুআ করছেন।' কী যন্ত্রণা আর কষ্টের মাঝেও রাসূলুল্লাহ উসামা ইবন যাইদের জন্য দুআ করছিলেন। এতে বোঝা যায় উসামার জন্য রাসূলুল্লাহর ভালোবাসা কত প্রবল ছিল।

মৃত্যুর দু'দিন আগে রাসূলুল্লাহ কিছুটা সুস্থ বোধ করছিলেন। তিনি মসজিদে যেতে চাইলেন। দুইজনের কাঁধে ভর করে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সে সময় সালাতে ইমামতি করাচ্ছিলেন আবু বকর। রাসূলুল্লাহকে দেখতে পেয়ে আবু বকর পেছনে সরে আসতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ তাকে ইঙ্গিতে বোঝালেন যেন তিনি সেখানেই থাকেন। এরপর রাসূলুল্লাহ আবু বকরের পাশে গিয়ে বসলেন। আবু বকর তখন সালাতে রাসূলুল্লাহর অনুসরণ করলেন আর বাকিরা আবু বকরের অনুসরণ করে সালাত আদায় করলো।

১)সহীহ বুখারি, অধ্যায় রোগী, হাদীস ২৭।

সীরাহ মুহাম্মদ সা বই।

উম্মাহর জীবনে বিষাদতম দিন

রবিউল আউয়াল মাস।দিনটা ছিল সোমবার। আল্লাহর রাসূল সেদিন আমাদের ছেড়ে চলে যান। কেমন ছিল সেই দিন? ফজরের ওয়াক্তে আবু বকর মুসলিমদের সালাত পড়াচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ তাঁর ঘরের পর্দা সরিয়ে মসজিদের ভেতর তাকালেন। তিনি চোখ ভরে তাঁর উম্মাহকে দেখছিলেন। তাঁর উম্মাহ সারিবদ্ধভাবে সালাহ আদায় করছে। তাওহীদের যে বীজ তিনি রোপণ করেছিলেন, সেই চারাগাছ আজ সুবিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাওয়াহ সফল, তাঁর মিশন সম্পূর্ণ। মুসলিমরা আজ নিজেরাই জামাতবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করছে। রাসূলুল্লাহর মন এক অপার আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল।

তিনি মুচকি হাসলেন। রাসূলুল্লাহর হাসিমুখ দেখে সাহাবিরাও খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। আনন্দের আতিশয্যে তাদের সালাত ভেঙে যাবার উপক্রম! আনাস ইবন মালিকের বর্ণনায়,

'আল্লাহর রাসূলের মুখ সেদিন যেন কুরআনের পাতার মতো ঝলমল করছিল।'

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ফালি চাঁদা

আবু বকর রাসূলুল্লাহকে ইমামতিতে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিতে পেছনে ফিরে আসছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ইশারায় জানিয়ে দিলেন তারা যেন নিজেরাই সালাত আদায় করে নেন। এরপর রাসূলুল্লাহ পর্দা ফেলে আবার ভেতরে চলে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ ও তাঁর উম্মাহর সর্বশেষ যে দৃশ্যটি দেখেছেন সেটি হলো সালাতের জামাত। এই দৃশ্য দেখেই রাসূলুল্লাহর মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। নিশ্চয়ই তাওহীদের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সালাহ।

রাসূলুল্লাহকে দাঁড়াতে দেখে সাহাবিরা হয়তো উন্নতি হয়েছে। তাই আবু বকর করতে আস-সুনহে চলে গেলেন, সেটা ছিল ভাবলেন রাসূলুল্লাহর শারীরিক অবস্থার অনুমতি নিয়ে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে দেখা মদীনার কিছু দূরে।

সোমবারের ফজর সালাহ ছিল রাসূলুল্লাহর শেষ সালাহ। আইশার ভাই আবদুর রহমান তাদের ঘরে এলেন, তার হাতে একটা মিসওয়াক ছিল। রাসূলুল্লাহ সেই মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুখে কিছু বলাও তখন কষ্টকর। আইশা তাঁর চাহনি দেখেই বুঝতে পারলেন রাসূলুল্লাহ মিসওয়াকটি ব্যবহার করতে চাইছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি এটা চান?' রাসূলুল্লাহ ইঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ চাই। আইশা তখন মিসওয়াকটি তার ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে এর অন্য পাশ নরম করে রাসূলুল্লাহকে এগিয়ে দিলেন। আইশা বলেন, তিনি এমনভাবে মিসওয়াক করছিলেন যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি একদম সুস্থ। জীবনের একদম শেষ প্রান্তে এসেও রাসূলুল্লাহ মিসওয়াক ব্যবহারের সুন্নাহ ত্যাগ করেননি।

রাসূলুল্লাহর কষ্ট, যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। তাঁর কষ্ট দেখে ফাতিমা বলে উঠলেন, 'বাবার কতই না কষ্ট হচ্ছে।' সেই কষ্টের মুহূর্তেও তিনি মেয়ের কথার উত্তর দিলেন, বললেন, 'আজকের দিনের পর তোমার বাবার আর কোনো কষ্ট নেই মা!'

মৃত্যুর মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল শুয়ে ছিলেন আইশার পাত্রে হাত ভিজিয়ে বারবার নিজের মুখ মুছে বলছিলেন, মাবূদ নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যু বড়ই কঠিন।' রাসূলুল্লাহ সেরা সৃষ্টি, তাঁকেও মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। কোলে মাথা রেখে। পানির 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ছিলেন সমগ্র মানবজাতির

শেষ সময় ঘনিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে সূরা নিসার একটি আয়াত পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন, বলছিলেন,

'হে আল্লাহ! আমাকে অন্তর্ভুক্ত করো নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিদের সাথে, যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন।

হে আল্লাহা আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার ওপর রহম করো। আমাকে সর্বোচ্চ সাথীর কাছে মিলিত করো।'

মৃত্যুর একেবারে শেষ মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল তাঁর তর্জনী উপরে তুলে বলছিলেন,

ফীর-রফিকুল আ'লা।

ফীর-রফিকুল আ'লা!

ফীর-রফিকুল আ'লা।

রাসূলুল্লাহর চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ইন্তেকাল করলেন, দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর সর্বোচ্চ সঙ্গী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে। জীবনের শেষ মুহূর্তেও উচ্চারণ করছিলেন তাঁর জীবনভর চেয়ে যাওয়া ইচ্ছার কথা ওয়ালহিক্বনী বির- রফিকিল আ'লা আমাকে সর্বোচ্চ সঙ্গীর (আল্লাহ) সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিন।

মুসলিম উম্মাহর জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ ছিল রাসূলুল্লাহর মৃত্যু। মুসলিম উম্মাহ হারালো তাদের সবচেয়ে আপনজনকে। মাথার ওপর ছায়া হয়ে থাকা নেতাকে, বাবার মতো বুকের মাঝে আগলে রাখা মানুষটাকে। ভয়ে-কষ্টে-বিপদে-দ্বন্দ্বে সবাই যার কাছে ছুটে যেতো, যার কাছে সবাই নির্বিঘ্নে সব সমস্যার কথা বলতে পারত, যিনি ছিলেন সবার আশ্রয়, সেই মানুষটা আজ চলে গেলেন। উম্মাহর জীবনে সবচেয়ে বড় ফিতনা সেই দিন। সবচেয়ে অন্ধকার আর বিষাদমাখা একটা দিন।

সাহাবিরা এই খবর মেনে নিতে পারলেন না। সবাই খুব বড়সড় একটা ধাক্কা খেলেন। কারো মাথা আর কাজ করছে না। কেউ স্তব্ধ হয়ে গেছে, কেউ নির্বাক হয়ে বসে পড়েছে, উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো শক্তিটুকুও যেন আর নেই। কেউ কেউ তো রীতিমতো অবিশ্বাস করলেন। উমার ইবন খাত্তাব কোনোভাবেই মানতে পারলেন না রাসূলুল্লাহ তাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মসজিদের দিকে ছুটে গেলেন, উমারের পিছু পিছু সবাই মসজিদের দিকে ছুটলো। চারদিকে হাহাকার, হৃদয়গুলো ক্ষত-বিক্ষত, আজ মদীনার বাতাস ভারী হয়ে আছে কান্নায়। রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর সংবাদ মেনে নেওয়া সাহাবিদের জন্য কতটা কঠিন ছিল সেটা আমরা কখনো অনুভব করতে পারবো না, কারণ রাসূলুল্লাহর প্রতি আমাদের সেই পরিমাণ ভালোবাসাই নেই। সাহাবিরা রাসূলুল্লাহর সাথে বছরের পর বছর থেকেছেন। রাসূলুল্লাহ ছিলেন তাদের সব, সবকিছু। তাদের নেতা, তাদের পরামর্শদাতা, তাদের শিক্ষক, তাদের সুখ-দুঃখের বন্ধু, তাদের রাসূল!

উমার বলে উঠলেন,

'না। না! আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ মারা যাননি! তিনি তাঁর রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেছেন, মুসা এর যেমন তাঁর রবের সাথে দেখা করতে চল্লিশ দিনের জন্য তাঁর সম্প্রদায়কে রেখে চলে গিয়েছিলেন আর এরপর আবার ফিরে এসেছেন। আল্লাহর রাসূলও তেমনি ফিরে আসবেন, অবশ্যই আসবেন, আল্লাহর কসম করে বলছি। আর ফিরে এসে তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলবেন যারা বলছে তিনি মারা গেছেন।'

উমার ভাবতেই পারছেন না রাসূলুল্লাহ আর নেই। তিনি ভাবছেন, সব মুনাফিককে হত্যা করার আগে রাসূলুল্লাহ মারা যেতেই পারেন না। তরবারি কোষমুক্ত করে অবুঝের মতো উমার হুমকি দিয়ে বললেন, 'যে এ কথা বলবে যে রাসূলুল্লাহ মারা গেছে, আমি তার মাথা এই তরবারি দিয়ে আলাদা করে দেবো।'

যে উমার জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে অসম্ভব দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, শক্তি-সাহস আর বীরত্বের পরিচয় দিয়ে যাকে সবাই চেনে, যাকে দেখে শয়তানও ভয়ে অন্য পথ ধরতো, সেই উমার আজ মুষড়ে পড়লেন। এমন কি হওয়ার কথা ছিল? হ্যাঁ, সাহাবিরাও মানুষ। রক্ত-মাংসের জলজ্যান্ত মানুষ। যাদের শরীরে লাল রক্ত আছে আছে, যাদের আবেগ আছে, অনুভূতি আছে, দুর্বলতাও আছে। তাই উমারের মতো শক্ত-সমর্থ মানুষটাও সেদিন অবুঝ শিশুর মতো ভেঙে পড়েছিলেন।

কিন্তু একজন ভেঙে পড়েননি। সেই সংকটময় মুহূর্তে যখন কেউ নির্বাক, কেউ হতবিহ্বল, তখন একটা মানুষ বটবৃক্ষের মতো সব ঝড় সামলে নিলেন। কে সেই মানুষটি? আল্লাহর রাসূলের সবচেয়ে কাছের মানুষ, আল্লাহর রাসূলের বন্ধু, ভাই, সাহাবি আবু বকর। নবুওয়াতের প্রথম থেকে যেই মানুষটা পায়ে পায়ে রাসূলের সাথে লেগে ছিলেন, সেই আবু বকর। আল্লাহর রাসূলের সমস্ত সুন্নাহ, সমস্ত শিক্ষা যিনি বুক পেতে গ্রহণ করেছেন, সেই আবু বকর। আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতের সবচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত, আবু বকর।

সবচেয়ে কাছের মানুষটিকে হারিয়েও তিনি ঈমানী শক্তিতে নিজেকে সামলে নিলেন। সমুদ্রে ঝড় উঠলে যেভাবে শক্ত হাতে জাহাজের হাল ধরতে হয়, তেমনি করেই পুরো উম্মাহর হাল ধরলেন তিনি। রাসূলুল্লাহর ইন্তেকালের সময়ে আবু বকর মদীনায় ছিলেন না, ছিলেন মদীনার কাছাকাছি আস-সুনহে। খবর পেয়ে তিনি সোজা আইশার ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে রাসূলুল্লাহর শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। রাসূলুল্লাহর মুখ অনাবৃত করে আবু বকর কেঁদে উঠলেন, রাসূলুল্লাহকে চুমু দিলেন আর বললেন, 'আপনি জীবিত অবস্থায়ও পবিত্র ছিলেন, মৃত্যুর পরও আপনি পবিত্র। আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করাবেন না। যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল, তা সম্পন্ন হয়ে গেছে।' এরপর আবু বকর আইশার ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে গেলেন। সেখানে তখন উমার উমারকে থামিয়ে আবু বকর বললেন, 'বসো, উমার, বসো।' চিৎকার করছিলেন।

উমার আবু বকরের কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না। আবু বকর আবার বললেন, 'উমার, বসো বলছি, বসো।' তবুও উমার থামলেন না। আসলে উমার মানসিকভাবে এতটাই বিধ্বস্ত ছিলেন যে, কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আবু বকর উমারকে উপেক্ষা করেই সামনে

এগিয়ে গেলেন। লোকেরা উমারকে ছেড়ে তখন আবু বকরের কাছে ভিড় জমালো। তখন আবু বকরের সেই দিনের কথাগুলো উম্মাহ এত বছর পরেও স্মরণ করে। তিনি বলেছিলেন,

'যে মুহাম্মাদের ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক মুহাম্মাদ মারা গেছে। আর যে আল্লাহর ইবাদত করতো সে জেনে রাখুক আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।'

এরপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন,

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ব্যতীত অন্য কিছু নন। তাঁর আগেও অনেক রাসূল গত হয়েছেন। তাই যদি তাঁরও মৃত্যু হয়, তবে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে? যারা পেছনে ফিরে যায়, তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতিই করতে সক্ষম নয়। শীঘ্রই আল্লাহ কৃতজ্ঞদের পুরষ্কৃত করবেন।' (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৪৪)

কথাগুলো শুনে উমার বসে পড়লেন, তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। তার ভাষায়, 'আমি বুঝতে পারলাম আল্লাহর রাসূল আসলেই আর নেই।' এমন নয় উমার কুরআনের এই আয়াত জানতেন না, কিন্তু অদ্ভুত শূন্যতার সেই মুহূর্তে আবু বকরের মুখে আল্লাহ তাআলার এই আয়াত যেন ঝাঁকুনি দিয়ে সবার মাঝে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনলো।

আল্লাহর রাসূলের মৃত্যু সংবাদে উমার ছিলেন দিশেহারা। উসমান হয়ে যান নির্বাক। আলী সবার থেকে লুকিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আবু বকর সূরা আলে-ইমরানের এই আয়াতটির অর্থ জানতেন যে, মুসলিমরা আল্লাহর জন্য বাঁচে, ব্যক্তি মুহাম্মাদের জন্য নয়। মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহর রাসূল, তাঁর মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু তাঁর আনীত দ্বীন চলবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। সেদিন মদীনায় কত হাফেজ ছিল, কত আলেম ছিল, কিন্তু কেউ এই আয়াতকে কাজে লাগাতে পারলো না। সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করেছিলেন মাত্র একজন, আল্লাহর রাসূলের ছায়া যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি, সেই আবু বকর। ইমাম কুরতুবি মন্তব্য করেন,

'সাহসিকতার মানে যদি হয় বিপদ আর কষ্টকর পরিস্থিতিতে দৃঢ় আর অবিচল থাকা, তবে আবু বকরের সাহসিকতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো কুরআনের এই আয়াত ও এই ঘটনা। কেননা রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর চাইতে বড় ফিতনা উম্মাহর জীবনে আর ছিল না ... চারদিকে যখন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম, তখন যিনি হাল ধরেছিলেন তিনি হলেন আবু বকর।'

রাসূলুল্লাহর (সা) দাফন কাফন

রাসূলুল্লাহর পরিবারের সদস্যরা রাসূলুল্লাহর গোসল ও দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন আল আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব, আলী ইবন আবি তালিব, আল ফাযাল ইবন আব্বাস, কুসাম ইবন আব্বাস, উসামা ইবন যায়েদ এবং রাসূলুল্লাহর আযাদকৃত দাস শুকরান। আনসারী সাহাবি আওস ইবন খাওলি আলীকে বললেন, 'আল্লাহর কসম এবং রাসূলুল্লাহর ওপর আমাদের হকের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে ভেতরে আসতে দিন।' তাকে ভেতরে আসতে দেওয়া হলো এবং তিনি গোসলের সময় উপস্থিত ছিলেন।

আইশা বলেন, 'গোসলের সময় তারা বললো, আমরা তো বুঝতে পারছি না, রাসূলুল্লাহর গায়ের কাপড় খুলে গোসল দেবো, যেভাবে করে আমরা অন্যদের গায়ের কাপড় খুলে গোসল দিই, নাকি কাপড় রেখেই যেভাবে আছে সেভাবে গোসল দেবো। যখন তারা এটা নিয়ে বিতর্ক করছিল, তখন আল্লাহ তাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেন, সেই তন্দ্রায় তাদের প্রত্যেকের মাথা ঢলে পড়লো। এরপর ঘরের পাশ থেকে একটা আওয়াজ এল -- রাসূলুল্লাহর গায়ের কাপড় থাকা অবস্থাতেই তাকে গোসল দাও। কেউ জানে না এই কথা কে বলেছিল। তাই তারা রাসূলুল্লাহর জামার ওপর দিয়েই পানি ঢালে এবং তারা তাদের হাত না দিয়ে জামার ওপর দিয়ে তাঁর শরীর ঘষে দেয়।'

গোসল শেষে রাসূলুল্লাহর শরীরে তিন টুকরো কাপড় জড়ানো হলো। রাসূলুল্লাহর * জানাযার সালাত এক জামাতে আদায় করা হয়নি। আইশার ঘরে যতটুকু জায়গা হতো তত মানুষ আসতো, জানাযার সালাত আদায় করে চলে যেতো। এক দলের সালাত আদায় শেষ হলে আরেক দল এভাবে সালাত আদায় করা হলো। প্রথমে পুরুষরা, তারপর নারীরা, তারপর শিশুরা আর সবশেষে দাসরা। রাসূলুল্লাহর সালাতে কোনো ইমাম ছিল না, প্রত্যেকে আলাদাভাবে সালাত আদায় করে।

রাসূলুল্লাহর শরীর ছিল আইশার ঘরে। উম্ম সালামা বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহর স্ত্রীরা খুব কাঁদছিলাম, কিন্তু তখন অতটুকু সান্ত্বনা ছিল যে আমরা রাসূলুল্লাহর মৃতদেহটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বুধবার গভীর রাতে যখন কবরের মাটি খোঁড়ার শব্দ পেলাম, তখন আমরা কান্নায় ভেঙে পড়ি, চিৎকার করে উঠি। মসজিদ থেকে আমাদের চিৎকার শুনতে পেয়ে তারাও চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, পুরো মদীনাই যেন একটা বিরাট আর্তনাদে পরিণত হয়।'

ফজরের সময় হলে প্রতিদিনের মতোই বিলাল আজান দিতে গেলেন। 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' এরপর আশহাদু

আন্না মুহামম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলতে গিয়ে আর বলতে পারলেন না, গলার কাছে আওয়াজগুলো যেন সব দলা পাকিয়ে গেল। কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিলাল, আজান শেষ করতে পারলেন না। বিলাল ছিলেন আল্লাহর রাসূলের মুয়াজ্জিন, রাসূলের মৃত্যুর পর তিনি আর কারো জন্য আজান দেননি।

আইশার ঘরে খনন করা হলো রাসূলুল্লাহর কবর। নবীরা যে স্থানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই তাঁদের কবর দেওয়া হয়, এটাই নবীদের সুন্নাহ। আইশা একটি স্বপ্নে দেখেছিলেন তিনটি চাঁদ তার কোলে পতিত হয়েছে। আবু বকর এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, 'যদি তোমার স্বপ্ন সত্যি হয়, তাহলে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ তিন ব্যক্তির কবর তোমার ঘরে হবে।' যখন রাসূলুল্লাহর দাফনের সময় এল তখন আবু বকর বলেন, 'তোমার চাঁদগুলোর মধ্যে এটা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ চাঁদ।'

রাসূলুল্লাহ মৃতদেহ কবরস্থ করার সময় এল। এই কাজটিও রাসূলুল্লাহর পরিবারের লোকেরা সম্পন্ন করলেন। কবরে নেমেছিলেন আলী, ফাদল ইবন আব্বাস, কুসাম ইবন আব্বাস আর শুকরান। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূলুল্লাহকে কবরস্থ করার সময় মুগীরা ইবন শু'বা ইচ্ছে করে তার একটি আংটি কবরের মধ্যে ফেলে দেন এবং এরপর সবাইকে বলেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমার আংটিটা নিয়ে নিতে দিন।' এই বাহানায় তিনি রাসূলুল্লাহ এর কবরে নামেন যেন তিনি রাসূলুল্লাহ স্পর্শ করা শেষ ব্যক্তিটি হতে পারেন। এরপর তিনি উঠে আসেন।

দাফনকাজ শেষ করে সবাই একে একে ফিরে এল। তখন ফাতিমা আনাসকে বললেন, 'আনাস, তোমরা কীভাবে পারলে আল্লাহর রাসূলের শরীরের ওপর মাটি নিক্ষেপ করতে!' আসলে রাসূলুল্লাহর মৃত্যু, তাঁর গোসল, তাঁর দাফন -- সবই তাদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল। সেজন্য রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'যখনই তোমাদের কারো উপর কোনো বিপদ আসবে, তখন আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে।' কারণ, একজন মুসলিমের ওপর সবচেয়ে বড় যে বিপদ আসতে পারে, সেটা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে আর তা হলো আল্লাহর রাসূলের জীবনাবসান। আর কোনো মুসিবতই এর সাথে তুলনা করার মতো নয়। আনাস ইবন মালিক ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ঘরে বড় হওয়া সাহাবি। তিনি বলেন,

'আমার জীবনের সবচেয়ে বিশেষ দিন দুইটা একটা সবচেয়ে আনন্দের, আরেকটা সবচেয়ে কষ্টের। আনন্দের দিনটি হলো রাসূলুল্লাহর মদীনায় আসার দিন। সেদিন সবকিছু ছিল আলোকিত! আর সবচেয়ে কষ্টের দিন হলো রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর দিন। সেদিন সবকিছু যেন আঁধারে ছেয়ে গেল। রাসূলুল্লাহকে কবর দেওয়ার পর যখন আমরা হাত থেকে ধুলো ঝাড়ছিলাম, তখন থেকেই মনে হতে লাগলো, আমাদের অন্তরগুলো আর আগের মতো নেই।'

রাসূলুল্লাহর সাথে থাকা সাহাবিদের জন্য একটা অন্যরকম অনুভূতি। যখন তিনি চলে গেলেন, তখন তাদের মনে আর উমার উমা আইমানের দেখে কাঁদতে শুরু করেন। তারা আইমান বললেন, হচ্ছিল যেন সবকিছু বদলে গেছে। একদিন আবু বকর সাথে দেখা করতে যান। উম্ম আইমান তাদের জানতে চাইলেন, 'আপনি কেন কাঁদছেন?' উন্ম

'আমি জানতাম আল্লাহর রাসূল একদিন না একদিন চলেই যাবেন। আমি কাঁদছি এ কারণে যে আর কখনো ওয়াহী নাযিল হবে না।'

তারা শুধু রাসূলুল্লাহর অভাব বোধ করছিলেন তা নয়, তারা রাসূলুল্লাহর মাধ্যমে যে ওয়াহী পেতেন সেটার অভাবও অনুভব করছিলেন।

রাসূলুল্লাহ মারা যান হিজরী একাদশ বছরের বারো রবিউল আউয়াল। মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ ছিলেন সমগ্র আরবের অবিসংবাদিত শাসক। তিনি এমন একটা সময়ে চলে যান যখন অনারবের রাজা-বাদশাহরা তাঁকে সমীহ করতে শুরু করেছে। কিন্তু এই প্রতাপ আর প্রতিপত্তি থাকা মানুষটি কোনো সম্পদ রেখে যাননি। মৃত্যুর একদিন আগে তিনি সব দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেন। সাত দিনার ছিল, সেগুলোও সাদাকা করে দেন। তাঁর একটি বর্ম এক ইহুদির কাছে বন্ধক রাখা ছিল। সেটার বিনিময়ে তিনি কিছু যব নিয়েছিলেন পরিবারের জন্য। তিনি রেখে গেছেন কেবল একটি সাদা খচ্চর, কিছু অস্ত্র আর এক টুকরো জমি। এই জমিটিও তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদাকাহ করে দিয়ে গেছেন। না ছিল সম্পদের বাহার, না ছিল সোনা-রুপার বহর, কিছুই না।

তবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এই মানুষটি রেখে গেছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। সেই প্রজন্ম গড়েছে এক নতুন ইতিহাস। মুসলিম জাতির আগে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর মনোনিত জাতি ছিল বনী ইসরাঈল। তাদেরকে সৎপথে টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ তাদের কাছে একের পর এক নবী পাঠাতেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল যে উম্মাহকে রেখে গেছেন, সে উম্মাহর জন্য আর কোনো নবী পাঠানোর প্রয়োজন নেই, শেষ নবীই তাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত যথেষ্ট। এটা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অভাবনীয় সম্মাননা।

শেষ কথা

রাসূলুল্লাহ সা এর সীরাহ নিছক সাহিত্যিক রস আস্বাদনের জন্য নয়। মজা পাওয়া বা উপভোগের জন্য উম্মাহর আলিমরা সীরাহ লেখেননি। এই সীরাহ নিজেকে বদলে দেওয়ার জন্য, নিজেকে রাসূলুল্লাহর আদলে গড়ে তোলার জন্য। রাসূলুল্লাহ যেভাবে এই উম্মাহকে ভালোবাসতেন, উম্মাহকে নিয়ে চিন্তিত থাকতেন, আমরাও সেভাবে এই উম্মাহকে ভালোবাসবো। রাসূলুল্লাহ আমাদের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য সারাটা জীবন অতিবাহিত করেছেন। পৃথিবীর সুখ-শান্তি আর সম্পদ তিনি ত্যাগ করেছেন শুধুমাত্র এই দ্বীন ইসলামকে আমার-আপনার কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য। সেজন্য আমাদের উচিত অন্তর থেকে রাসূলুল্লাহর প্রতি সবসময় কৃতজ্ঞ থাকা। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আমরা আযযা ওয়া জালের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির সম্পূর্ণ জীবনী শুরু থেকে শেষ করার জন্য আমাদের তাওফীক দিয়েছেন।

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দুআ করি যেন তিনি আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা সত্যিই রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসে। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ অনুসরণ করে, তাঁর দেখানো পথ আঁকড়ে ধরে এবং নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে।আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর সাথে ক্বিয়ামতের দিন মিলিত হবেন এবং তাঁর হাতে হাউযে কাউসারের পানি পান করবেন। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যেন আমাদের তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা রাসূলুল্লাহর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফীক প্রাপ্ত হবে।
আমরা দুই করি আমাদের মাতা পিতা, স্বামী সন্তান, উস্তায উস্তাযা সবাইকে আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল কবুল করুন।
এই সীরাহ লেখা ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সুখের সুন্দর কাজ। আমি আর রাহীকুল মাখতুম বই,সীরাতে ইবনে হিশাম,সীরাহ মুহাম্মদ সা দুই খণ্ড, বিশ্ব নবী বই গুলো পড়েছি এবং এর থেকে বিভিন্ন ঘটনার সন্নিবেশিত রূপ তৈরি করেছি এই সীরাহ লেখায়। প্রতিটি ঘটনার সংযোজন ও বিয়োজন এর মুহূর্তে অদ্ভুত এক ভালোলাগা ভালোবাসায় মন সিক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল কবুল করুন আমিন।
সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার এবং সাহাবিদের প্রতি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।